সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদান

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ২০০৫

গবেষক

এ.কে.এম শাহে আলম

রেজি নং- ৯৭/৯৭-৯৮

ডিসেম্বর-২০০৫

Dhaka University Library

403585

403585

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ.কে.এম শাহে আলম আমার তত্ত্বাবধানে **'সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদান'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভের কাজ শেষ করেছে। আমার জানামতে এ বিষয়ে এটিই প্রথম ও মৌলিক রচনা। এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের জন্য অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করা যেতে পারে।

তারিখঃ ২৯/১২/২০০৫ইং

তত্ত্বাবধায়ক

403585

২৯/১২/২০০৫

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

"সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আনুকূল্যে এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন এর তত্ত্বাবধানে আমি এই মৌলিক অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রয়াস পেয়েছি।

সন্ত্রাস বর্তমান সময়ে এক অতি পরিচিত শব্দ। আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি জীবন আজ সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কতিপয় পরাশক্তি রাষ্ট্র নিজেদের আগ্রাসী ক্ষমতাকে পুঁজি করে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে নগ্ন সন্ত্রাস চালাচ্ছে ও সেই সাথে চরম অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে বিশ্ব বিবেককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে চলেছে। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম ও পবিত্র কুরআনে সন্ত্রাস সম্পর্কে যে বাণী মহান আল্লাহর তরফ হতে প্রেরিত হয়েছে, তা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অন্যথায় আজকে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যায় অপপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব বিবেককে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতেই থাকবে।

প্রজ্ঞাময় মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টীর সেরা জীব মানুষকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টি সেরা মানুষের জন্য রয়েছে সহজ, সুন্দর অনাবিল জীবন কাঠামো। বিশেষতঃ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তিতে অভিসিক্ত হওয়ার ফলে গোটা জগতে মানুষের মর্যাদা অনন্য। ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন আপন প্রাণসত্ত্বা ও মৌলিকতার দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও একক বৈশিষ্ট মন্ডিত। কিন্তু মানুষ তা সত্বেও নিজের অন্তর্নিহিত কূপ্রবৃত্তির তাড়নায় নানারূপ অন্যায়, অবৈধ ও নিষিদ্ধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অপরাধী ও সন্ত্রাসী হিসাবে গড়ে তোলে।। ফলে তার অনন্য মর্যাদাই ভূলুণ্ঠিত হয়না, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব শান্তি আর অস্তিত্ব বহু ক্ষেত্রে হয় বিপন্ন, বাধাগ্রস্থ। চিরকালই মানুষ তার অতীতকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে যদি ইসলামী সৌর্য বীর্যের ছোঁয়া লাগানো যায় তবে অপসংস্কৃতি ও সন্ত্রাসী প্রবনতা জীবনকে কলুষিত করতে পারবে না। ইসলাম অপরাধ সংগঠনের পূর্বেই তার ছিদ্র পথ বন্ধ করার শিক্ষা দেয়, অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাবনা আগে ভাগেই বন্ধ করে দেয়। ইসলাম শান্তির জন্য শ্বেতশৌধ। নির্মাণ কৌশলে নিজস্ব ডিজাইন ও ভাবধারায় অভিনব পদ্ধতিতে সক্রিয়তা বজায় রাখে।

403535

মানুষ অন্যান্য জীব জন্তুর মত লাগামহীন ভাবে ভোগ বিলাসের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাছুলের আনুগত্য করে, আল্লাহর বিধানের অনুস্মরণ করতঃ পরকালের শান্তি ও মুক্তির উদ্দেশ্যে মানুষ কাজ করবে। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে ধরনের গঠন কার্যের প্রয়োজন ইসলাম ঠিক সেই রূপেই রূপায়িত। বর্তমানে পরিবর্তিত সমাজ, পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে বিরাট জিজ্ঞাসা। ধর্ম কি সন্ত্রাস দমনে যথেষ্ট? বিজ্ঞান কি ধর্মের পরিপন্থী? বিজ্ঞানের আনুকুল্য ও অবদান গ্রহণ করতে ধর্ম কি বাঁধা ? আমাদের সার্বিক বৈষয়িক উন্নয়নের পথে ধর্ম কি মস্তবড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে? অনাবিল মন ও অপ্রভাবিত মানসিকতা নিয়ে এসব প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করে একটা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই কর্তব্য বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির ঐকান্তিক দাবী। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম কিন্তু উল্লেখিত প্রশ্নের সামনে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়নি বরং যৌক্তিকভাবে সব প্রশ্নকে স্বাগতম জানিয়ে, তার যথার্থ জবাব ও মীমাংসা করে দিয়েছে। ইসলাম ধর্মে আকীদা বিশ্বাসের স্থান সর্ব প্রথম ও সর্বাগ্রে। একে দোষ মনে করলে বিজ্ঞানত শুধু দোষীই নয় বরং বিজ্ঞান একেবারেই অচল। ধর্মীয় ভাষায় "ঈমান বিল গাইব" ছাড়া বিজ্ঞানত এক কদমও চলতে পারেনা।

মুসলিম উম্মাহর একটি বৃহৎ অংশ আল-কুরআন এবং রাসূল (সঃ)-এর হেদায়াতকে ভুলে গিয়ে জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্যকে ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করছে। বিশ্বের সকল তাগুতি শক্তি ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ইসলাম একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ ইসলাম শুধু পরকালের ভয় থেকে উৎপাদিত নিষ্কন্টক আধ্যাত্মিকতা নয়, বাস্তব ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ দ্বীন একটি মৃত্যুঞ্জয়ী বৈপ্লবিক ব্যবস্থা । আর এ বৈপ্লবিক ব্যবস্থাকে জগদ্বাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া ও যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠা করা মুসলিম উম্মাহর ওপর অর্পিত অপরিহার্য দায়িত্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কোন যুক্তি বা কোনরূপ নির্ঝঞ্ঝাট ইবাদত-বন্দেগীর আড়ালে এ দায়িত্ব থেকে কোন অবস্থাতেই কোন মুসলমান নিজেকে এতটুকু অন্যমুখী করার কথা ভাবতে পারে না, ভাবার কোন অবকাশ নেই। ধর্মের প্রশ্নে কোন জোর-জবরদস্তি ইসলাম আদৌ অনুমোদন করে না সত্য, কিন্তু সত্যকে ধরাপৃষ্ঠে বিজয়ী করে তোলার যে প্রাণান্ত সাধনা, সেই সাধনা থেকে এতটুকু পরানুখ থাকাও ইসলাম যে কোন মুসলমানের জন্য অমার্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে। অতএব মুসলমান কোন অবস্থাতেই ইসলামের হেদায়াতকে শুধু আনুষ্ঠানিক ও নির্ঝঞ্ঝাট কিছু ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে তপস্যারত রাখতে পারে না। আর কিছু না হোক, তাকে অন্তত সর্বত্র ও সকলের মধ্যে ইসলামের বার্তাকে পৌছে দিতেই হবে।

আধুনিক বিশ্বে যেমন বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভুত উন্নতি হয়েছে তেমনি নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে বিশ্ব শান্তি হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠনে ইসলাম স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পবিত্র কুরআন হাদীসের বিস্তৃতির নির্দেশ দিয়েছে। মানব মনের জৈবিক চাহিদাকে ইসলামী বিধানের আওতায় এনে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধির মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য দরকার প্রচুর গবেষনা ও প্রচার কার্যের।

পরিতাপের বিষয় আমাদের অনেকের মধ্যে সে সচেতনতার অভাব রয়েছে। মুসলমান হয়েও ইসলামী শিক্ষা ও তথ্যাদীর মূল উৎস "কুরআনুল কারীম" এর প্রয়োজনীয়তা, পরিচয় ও শিক্ষার ব্যাপারে অনেকেই উদাসীন।

ইসলামের প্রথম যুগে মসজিদ শুধু আজকের মত নামাজের স্থানই ছিলনা, এটা ছিল শিক্ষাগার, গবেষনাগার, পাঠাগার, হাসপাতাল, বিচারালয়সহ সর্বপরি ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সার্বজনীন বিশ্ব গঠনের সূতিকাগার। এজন্য এর সার্বক্ষনিক গুরুত্ব ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যখনই উপাসনালয় আর শিক্ষালয় পৃথক হয়েছে, তখনই মসজিদে শুধু প্রার্থনা আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস দেখা যায়। ইসলাম ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে সন্ত্রাস দমনের এক অনাবিল ক্ষমতা দিয়েছে।

জ্ঞানের স্বল্পতা, যথেষ্ট তত্ত্ব ও তথ্যের অপ্রতুলতার মধ্যেও আমি আমার গবেষনায় ও অভিসন্দর্ভ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছি । শুরু থেকে আমার এ কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করেছেন আমার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক মরহুম প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার। সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমার গবেষনায় ছন্দপতন ঘটে। তাঁর পরলোকগমনের পর যার তত্ত্বাবধানে আমি অগ্রসর হই তিনি হলেন বিভাগীয় প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রহুল আমীন। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তিনি আমাকে যে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন তার ফলেই আমার অভিসন্দর্ভ বর্তমান রূপ পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুর রশীদ আমাকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে আমার গবেষনা কার্যে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁর নিকট আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভাগীয় শিক্ষক মন্ডলী আমাকে উদ্দীপিত না করলে এ কাজ আমার ধারা সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

দুলারহাট কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আরব আলী এবং সকল অধ্যাপক মন্ডলী আমার গবেষনা কাজে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন এ জন্য তাদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে বিভিন্ন প্রকার বই দ্বারা সহযোগীতা করেছেন দুলারহাট মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ইউসুফ হাসান। আমার এ কাজে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন দুলারহাট কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন, প্রভাষক জনাব আঃ বাছেত ও রসায়ন বিভাগের প্রদর্শক জনাব মোঃ মহিউদ্দিন। এ ছাড়াও অন্যান্য যাঁরা আমাকে সহযোগীতা করেছেন তাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মচারী, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরীর বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মচারীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করে আমার গবেষনা কর্মকে সহজ করেছেন। সে জন্য তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়াও কুলসুমবাগ এ জব্বার দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক জনাব মাওলানা মোঃ আবুল কাশেম, চরফ্যাশন পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরহাদ এবং চরফ্যাশনে স্থাপিত আলহাজ্ব মুজাম্মেল হক আদর্শ পাঠাগারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল্লাহ সাহেবের সহযোগিতার কথা স্মরণ না করে পারছি না। তাদের সহযোগিতা আমার গবেষনার কাজকে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

আমার এ অভিসন্দর্ভ রচনার দুটি মুল উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ সামজ, জাতি তথা বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করে সুখী ও সুন্দর জীবন যাপনে প্রচেষ্টা চালানো। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বিশ্ব নেতৃবৃন্দসহ সচেতন সমাজ সন্ত্রাসী তৎপরতার মতো ঘৃন্য সমস্যার সমাধান কল্পে চিন্তিত। এ মুহূর্তে পুর্নাংগ জীবন বিধান হিসাবে আমাদের সামনে বিশ্বশান্তির প্রতীক ইসলাম- এ সমস্যার সমাধানকল্পে যে অবদান এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা বিশ্বকে জানাতে হবে। জানাতে হবে বিশ্বের আধুনিক চিন্তা ধারার মানুষকে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি আমার অভিসন্দর্ভটি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে রচনার চেষ্টা করেছি। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে সন্ত্রাস দমনের বিষয়ে বোধগম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে যত্নবান হয়েছি। আমার এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও জনগণ উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

-ঃ সূচী ঃ-

ভূমিকা

অধ্যায়-১ সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা---------- ১

অধ্যায়-২ সন্ত্রাস ও ইসলাম---------- ১৯

অধ্যায়-৩ দুর্নীতি সকল সন্ত্রাসের প্রধান উৎস; প্রেক্ষাপট আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ------ ৩৬

অধ্যায়-৪ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংবাদ পত্রে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা---------- ৫৬

অধ্যায়-৫ চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস; প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ---------- ৯৩

অধ্যায়-৬ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস; একটি সমীক্ষা ---------- -------১০৯

অধ্যায়-৭ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস; একটি বিশ্লেষণ---------- ১২১

অধ্যায়-৮ মিডিয়া সন্ত্রাস; একটি পর্যালোচনা ---------- ১৪৭

অধ্যায়-৯ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দরুন আল্লাহ্ কর্তৃক ধ্বংস ও সাজা প্রাপ্ত কয়েকটি জাতি ১৫৯

অধ্যায়-১০ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় দন্ডবিধি---------- ১৭৭

অধ্যায়-১১ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সন্ত্রাস দমন---------- ১৯২

অধ্যায়-১২ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর যুগে সন্ত্রাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা- ২০২

অধ্যায়-১৩ খুলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে সন্ত্রাস প্রতিরোধ---------- ২১৫

অধ্যায়-১৪ আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে সন্ত্রাস দমন ---------- ২৩২

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে 'সন্ত্রাস' প্রত্যয়টি অত্যন্ত আলোচিত। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সর্বত্রই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রও সন্ত্রাসের নির্মমতায় জিম্মী হয়ে পড়েছে। মূলত সন্ত্রাস হচ্ছে এমন একটি ধারনা যা কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর শারীরিক হামলা এবং যা অন্তিমে মৃত্যু ঘটায়।

সন্ত্রাসের গতি স্থিতি নয়। সাম্প্রতীক বিশ্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর বিভিন্ন গতি বিস্তার হয়েছে। স্কানডিনেভিআন ভূক্ত দেশগুলো ছাড়া বিশ্বের প্রায়ই সর্বত্রই সন্ত্রাসের কড়াল গ্রাসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। মানবতা স্রেফ হাস্যকর!

অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন ইসলাম সন্ত্রাসকে অনুমোদন করে না। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে- "দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটিও না"।

মূলত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে কতিপয় পরাশক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ইসলামকে পুঁজি করে মানবতার বিরুদ্ধে নগ্ন সন্ত্রাস চালাচ্ছে। একই সাথে চরম অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। এ অবস্থায় 'সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদান' শীর্ষক গবেষণা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

অভিসন্দর্ভের অবয়ব, ভাব সৌন্দর্য এবং বিষয় বিন্যাসের সুবিধার্থে মোট চৌদ্দ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা, সন্ত্রাসের বিভিন্ন ধরণ, সন্ত্রাসের উৎপত্তি এবং স্থায়ী হবার কারণ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিভিন্ন ধরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা আছে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে যথাক্রমে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি, সংবাদপত্রে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা এবং চলচ্চিত্রে সন্ত্রাসের উপস্থিতি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বর্তমানে একটি আলোচিত বিষয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ নিয়ে গবেষণামূলক বর্ণনা করা হয়েছে। আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ চরম হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে এ নিয়ে তথ্য নির্ভর আলোচনা রয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে মিডিয়া কর্তৃক তৈরী বানোয়াট সন্ত্রাস সম্পর্কে নমুনা স্বরূপ কতিপয় ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

নবম, দশম এবং একাদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দরুন আল্লাহ কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি জাতির বিবরণ, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় দন্ডবিধি এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সন্ত্রাস দমন সম্পর্কিত পর্যালোচনা রয়েছে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যুগে সন্ত্রাস ও খুলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে সন্ত্রাস প্রতিরোধের বিবরণ আছে। চর্তুদশ অধ্যায়ে আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্ত্রাস দমন সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা করে উপসংহারের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১

সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

সন্ত্রাসের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Violence ও Terrorism। Terrorism শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Terror থেকে সংকলিত- যার অর্থ আতংক সৃষ্টি করা। 'সন্ত্রাস' শব্দটির ভাষাগত বিশ্লেষণে (সন্+ত্রাস=সন্ত্রাস) এমন কোন কাজকে বুঝায় যার সাথে ভয় বা ত্রাসের সম্পর্ক আছে। 'সন্ত্রাস' বলতে অস্বাভাবিক অপরাধমূলক কার্যকলাপকে বুঝানো হয়। এক কথায় একে বিশেষ ধরণের অপরাধ বলা যায়।

সাধারণত সন্ত্রাস বলতে ভয়ভীতি, নৈরাজ্য প্রবণতা, ত্রাস সৃষ্টি করা, হয়রানি, খুন খারাবী, ছিনতাই, অপহরণ, ডাকাতি, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচার, নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, চাঁদাবাজি ইত্যাদিকে বুঝায়। পরিভাষায় সন্ত্রাস বলা হয় দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য বিস্তার করাকে। অন্য কথায় অন্যের হক বা অধিকার প্রত্যক্ষভাবে বিনষ্ট করাকে সন্ত্রাস বলে। আর ব্যাপকার্থে বলা যায়- নানা রকম অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের যিম্মি করে রাখার নামই সন্ত্রাস।

বৃটেনের জনৈক মহিলা সাংবাদিক Victoria Sohofield সন্ত্রাস শব্দের অর্থ এভাবে করেছেন- "কোন সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে আতংক ও অবরোধ সৃষ্টি করে বিপদগ্রস্ত করা"।[১]

১৯৭৪ সালে বৃটিশ সরকার সন্ত্রাস শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করে এভাবে- *"For the purpose to the legislation, terrorism is the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purposes of putting the public, or any section of publice, in Fear."* আইনের চোখে সন্ত্রাসের অর্থ হলো- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কঠোরতা অবলম্বন করা যাতে জনগনের স্বার্থের ক্ষেত্রে আতংক ও ভয় ভীতি সৃষ্টি করাও শামিল থাকে।[২]

১৯৮০ সালে আমেরিকার CIA সন্ত্রাস শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছে, *"The Tereat or use of violence for political purpose by Individuals or groups, Whether to or in opposition to established government authority."* কোন রাজনৈতিক দল বা সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আতংক সৃষ্টি করা কিংবা একনায়কতন্ত্র/স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন করা।[৩]

১৯৮৫ সালে পশ্চিম জার্মানী সরকার কর্তৃক সন্ত্রাস শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয় "রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ধ্বংসাত্মক আক্রমন করে জান মালের ক্ষতি সাধন করা।"[৪]

Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে সন্ত্রাস সম্পর্কে বলা হয়- "The use of violent action in order to achieve political aim's or to force a government to act ; on act of Terrorism."[৫]

সন্ত্রাস সম্পর্কে Academic American Encyclopaedia-1983 তে বলা হয়- "Terrorism is the calculated use of violent acts, or the thrat of violent acts, to frighten people in to submission"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

A. T. DEV কর্তৃক সম্পাদিত 'STUDENTS' Favovrite Dictionary-তে সন্ত্রাস বিষয়ে বলা হয়- "A Systematic intimidation ar a method of securing political inds" [৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতে, *"The term Terrorism means premediated politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub national or clandestine agents, usually intended to influence an audience."* [৮]

In Webster's collegiate Dictionary সন্ত্রাসের সংজ্ঞা প্রদান করেন এভাবে- *"Terrorism has been define as the use of physical force in a coordinate manner by an organized group or groups so as to injury others."* [৯]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় 'Terrorism' কে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে- *"Terrorism, the systematic use of terror (such as bombing, killing and kidnappings) as a means of forcing some political objective, when used by a government, it may signal efforts to stifle dissent."* [১০]

আবার International Policy Institute for Counter Terrorism প্রশ্ন তুলছে Is One man's terrorist another man's freedom fighter? একজনের চোখে সন্ত্রাসী অন্য জনের চোখে মুক্তিযোদ্ধা? [১১]

সন্ত্রাস সম্পর্কে বলা হয়-

The statement, "One man's terrorist is another man's freedom fighter," has become not only a cliche, but also one of the most difficult obstacles in coping with terrorism. the matter of definition and conceptualization is usually a purely theoretical issue-a mechanism for scholars to work out the appropriate set of parameters for the research they intend to undertake. However, when dealing with terrorism and guerrilla warfare, implications of defining our terms tend to transcend the boundaries of theoretical discussions. In the struggle against terrorism, the problem of definition is a crucial element in the attempt to coordinate international collaboration, based on the currently accepted rules of traditional warefare. [১২]

"তবে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে সেটা জানা আবশ্যক। বর্তমানে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আর অন্যান্য রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যে পার্থক্য ও সীমানা নির্ধারণ;
২. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর গণপ্রতিরোধ একই মানদন্ডে বিচার করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা;
৩. 'সন্ত্রাস'-কে অপরাধমূলক সন্ত্রাস বা ক্রিমিনাল কর্মকান্ড থেকে আলাদা করার প্রশ্ন;
৪. সন্ত্রাস বলপ্রয়োগ, সহিংসতা, ক্ষমতা প্রয়োগ বা প্রভাব খাটানো থেকে কি আলাদা?, নাকি সন্ত্রাস এদেরই একটা সাব-ক্যাটাগরি বা আরেকটি ধরন মাত্র।
৫. সন্ত্রাসের বৈধতা বা সন্ত্রাস আদৌ বৈধ হতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন;
৬. গেরিলা যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ;
৭. অপরাধ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য।" [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট টেররিজমের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে, "premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience." জনগণকে প্রভাবিত করবার জন্য কোন দল বা গোষ্ঠী যদি পরিকল্পিতভাবে বেসামরিক টার্গেটের ওপর সহিংস হামলা চালায় তাহলে সেটা টেররিজম"। [১৪]

"পল পিলার (Paul Pillar) একসময় যিনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই-এর কাউন্টার টেররিস্ট সেন্টারের ডেপুটি প্রধান ছিলেন তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন।

১. এটা পরিকল্পিত কাজ হতে হবে, হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া সহিংসতা সন্ত্রাস নয় বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে তাকে আলাদভাবে বিচার করতে হবে। আবেগের বশে বা হঠাৎ উত্তেজনাকর সহিংসতা ঘটে। কিন্তু সেই সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নয়। কারণ তা পূর্বপরিকল্পিত নয়।

২. সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মাত্রই রাজনৈতিক, মাফিয়া গোষ্ঠির বা অপরাধী গোষ্ঠীর সন্ত্রাস আর যে অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাস' ব্যবহার করে তার মধ্যে পার্থক্য আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সন্ত্রাস মাত্রই রাজনৈতিক সন্ত্রাস, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে সহিংসতা তাকেই সন্ত্রাস বলা হয়। অপরাধমূলক সহিংসতা সন্ত্রাস নয়।

৩. সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের টার্গেট বেসামরিক নাগরিক, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেনাবাহিনী নয়।

৪. একটি দেশের সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড সন্ত্রাস নয়, সন্ত্রাস শব্দটি সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এই কর্মকান্ডের হোতা একটি দেশের অভ্যন্তরে কোন দল বা গোষ্ঠী (subnational groups)।" [১৫]

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, সন্ত্রাস রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত হবে। তার মানে, যে-সন্ত্রাসের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই সেটা নিছকই অপরাধমূলক সহিংসতা, সেটা টেররিজম নয়। দ্বিতীয়ত, টেররিজমের টার্গেট সামরিক প্রতিষ্ঠান নয়, বেসামরিক লক্ষ্যস্থল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি দ্বিমুখী। যেমন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন যদি ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে তাহলে সেটা কি সন্ত্রাস হবে? মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অভিমত হচ্ছে সেটা সন্ত্রাস হবে। কিন্তু পাশাপাশি ইসরাইলি সেনাবাহিনী যদি প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে আক্রমন করে তবে সেটা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হবে না।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের লড়াকুদের আক্রমণ 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে না, কিন্তু মার্কিন তাবেদারীর বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণ সন্ত্রাসী হামলা বলেই গণ্য হবে। সন্ত্রাস সম্পর্কে এ হলো আমেরিকার এক চোখা নীতি।

"গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইন, ১৯৯২ এ সন্ত্রাসমূলক অপরাধ অর্থে বলা হয়েছে-

ক. কোন প্রকার ভয় ভীতি প্রদর্শন করে বা বেআইনী বল প্রয়োগ করে -

(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোন নামে অর্থ বা মালামাল আদায় বা অর্জন করা।

(২) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশ পথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা কোন যান চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন করা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন যান বাহনের ক্ষতি সাধন করা।

গ. ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, আইনের অধীন গঠিত, স্থাপিত বা সৃষ্ট কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা কোন কোম্পানী, ফার্ম বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কোন দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর যেকোন সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাংচুর করা।

ঘ. কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন অর্থ, অলংকার, মূল্যবান জিনিসপত্র বা অন্য কোন বস্তু বা যানবাহন ছিনতাই করা বা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া।

ঙ. রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশে পাশে বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন বালিকা, কিশোরী ও তরুণীসহ যেকোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে অশ্লীল ভাবে উত্যক্ত বা হয়রানি করা।

চ. কোন স্থানে, বাড়ীতে, দোকানে, হাট-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, যানবাহনে বা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিতভাবে বা আকস্মিকভাবে একক বা দলবদ্ধ ভাবে শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন করে ভয়-ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বা বিশৃংখলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

ছ. কোন প্রতিষ্ঠানের দরপত্র ক্রয়ে, গ্রহণে বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা কাহারও দরপত্র গ্রহণে বিধি বহির্ভূতভাবে বাধ্য করা।" [১৬]

সন্ত্রাস শব্দটি সম্পর্কে বাংলাদেশের সামান্যতম সচেতন মানুষটিও ধারণা রাখেন। অথচ মাত্র দু'দশক আগেও শব্দটির এত ব্যাপক প্রচলন ছিল না। প্রচলন না থাকার কারণ থেকেই বোঝা যায় ঐ সময়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপও এত ব্যাপক হারে ছিলনা। বর্তমানে এমন একটি দিনও নেই যেদিন দেশে অন্ত তঃ কয়েকটি গুরুতর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়।

বর্তমানে সন্ত্রাস দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। সরকারের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী দপ্তর, বেসরকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থা, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত বাহিনী, গ্রাম-গঞ্জ, প্রত্যন্ত অঞ্চল, রাস্তা-ঘাট, সড়ক, নৌ ও আকাশ পরিবহণ, গহীন অরণ্য, মধ্য সমুদ্র সর্বত্রই সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ। মূলতঃ স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাশীল প্রভাবশালী শ্রেণীবিশেষের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আবার সন্ত্রাসী বলতে আমরা তাকেই বুঝে থাকি, যে বিশেষ ধরণের অপরাধের সাথে জড়িত। একজন সন্ত্রাসী একই সাথে কয়েক ধরণের অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। প্রথমতঃ সে আইন ভঙ্গকারী, দ্বিতীয়তঃ সে অন্য মানুষের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার হরণকারী, তৃতীয়তঃ তার কাছে সাধারণ মানুষের জান-মাল নিরাপদ নয়। চতুর্থতঃ অপরাধ সংঘটনে সে বেপরোয়া। এছাড়া আরো অনেক খারাপ বৈশিষ্ট্য একজন সন্ত্রাসীর মধ্যে বিদ্যমান। ক্ষমতা ও প্রভাবশালীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী সন্ত্রাসী পরিচয়ধারী এই ঘৃণিত শ্রেণীটি অবৈধ অস্ত্র ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সমাজে ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আধিপত্য বিস্তারে তৎপর হয়। আইন ও প্রশাসনের ব্যাপক দুর্বলতার কারণেই সন্ত্রাস সমাজে এ জাতীয় কার্যকলাপ হচ্ছে বলে মনে হয়।

সবশেষে বলা যায়- সমাজের সর্বত্রই সন্ত্রাসের কালো থাবা বিস্তৃত। সন্ত্রাসের দরুণ জনজীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসের কবলে মানুষ আজ অসহায়। এহেন পরিস্থিতি থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চায়। চায় স্বস্তির নিঃশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস বর্তমান শতাব্দীর সব'চে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার সৌধকে ভেংগে চুরমার করে দিচ্ছে। সমাজ ও সভ্যতার ক্যান্সার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে সন্ত্রাস। সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্য আজ সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সন্ত্রাসের মূল কারণ চিহ্নিতকরণ, দমন প্রক্রিয়া ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা আজ সময়ের বড় দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে সন্ত্রাসকে নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

ক. রাজনৈতিক সন্ত্রাস ঃ "সাধারণত রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের প্রয়াসেই এ ধরনের সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। উদ্দেশ্য, তৎপরতা ও কর্মসাধন প্রণালীর দিক থেকে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের নমুনা নিম্নরূপঃ যেমন- অনেক সময় দেখা যায় কোন দেশে সরকার তার নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করার বা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ত্রাসী কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এ ধরনের সন্ত্রাসকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কিংবা সরকার সৃষ্ট সন্ত্রাস বলা যায়। সত্তর ও আশির দশকে দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন দেশে এক নায়কগণ রাজনৈতিকভাবে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে গুম বা গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসের নজির স্থাপন করে। অনেক সময় ধর্মীয় মতবাদও এ ধরনের সন্ত্রাসের কারণ হতে পারে।" [১৭]

খ. অপরাধিচক্র চালিত সন্ত্রাসঃ "সাধারণত সকল সন্ত্রাসী কার্যই অপরাধের আওতায় পড়ে। তবে যখন কোন অপরাধী গোষ্ঠি বিশেষ কোন সুবিধা বিশেষতঃ আর্থিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় সন্ত্রাসী কর্ম তৎপরতা চালায়, তখন তাকে অপরাধী চক্র চালিত সন্ত্রাস বিবেচনা করা যেতে পারে। সন্ত্রাসীরা তাদের এ ধরনের তৎপরতাকে অনেক সময় খোঁড়া যুক্তির বেড়াজালে ন্যায়সংগত সন্ত্রাস হিসেবে বিবেচনা করতে প্রয়াসী হয়। বাংলাদেশে মুক্তিপণ আদায় আগ্রহীদের অপহরণমুলক কর্মকান্ডকে এ ধরনের সন্ত্রাসের আওতায় অনায়াসেই আনা যায়। তা ছাড়া আর্থিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ও ট্রেন চলাচলের পথে সংঘটিত সন্ত্রাসী তৎপরতাকেও এ শ্রেণীর সন্ত্রাসের আওতাভূক্ত করা যায়।" [১৮]

গ. আনবিক সন্ত্রাস ঃ "আধুনিক বিশ্বে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে আনবিক সন্ত্রাসকে এক নতুন সংযোজন হিসাবে বিবেচনা করা যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের প্রসারের সংগে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিকাশ ও প্রয়োগের ফলে একদিকে যেমন অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে এর ফলেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র আনবিক বিস্ফোরণের ফলে সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরে সন্ত্রাসী তৎপরতায় ক্রমশই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৮৯ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠি তাদের দাবী পুরণ না করলে পুর্বাঞ্চলের একটি বড় নগরীতে আনবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেয়।" [১৯]

ঘ. শিক্ষাংগনের সন্ত্রাসঃ শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস একটি অতি সাম্প্রতিক সমস্যা। সম্ভবতঃ বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথায় শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের এমন নিরবচ্ছিন্ন ও অনভিপ্রেত ঘটনার নজির নেই। তবে বাংলাদেশের শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের ঐতিহাসিক পেক্ষাপট বিবেচনার জন্য একটু নিকট অতীতে গিয়ে এর প্রাসঙ্গিক দৃশ্যপট তুলে ধরা প্রয়োজন। এ শতাব্দিরই ষাট দশকের গোড়ার দিকে এদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি ও মুক্তবুদ্ধি চর্চাকারী শিক্ষকগণের উপর এন.এস.এফ নামক ছাত্র সংগঠনের হস্তক্ষেপ ও নগ্ন হামলাকে এদেশে শিক্ষাংগনে সরকারী মদদ পুষ্ট প্রকাশ্য সন্ত্রাসের নজির হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। "সরকারী মদদপুষ্ট এন.এস.এফ নামে এই পেশাদার বাহিনী আইয়ুব খান ও তার সামরিক শাসক বিরোধী 'ছাত্র আন্দোলন' দমনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। এন.এস.এফ বাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত নজির হিসেবে ১৯৬৪ সালের ২২ শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জনের প্রয়াসে সক্রিয় সর্বদলীয় ছাত্র নেতাদের ওপর অনুষ্ঠানের আগের দিন অর্থাৎ ২১শে মার্চ ডাকসু অফিসে অতর্কিত কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পিত আক্রমণের ন্যক্কারজনক ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সন্ত্রাসী তৎপরতার পাশাপাশি সরকারী সমর্থনপুষ্ট এন.এস.এফ. বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফা বানচাল করার প্রয়াসে ২২ দফা দাবিনামাও পেশ করে।" [২০]

ঙ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসঃ আমেরিকা-বৃটেন কর্তৃক ইরাক দখলের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সন্ত্রাসের কালো থাবা গ্রাস করেছে। এ যাবৎ স্বীকৃত ও লালিত আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি মূল্যবোধকে, সভ্যতাকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে আদিম বর্বরতার যুগে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলকে মদদ দেয়াই যথেষ্ট মনে না হওয়ায় তারা সরাসরি মিথ্যা অজুহাতে ইরাক দখল করে নিয়ে প্রমাণ করলো বিশ্ব বিবেক বলে কিছু নেই। ১১/০৯/০১ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের অজুহাতকে সামনে রেখে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে। নিশ্চিত হয়েছে ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং কুক্ষিগত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ। ইরাকের পরে এখন একে একে ইরান, সিরিয়া ও অন্যান্য আরব দেশ দখলের পাঁয়তারা চলছে। আফগানিস্তান দখলের পর লাদেনকে খুঁজে বের করার ও ধরার তৎপরতা থেমে গেছে। কারণ, লাদেন'কে ধরলে সন্ত্রাস দমনের অজুহাত দুর্বল হয়ে পড়বে, এসব দেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জোরদার হবে। তাই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসকে জিইয়ে রেখেই সন্ত্রাস দমন নামক বৃক্ষের বিষ ফল ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী থেকে বিতাড়িত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইহুদীদের পুনর্বাসিত করার জন্য আমেরিকা ও বৃটেনের নেতৃত্বে আরব ভূমিতে ফিলিস্তিনিদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হলো ইসরাইল রাষ্ট্র। শুরু হলো বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস। নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনীরা সেই থেকে পিএলও, হামাস ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্বে চালিয়ে আসছে মাতৃভূমি পনরুদ্ধারের সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ। আমেরিকা-বৃটেনের দৃষ্টিতে এসব মুক্তিযোদ্ধারা সন্ত্রাসী, আর নির্বিচার গণহত্যার নায়ক শ্যারন হলেন শান্তিবাদী ।

সৌদি রাজতন্ত্রের বিরোধিতার জন্য আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ওসামা বিন লাদেনের উত্থান। পরে তাকে ব্যবহার করা হয় আফগানিস্তানে তালেবানদের সহযোগী হয়ে রুশদেরকে উৎখাত করতে। আফগানিস্তানে রুশদের পরাজয়ের পরে লাদেনের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল আমেরিকার কাছে। ততদিনে তালেবানদের সাথে থেকে লাদেনকে পেয়ে বসেছে ইসলামী জিহাদের দীক্ষা। ঠিক এমন মহূর্তেই আক্রমণ করা হল টুইন টাওয়ার আর পেন্টাগণে। কোন প্রকার নিশ্চিত তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এর দায়ভার চাপানো হল লাদেনের উপর। এরই সূত্র ধরে আমেরিকা দখল করে নিল লাদেনের আশ্রয়স্থল আফগানিস্তান।

মুলতঃ ইসরাইলের নিরাপত্তা ও ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভান্ডারের হাতছানিতে আমেরিকা অজুহাত খুঁজতে থাকে ইরাক আক্রমণের । শেষ পর্যন্ত ভুয়া অজুহাতে ইরাক দখলও সম্পন্ন হয়। কাজেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস আমেরিকা-বৃটেন চক্রেরই সৃষ্টি। সুদূর প্রসারী আগ্রাসনের নীল নকশার অংশ হিসাবেই বিশ্বে পরিকল্পিত সন্ত্রাস সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

চ. দুর্নীতিও এক ধরনের সন্ত্রাসঃ দুর্নীতি শব্দটি বিশেষ বিনিময়, কাজ বা আচরণকে নির্দেশ করে। Joseph Nye এর সংজ্ঞায় "দুর্নীতি এমন ব্যবহার যা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কোনো বিশেষ দায়িত্বে মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন থেকে বিচ্যুত করে।" [২১]

Dhaka University Institutional Repository

একজন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, "দুর্নীতি স্বতন্ত্র, সমাজবিচ্যুত বা নৈর্ব্যক্তিক কোনো বিষয় নয় বরং এটি মানবাচরণ বা অন্যান্য কিছু জটিল সামাজিক চালকের সমন্বয়, যার কোনো কোনটি বিমূর্ত বা সবসময় বোধগম্য নয়।" [২২]

দুর্নীতি সম্পর্কে Huntington মন্তব্য করেছেন যে, দুর্নীতি সরকারি কর্মকর্তাদের এমন এক ধরনের আচরণ যা জনকল্যাণের জন্যে আকাঙ্খিত আচরণের বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। [২৩]

দুর্নীতির সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি দিয়েছে World Bank। World Bank এর মতে, ব্যক্তিগত লাভালাভ অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থের জন্যে, "যে গোষ্ঠীর কাছে ব্যক্তি কর্তব্য হিসেবে কিছু দিতে বাধ্য থাকে" সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারই হচ্ছে দুর্নীতি। [২৪]

দুর্নীতির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের সরকারি সেবা পাওয়া এক ধরনের অসম্ভব বিষয়ে পরিণত হয়। দুর্নীতির কারণে বিশেষ ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ফলাফল পেলেও সরকারি সব কাজ অত্যন্ত দেরীতে হয়। এজন্য যে কাজ করতে একমাস লাগার কথা তাতে হয়ত দুই মাস বা তিনমাস সময় লাগছে। এ সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীর বেতন-ভাতা সরকারকেই বহন করতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক টাকা গচ্চা যাচ্ছে এবং একই সাথে 'delay cost' তো রয়েছেই। আবার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যখন দুর্নীতি করেন তখন রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্যাবলীও পাচার হয়ে যেতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে গেলে বিভিন্ন স্থানে ঘুষ দিতে হয়। কাজেই, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এতে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগের আগ্রহ কমে যায়। দুর্নীতি সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ায়। ফলে, সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সন্ত্রাস সমাজের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করে।

ছ. তথ্য সন্ত্রাসঃ আজকের দুনিয়ায় স্যাটেলাইট ও মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচার, যাকে আমরা তথ্যসন্ত্রাস বলে থাকি, সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে মরাত্মক সন্ত্রাসী অস্ত্র। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের এ যুগে প্রচার মাধ্যম তথা মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবহারে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার ও বিশ্বাস করানোর এক মোক্ষম হাতিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের দোসর গোয়েবলস এটা প্রমাণ করেছিলেন। আরেক বার এর প্রমাণ পাওয়া গেল আমেরিকা ও বৃটেন কর্তৃক সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তুলে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করে ২০০১ সালে আফগানিস্তান দখল এবং ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ধোঁয়া তুলে ২০০৩ সালে ইরাক দখলের মাধ্যমে। সেই সাথে সমান তালে চলছে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ ও অপপ্রচার। যেহেতু বিশ্বে প্রায় সকল প্রচার মাধ্যম পরাশক্তিগুলোর দোসর ইহুদীদের করায়ত্ত, তাই এ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সীমিত। আর এ কারণেই ইসলামের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রের অব্যর্থ প্রয়োগ হচ্ছে।

জ. চলচ্চিত্রে সন্ত্রাসঃ "বাংলাদেশের বেশিরভাগ চলচ্চিত্রেই বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া দুস্কর। ভিত্তিহীন এসব ছবিতে যে কাহিনী, চরিত্র, অভিনয়, সাজ-সজ্জা, নাচ-গান থাকে তা যেমনি উদ্ভট তেমনি যুক্তিহীন ও হাস্যকর। এসব ছবির পাত্র-পাত্রীরা কোন দেশের এবং কোন সময়ের তা বোঝা দুঃসাধ্য। বাংলাদেশী সিনেমায় প্রদর্শিত মারদাঙ্গা ও সন্ত্রাস দেখে অপরাধীরা যেমন রপ্ত করে অপরাধ সংগঠনের নতুন নতুন পদ্ধতি তেমনি অধিকাংশ যুবক শ্রেণীর দর্শকই সিনেমায় প্রদর্শিত এসব সন্ত্রাস- সহিংসতা দেখে উৎসাহিত হয়ে লিপ্ত হয় বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে এবং সমাজের জন্যে বয়ে নিয়ে আসে ব্যাপক অবক্ষয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের চলচ্চিত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবসা। এ কারণেই এক ধরনের চিত্র নির্মাতা সবসময় এধরনের ছবি নির্মাণে আগ্রহী। মারপিট, উত্তেজক, অশ্লীল নাচগান, ভাঁড়ামো ইত্যাদি স্থূল বিনোদনে ঠাসা থাকে এ ছবিগুলো। এসব ছবিতে থাকে না কোনো যুক্তি, বাস্তবতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। ছবিগুলোর নামের ক্ষেত্রেও থাকে ভয়াবহতা। যেমন-ধর, খাইছি তরে, ভয়ানক সংঘর্ষ, খ্যাপা বাসু, আমি গুন্ডা আমি মাস্তান, মহাসংগ্রাম, আজকের ক্যাডার, বিদ্রোহী মাস্তান ইত্যাদি।" [২৫]

ঝ. এসিড সন্ত্রাসঃ "নারী নির্যাতনের যে বর্বর রূপ প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো এসিড নিক্ষেপ। সহজলভ্য এই এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়া হচ্ছে, নারীর চোখ, মুখ ও দেহ। পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এসিডের অপব্যবহার। শুধু নারী নির্যাতন নয়, বিভিন্ন সামাজিক বিরোধেও ব্যবহৃত হচ্ছে এসিড। ২০০০ সালে দেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ২২৬টি, যা প্রতিমাসে গড়ে ১৮.৮টি। আর ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে এসিডদগ্ধ হয়েছেন ২৭১ জন। এই এসিডদগ্ধের মধ্যে ৬৭ শতাংশই নারী। এসিডদগ্ধ ওইসব নারীর মধ্যে বেশিরভাগই কিশোরী।" [২৬]

প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তারা এসিডদগ্ধ হন। এসিডে পুড়ে যাদের মৃত্যু হয় তারা জীবন যন্ত্রণা থেকে একরকম বেঁচে যান বলা চলে; কিন্তু ঝলসানো মুখ আর বিভৎস দেহ নিয়ে যারা বেঁচে থাকেন তাদের অনেকেই মৃত্যুর প্রার্থনা করেন। ক্ষোভ, লজ্জা আর যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়ে তারা ধিক্কার জানায় এ সমাজকে।

সন্ত্রাসের উৎপত্তি এবং সমাজে এর স্থায়ী হবার কারণ

সন্ত্রাসের উৎপত্তির কারণ বিবেচনায় আমাদের অতীতের জুলুমবাজ শাসকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা ও সহিংসতা, অশিক্ষিত নিপীড়িত দুর্বল সামাজিক ভিত্তি এবং বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকেই বেশী দায়ী করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের খারাপ কাজ বা অপরাধ যেমন চুরি, ডাকাতি, খুন, ঝগড়া ইত্যাদির কারণ নির্ধারণ করলে যেসব বিষয় আসে তার সাথে সন্ত্রাসের খুব কমই সাদৃশ্য আছে। অর্থ্যাৎ সন্ত্রাসকে আমরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট নতুন ধরণের অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি যা অতীত ক্রম বিকাশের পরিবর্তিত রূপ। তারপরও অতীতের যে সকল প্রেক্ষাপট সন্ত্রাসের উদ্ভবের জন্য দায়ী তা আলোচনা করা যায়।

ক. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

"বাংলাদেশ সহ উপমহাদেশীয় ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় এই উপমহাদেশের লোকজন ছিল অনেকটাই সহজ সরল। এই সুযোগ নিয়ে দূর কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকার দস্যুরা এমনকি শাসকরাও এদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। বৃটিশ আমলে নীলচাষ এবং সাহেবদের অত্যাচার ছাড়াও প্রদেশীয় অত্যাচারী জমিদারদের কবলে মানুষ শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেকবার। এইসব অনৈতিক ও অমানবিক আচরণ এদেশে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছে তা পরবর্তীতে বিপথগামীদের অপশিক্ষা রূপে আকৃষ্ট করেছে যা, সমাজে 'সন্ত্রাসী'র মতো আদর্শবিচ্যুত শ্রেণীর উদ্ভবের একটি অন্যতম কারণ।" [২৭]

খ. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

"রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এদেশে সন্ত্রাস বিকাশের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সন্ত্রাসের একটি মূল লক্ষ্য মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তুলণ্ঠিত করা। রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তাই

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসের ব্যবহার এত বেশী। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তরুণ সমাজকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভুল পথে চালিত করে ব্যবহার করা। এটা আমাদের দেশে যেরকম নিলর্জ্জভাবে করা হয়ে থাকে তার কোন জবাব নেই। বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোই সন্ত্রাসী পুষে থাকে। এসব দলসমূহের নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে। সাধারণতঃ এলাকার কুখ্যাত মাস্তান শেষ পর্যন্ত কোন একটি রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে এসে আরও বড় এবং জাতীয়ভাবে পরিচিত মাস্তানে পরিণত হয়। তারা ব্যবহৃত হয় ভোটকেন্দ্র দখল, প্রতিপক্ষের সভায় অস্ত্রসহ হামলা করা এসব কাজে। বিনিময়ে পায় অপরাধকর্মের নিষ্কন্টন পরিবেশ ও অবাধ সুযোগ।" [২৮]

গ. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

আমাদের সমাজকে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এর মধ্যে সন্ত্রাসের শেকড় খুঁজে পাবো। সন্ত্রাস একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। এটা সমাজের রুগ্নতা ও অসুস্থতাকেই নির্দেশ করে। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাই এই ব্যাধির সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

সমাজের বেশীরভাগ লোক অশিক্ষিত, দুর্বল ও অভাবক্লিষ্ট হওয়ায় তারা একজন সন্ত্রাসীর প্রকৃত দুর্বলতা বা ক্ষমতা আঁচ করতে পারে না। সামাজিক ভিত্তি সংঘবদ্ধ ও দৃঢ় নয় বলেই সন্ত্রাসীদের প্রতিবাদ করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না। উপোরন্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীরা সহজেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সমাজের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে থাকে। সর্বসাধারণের জন্য আইনের সহজ প্রয়োগ না থাকায় সর্ব স্তরের জনতা, ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবি, ব্যবসায়ী সহ সকল শ্রেণীর সার্বিক কর্মকান্ডের উপর সন্ত্রাসের কুপ্রভাব পড়ে থাকে। ফলে মুকিম গাজী, এরশাদ শিকদারের মত সন্ত্রাসীরা সমাজে অলিখিতভাবে একটি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। সাধারণ সমাজিক বাসিন্দাদের কেউ এদের অন্যায় প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

"সন্ত্রাসী শ্রেণীর উত্থানে দেখা গেছে, কখনো কখনো সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষ তাদের ক্রমাগত দুরাবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে বৈষম্যমূলক প্রশাসন ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। তারা বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং জোর যার মুলুক তার নীতিতে আইনকে নিজ হাতে তুলে নেয়। ফলে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ শুরু হয়। দেখা দেয় সামাজিক বিশৃঙ্খলা। নৈতিক শিক্ষার অভাবজনিত কারণে তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উচিত অনুচিতের পার্থক্য করতে পারেনা। এভাবেই সমাজে সন্ত্রাসের উদ্ভব হয়। এই সব সন্ত্রাসীরা একসময় আইনের পাশ কাটিয়ে প্রভাবশালীদের স্বার্থ সংরক্ষণের চুক্তিতে তাদের নিকট আশ্রয় ও আনুকুল্য পায় এবং সমাজে স্থায়ীত্ব লাভ করে।" [২৯]

সন্ত্রাসের কারণ

সমাজই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং সন্ত্রাসকে লালন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। মোটকথা, সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণেই সন্ত্রাস হয়ে থাকে। যেমন-

ধনীক গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য

সমাজের এক শ্রেণীর অশুভ ধনীক গোষ্ঠী সাধারণের উপর শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে। এর ফলে তারা ব্যাপক সম্পদশালী হয়ে থাকে। কিন্তু এই পর্যায়ে পৌছানোর জন্য তাদের সমাজে অবৈধ আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজন পড়ে। এই কাজের জন্য একটা শ্রেণী সৃষ্টি করে যারা সাধারণের উপর ভীতি ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে শোষণ ও অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই মধ্যবর্তী শ্রেণীটিই নীতি ও মানবিকতা ভুলে গিয়ে উর্দ্ধতনের আদেশ বাস্তবায়ন করে থাকে। তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়। বিনিময়ে তারা পায় সাময়িক নিরাপত্তা, আর্থিক সুবিধা ও অবৈধ কার্যকলাপের সুযোগ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করা এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দুইভাবে সন্ত্রাসীদের মদদ যোগায়। এক. স্বাভাবিক মানুষ থেকে সন্ত্রাসী শ্রেণী সৃষ্টির মাধ্যমে। দুই. কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের মদদ দানের মাধ্যমে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অসাধু নেতাদের কাছে সন্ত্রাসীদের অনেক চাহিদা রয়েছে। মুলতঃ তাদের উপর নির্ভর করেই তারা ক্ষমতা ও নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। এজন্য ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও সন্ত্রাসীদের সমস্যা হয়না। কারণ তখন নতুন ক্ষমতাশীনদের নিকট থেকে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় ও মদদ পেয়ে থাকে। এভাবে সমাজে সন্ত্রাসীদের প্রভাব থেকেই যায়।

অবৈধ পথে ফায়দা লুটার সুযোগ হিসেবে

সমাজের অধিকাংশ প্রভাবশালী ব্যক্তিই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে বলে সন্ত্রাসীদের প্রয়োজন হয়। পাচার, চোরাকারবারী, অবৈধ ব্যবসা, অবৈধ উপার্জন যেমন, ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডার, লাইসেন্স, পারমিট, জমি দখল, টার্মিনাল নিয়ন্ত্রন, ভেজাল ব্যবসা, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কাজে সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে। তাই এসব কাজে সন্ত্রাসী ও অবৈধ প্রভাবশালীদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লেনদেন ও চুক্তি থাকে। এসবের সাথে জড়িত থাকে দুর্নীতিবাজ প্রশাসন। কখনো সংবাদ সংস্থা বা মিডিয়ার লোকজনও এসব অপকর্ম থেকে ফায়দা লুটে পাশ কেটে যায়।

সন্ত্রাসীদের মধ্যে আদিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার কারণে

সন্ত্রাসীদের সকল পথ নিষ্কন্টক নয়। স্বার্থহানির কোন কারণ ঘটলেই প্রভাবশালীদের সাথে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সহিংসতা ঘটে থাকে। এর ফলে সন্ত্রাসীদের মধ্যে দেখা যায় আশ্রয়দাতাদের মধ্যে রদবদল। আবার সন্ত্রাসীরা নিজেদের সুবিধার জন্য তৈরী করে বিভিন্ন গ্রুপ। এসব গ্রুপ অন্য সাধু কিংবা অসাধু প্রতিপক্ষের সাথে নানা সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে সন্ত্রাসীদের অন্তঃদলীয় কোন্দল ও বর্হিদলীয় কোন্দলের কারণে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এভাবে সমাজে সন্ত্রাসের পরিমান বেড়ে যায়। খেসারত দিতে হয় সমাজের সাধারণ মানুষকে।

সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিভিন্ন ধরণ

এমন কোন খারাপ কাজ নেই যা সন্ত্রাসীদের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়। ক্ষমতা, সুযোগ ও নিষ্ঠুরতার মাত্রা অনুপাতে সন্ত্রাসীরা নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে থাকে। নিচে এর কিছু নমুনা প্রদর্শন করা হলো।

হত্যা

পত্রিকার পাতা উল্টোলেই আমাদের চোখে পড়বে এক বা একাধিক হত্যার খবর। হয়তো নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হয়েছে এমন কোনো মানুষের বিকৃত মুখচ্ছবি বা দেহ। এমন কোনো দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না যেদিন পত্রিকার পাতায় অন্ততঃ একটি খুনের খবর ছাপা হয়নি। প্রতিনিয়ত আমাদের দেশে ঘটছে হত্যাকান্ড।

"এলাকা ভেদে এসব হত্যাকান্ড যেমন ঘটছে দেশের প্রত্যন্ত কোনো গ্রাম বা গঞ্জে আবার ঘটছে ছোট শহর থেকে রাজধানী শহর ঢাকাতেও। প্রতিদিনের পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র বলে দেয় আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক প্রাণ হারায় অন্যের হাতে। এসব হত্যাকান্ডের পেছনে কারণ থাকে নানাবিধ। ব্যক্তি বা পারিবারিক আক্রোশ এর মধ্যে অন্যতম। কখনো কখনো গোষ্ঠীগত ও রাজনৈতিক দলাদলিতেও প্রাণ হারায় অনেকে। প্রেমের টানাপোড়েন, ব্যর্থতার জন্যেও না পাওয়া প্রিয় মানুষটিকে হত্যা করার খবর আমরা পেয়ে থাকি। আবার কখনো জৈবিক প্রবৃত্তি মিটিয়ে হত্যা করা হয় শিশুকন্যা বা নারীটিকে। পুরুষ শাসিত এ সমাজে অনেককে বলি হতে হয় যৌতুকের কারণে। গণপিটুনীতেও মারা যায় অনেকে। কারণ

Dhaka University Institutional Repository

যাই হোক না কেন প্রতিদিন এসব দানবিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছে ঘরে বা বাইরে, লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। সন্ত্রাস বা জবাই করে হত্যার ভয়াবহ সংবাদসমূহে যেমন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চিত্র ফুটে উঠে তেমনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাত্রা নির্দেশ করে।" [৩০]

ধর্ষণ

"নারী নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ হচ্ছে ধর্ষণ। কোনো মহিলা একবার ধর্ষিতা হলে সারাজীবন তাকে সে গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়। অথচ তিনি ধর্ষণের অসহায় শিকার মাত্র। সমাজ তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ, আইন তাকে রক্ষা করেনি, আত্মীয়-স্বজন তাকে সাহায্য করেনি। এর জন্য তাকে সারা জীবন গ্লানী বয়ে বেড়াতে হয়। একজন নারীর জীবনে ধর্ষণ সবচেয়ে অপমানজনক ঘটনা এটা সত্যি। কিন্তু এটাই তার জীবনের শেষ, নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে চলে আসা পথের সমাপ্তি, এ ভাবনার বীজ সমাজের মাথায় বা নারীর চেতনায় বপন করেছে পুরুষই। ধর্ষিত নারীকে কলঙ্কিত আখ্যা দেয়া, তাকে লোকলজ্জা, হয়রানি, হুমকির মাধ্যমে মানসিকভাবে বিপন্ন করে রাখার মধ্যে এক পাশবিক পৌরুষজনিত উল্লাস ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য কাজ করে না। কিন্তু সভ্যতার এই প্রান্তে এসেও নারীকে একাই কেন বয়ে বেড়াতে হবে ধর্ষণের লজ্জা, কেন তাকেই প্রমাণ করতে হবে ধর্ষণের অভিজ্ঞতা? অপরাধ বিজ্ঞানের মতে ধর্ষণের জাত, কাল সমাজ নেই । স্বাভাবিক এক যৌন প্রবৃত্তির সুযোগ, পরিস্থিতি, মানসিক অস্থিতিকর মুহূর্ত ধর্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ধর্ষণের এই স্বাভাবিক সংজ্ঞা মেনে নিলেও যে ধর্ষিত হয় তার জীবন আর স্বাভাবিক থাকে না। একটা দুর্ঘটনায় হাত-পা হারালেও মানুষ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু ধর্ষণের আকস্মিক ধাক্কা এবং গ্লানির বোঝা গিয়ে পড়ে মেয়েটির ওপর। মানসিক আড়ষ্টতা বরণ করে নিতে হয় তাকে।" [৩১]

এ ব্যাধি যতটুকু না তার নিজের, তার চেয়ে বেশি সমাজের। অতি সামাজিক মানুষ অপরাধীকে শাস্তি দিতে না পারলেও নির্যাতিতকে কোণঠাসা দেখতে পছন্দ করে। ধর্ষণকারীকে না ধরে, মেয়েদের আড়াল করে রাখতে চায় সুরক্ষা নামক ঘেরাটোপে। একজন ধর্ষণকারীর ধর্ষণের পরও পৌরুষ অটুট থাকে। কেবল মেয়েটিই আক্রান্ত হয় বিষণ্নতায়। আত্মপীড়নের মাধ্যমে অস্বীকার করে তার ওপর ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা যা আরও বেশি অসুস্থ করে তোলে। অবচেতনে নিজেকে খারাপ ভাবতে শুরু করে সে। এ ভাবনার অনেকটাই উস্কে দেয় পরিবার, সমাজ।

ছিনতাই

প্রতিদিনের নিত্তনৈমিত্তিক বিষয় হিসেবে ছিনতাই এর মত অপরাধ এখন প্রায়ই ঘটছে। রাস্তাঘাটে, পার্কে, মার্কেটে, স্টেশনে, পরিবহনে এমনকি পর্যটন এলাকায়ও ছিনতাই কারীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। রিক্সা, বাস, ট্রেন, লঞ্চসহ কোন স্থানই এখন নিরাপদ নয়। ঢাকার হাইকোর্টের বারান্দা থেকে কক্সবাজার সৈকত পর্যন্ত সর্বত্রই ছিনতাই হচ্ছে প্রকাশ্যে। উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা থেকে গৃহবধু, দিনমজুর সকলেই ছিনতাইকারীদের কবলিত হচ্ছে। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ ও প্রশাসন এর্য্যাপারে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকছে।

চাঁদাবাজী

চাঁদাবাজী এখন সন্ত্রাসীদের আরেকটি প্রক্রিয়া। রাস্তায় রিক্সা থামিয়ে চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে বাড়ীতে গিয়ে, মার্কেটে, বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, কারখানায়, অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই প্রকাশ্যে চাঁদাবাজী হচ্ছে। বেশীরভাগ চাঁদাবাজীই হয়ে থাকে রাজনৈতিক অজুহাত ও ছত্রছায়ায়। দৈনিক জনকণ্ঠের জানুয়ারী/২০০০ সালে প্রকাশিত রির্পোট অনুযায়ী ঈদের চাঁদাবাজী ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। চাঁদাবাজীর ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা কিংবা মন্ত্রীদের অনুমোদন থাকার দৃষ্টান্ত অতীতে লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এই অবৈধ পন্থা সমাজের স্বাভাবিক আদর্শকে বিচ্যুত করছে। সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ চাঁদাবাজীর কারণে জমি ক্রয়, বাড়ী তৈরী ইত্যাদি করতে পারছে না, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, মাস শেষে বেতন নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারছে না। অথচ চাঁদাবাজী বন্ধে এপর্যন্ত কোন সরকার আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

চুরি

কোনো অস্থাবর সম্পত্তি (Movable Property) যদি সম্পত্তির মালিকের সম্মতি ব্যতিত নেয়া হয় তখন তাকে চুরি বলে। চুরি অপরাধটি দুটি আবশ্যকীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। একটি বস্তুগত সত্য এবং অপরটি বিষয়গত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। প্রথম অংশ গঠিত হয় অপরের সম্মতি ব্যতিত তাহার দখলাধীন দ্রব্যের বিষয় এবং অপরটি একটি মানসিক কার্যক্রম তথা অসৎ অভিপ্রায়। কোনো কার্য অসৎ উদ্দেশ্যে করার অর্থ হচ্ছে যে, কার্যটি অপর ব্যক্তি হতে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার জন্যে অথবা অন্যায়ভাবে অপর ব্যক্তিকে ক্ষতি করার জন্যে। এই বিষয়গত অবস্থা বা উপাদানটি 'animus furandi' নামে পরিচিত, যাহা চুরি অপরাধের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যকীয় উপাদান এবং ইহা ব্যতীত চুরির অপরাধ সম্পন্ন হবে না। কোনো অস্থাবর সম্পত্তি যাহা এক ব্যক্তির দখল হতে অপর ব্যক্তির দখলে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে প্রকৃত অধিকার সম্বলিত দাবি-দাওয়া যদি তাহার নিজ সম্পত্তি অন্যের আইনানুগত দখল হতে সরিয়ে লয়। যদি তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাতে পারে তাকে চুরির অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে চুরির অপরাধে অপরাধী হিসাবে গণ্য হবেন। চুরি করে অন্যের সম্পদ বা সম্পত্তি হরণ করা অবশ্যই অধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। অনেকে হয়তো সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে হয়তো মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় বা সর্বহারা কেউ কেউ সমাজের চোখে হেয় প্রতীয়মান হয়।

ডাকাতি

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে কোনো দস্যুতা প্রকাশ করে বা করিবার উদ্যোগ করে সেক্ষেত্রে প্রকাশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি 'ডাকাতি' করে বলে গণ্য হয়। প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকার পাতা উল্টালে ডাকাতির খবর চোখে পড়ে। ডাকাতি সংঘঠিত হচ্ছে দেশের সর্বত্রই। মহানগরীর অভিজাত এলাকায় ভিক্ষুক ছদ্মবেশে বা কখনো কলিংবেল টিপে গৃহে প্রবেশ করে বাড়ির সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বা কখনো কখনো হাত-পা বেঁধে সর্বস্ব লুট করার খবর বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গৃহ ডাকাতির মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন বিশেষ করে লঞ্চ, ট্রেন, বাস ডাকাতির খবরও যাত্রীদের সার্বক্ষণিক ভীতির মধ্যে রাখে। বর্তমান সময়কার দেশে ডাকাতির চিত্র ভয়াবহতা নির্দেশ করে।

এসিড নিক্ষেপ

সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ। এসিড নিক্ষেপের দ্বারা ঝলসে দেয়া হচ্ছে একজন মানুষের মুখমন্ডল, বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে তার সুন্দর চেহারাটা। পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সারা দেহটি। ধুকে ধুকে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হচ্ছে একজন মানুষকে। এই ধরনের করুণ পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে। এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়ে থাকে প্রধানত কিশোরী, যুবতী ও গৃহবধুরা। ক্ষেত্রবিশেষ পুরুষরাও এ নির্মমতার শিকার হচ্ছে। শিকার যেই হোক না কেন স্থান-কাল ভেদে দেশের সর্বত্রই এ জঘন্য অপরাধটি বেড়েই চলেছে। শিকার হচ্ছে ধনীর কিশোরী থেকে দরিদ্র কুড়ে বাসিনী রমনীরাও। শ্রেণীভেদে এসিড নিক্ষেপের শিকার যেমন নানা বয়সের নারী-পুরুষ তেমনি এর পেছনে কারণও বহুবিধ। কখনো বা প্রেম নিবেদনে সাড়া না পেয়ে আবার কখনো প্রত্যাখান হয়ে, কখনো বা বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুকের জন্যে কখনো স্বামী স্ত্রীকে আবার ক্ষেত্র বিশেষ স্ত্রী স্বামীকেও এসিড মারছে। আমাদের সমাজে পুরুষরা স্ত্রীর কাছ হতে তালাক আদায় করার বিভিন্ন ফন্দী ফিকির এঁটে থাকে। জোর করে আদায় করা হয় তালাক। বিপত্তি ঘটে স্ত্রী যখন স্বামীকে তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন হয়তো স্বামী এসিডে ঝলসে দেয় স্ত্রীকে। তেমনি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে অনুমতি না দেয়া বা মেনে না নেয়ার কারণেও স্ত্রীর শরীর বা মুখমন্ডল ঝলসে দেয় পাষন্ড স্বামী। পারিবারিক কলহ, দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া, গোষ্ঠীগত বিবাদ, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ প্রভৃতি কারণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিকার হচ্ছে এসিড নিক্ষেপের।

অপহরণ ও মুক্তিপণ

জোর করে বা প্রলুব্ধ করে কোনো ব্যক্তিকে স্থানান্তর করার নাম অপহরণ। অপহরণের শিকার হন প্রধানত নারী ও শিশুরা। পাশাপাশি কিছু পুরুষ অপহরণের ঘটনাও ঘটে। শিশু ও পুরুষ অপহরণের মূল কারণ হচ্ছে, তাদেরকে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করা। অনেক সময় পারিবারিক শত্রুতার কারণেও অপহরণের ঘটনা ঘটে। মেয়ে শিশু ও নারী অপহরণের মূল কারণ পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা। প্রেম নিবেদনে সাড়া না দেয়া, বিয়েতে রাজি না হওয়া ইত্যাদি কারণে সাধারণত নারীরা অপহৃত হয়ে থাকে। নারী পুরুষ উভয়ই সমানভাবে অপহরণের শিকার হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপহরণ করে মেরে ফেরার ঘটনাও ঘটছে।

টেন্ডারবাজী

সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে টেন্ডার বাক্স দখল, অন্যকে টেন্ডার পেতে না দেওয়া, ইচ্ছা অনুযায়ী দরপত্রের হার দেওয়া ইত্যাদি স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে প্রভাবশালী সন্ত্রাসীদের দ্বারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। এর ফলে আইনের লঙ্ঘন, অন্যের গণতানিত্রক অধিকার হরণ করা হয়। এভাবে টেন্ডারবাজীর মাধ্যমে ক্ষমতাশীন সন্ত্রাসী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অবৈধ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লেন-দেন হয়ে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসন এক্ষেত্রে অসহায় কিংবা দুর্নীতিতে জড়িত থাকে। কিন্তু সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশ ও জাতি। দেশের ভৌত ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। লাভবান হচ্ছে সন্ত্রাসী ও লুটেরার দল।

দখল

বর্তমানে অবৈধ ও বৈধ দখলে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার হচ্ছে। জমির অবৈধ দখলে সন্ত্রাসীদেরকে ব্যবহারের বিকল্প নেই। আবার অনেকক্ষেত্রে বৈধ জমি বা ব্যবসা ইত্যাদি কোন কারণে অন্যের হাতে চলে গেলে তা পুনরুদ্ধারে সন্ত্রাসীদের ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রশাসনের প্রতি অনাস্থাই এর কারণ। আবার দেখা যাচ্ছে একই সন্ত্রাসীরা অন্যের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মূল মালিক থেকে জমি বেদখল করে ফেলেছে। মূলতঃ সন্ত্রাসীদের ক্রমাগত ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের উপর এ ধরনের নির্ভরশীলতা চলে আসছে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সমাজকে।

ভাড়াটে হিসেবে

সন্ত্রাসীদের যেহেতু কোন নীতি নেই সেহেতু ভাড়াটে হিসেবে তারা যেকোন কাজ করে থাকে। দেখা গেছে-চুরি, ডাকাতি, ভীতি প্রদর্শন, খুন, দখল, প্রতিপক্ষের হয়রানি, ইত্যাদি কাজে সন্ত্রাসীরা ভাড়াটে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নীতিহীনতার কারণে টাকার পরিমান কমবেশীর জন্য তারা একই ব্যক্তির পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করে থাকে। ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের সহজলভ্যতার কারণে সমাজে অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভোট কেন্দ্র দখল

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে কিংবা দলীয় সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটে থাকে। এভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সমাজের জন্য হিতকর হবে না এটাই স্বাভাবিক।

অবৈধ পাচার, ব্যবসা

যত প্রকার অবৈধ কার্যকলাপ হয়ে থাকে সবকিছুর জন্য প্রয়োজন খারাপ প্রকৃতির লোকজন। সন্ত্রাসীরা নিজেদের এসব কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করে এবং তাদেরকে ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের গডফাদারেরা অবৈধ ও নীতিহীন কার্যকলাপ চালিয়ে থাকে।

সন্ত্রাসী হবার কতিপয় কারণ

একজন মানুষ জন্মের পরই সন্ত্রাসী হয় না। সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিই তাকে সন্ত্রাসী হতে সাহায্য করে। কিন্তু সকলেতো সন্ত্রাসী হয় না। সুতরাং যারা সন্ত্রাসী হয় তারা নিজেরাই সন্ত্রাসী হবার পথটিতে কোন না কোন ভাবে আত্মসমর্পিত হয়েছে। সন্ত্রাসী হবার কতিপয় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক) নৈতিক অবক্ষয়

সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হবার ফলে নীতি-রীতি, ভাল-মন্দ, আইন-মানবিকতা ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা কমে আসতে থাকে। এই পরিবেশে বেড়ে উঠা একজন মানুষ সহজেই অবৈধ পন্থাকে গ্রহণ কে র ফেলে। তখনই তারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়াকে অস্বাভাবিক মনে করে না। তখন অন্যান্য খারাপ পন্থার মতো সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতেও তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

খ) দুর্নীতি সন্ত্রাসীর লালন ক্ষেত্র

বাংলাদেশে দুর্নীতির সূত্রপাত করেছেন কিছু অসৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং দুর্নীতির লালনও করেছেন তারা। বিগত সরকার গুলোর আমলে মন্ত্রী, এমপিদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি। জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচন গুলো এত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে যে, এখানে এখন সত্যিকারের রাজনীতিবিদদের পরিবর্তে কালো টাকার মালিকরাই নির্বাচন করছে। আগে শিল্পপতিরা একটা Interest group হিসেবে কাজ করতেন। এখন তারা রাজনীতির খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। এ কারণেও নির্বাচনে অর্থ এবং অস্ত্রের ছাড়াছড়ি হয়ে পড়ছে। এত টাকা খরচ করার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে নির্বাচিত হয়ে এ টাকাটা উঠিয়ে ফেলা এবং একই সাথে পরবর্তী নির্বাচনের অর্থ সঞ্চয় করা।

মূলত রাজনীতিবিদরা দুর্নীতি করছেন বলেই আমলা, পুলিশ, শিক্ষক সবাই দুর্নীতি করার সুযোগ পাচ্ছেন। বাংলাদেশের দুর্নীতির গ্রাস সর্বব্যাপী। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে দুর্নীতির বিকাশ এবং বিস্তার ঘটেনি। ফলে সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা দেখা দেয়। জন্ম নেয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। আমাদের ভবিষ্যত দুর্নীতির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সর্বত্রই। এ থেকে পরিত্রানের উপায় নেই। যে দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ দুর্নীতি পরায়ন সে দেশে সন্ত্রাসী জন্ম নিবে যুগে যুগে।

গ) অভিভাবকদের অবহেলা

অশিক্ষা, অভাব, দারিদ্র্য, পারিবারিক অশান্তি ক্ষেত্র বিশেষে বিত্তশালীদের মধ্যেও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যথার্থ নজর দিতে না পারার কারণে সন্তানের মধ্যে এক ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা বা

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বহীনতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে সন্তান কুসংসর্গে মিশতে থাকে, মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে কিংবা নোংরা রাজনীতি বা দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। এসব কারণে একসময় তাকে সন্ত্রাসী হতে সাহায্য করে। কিন্তু সময় মতো যদি অভিভাবকবৃন্দ সন্তানের প্রতি খেয়াল নেয় তাহলে সন্তান এই ভুল পথে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে পা বাড়াতো না।

ঘ) প্রভাবশালীদের মদদ

সামাজিক ক্ষমতা, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রভাব, আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা ইত্যাদি কারণে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ অসাধু প্রভাবশালীদের উৎসাহ ও মদদে আকৃষ্ট হয়ে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে। আবার আশ্রয়, নিরাপত্তা ও অবৈধ কার্যকলাপের সুবিধার জন্য কোন কোন কুখ্যাত সন্ত্রাসীও প্রভাবশালীদের আশ্রয় ও মদদ লাভ করে সমাজে তাদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। এভাবেই সন্ত্রাস লালিত হয়।

ঙ) প্রশাসনের দুর্বলতা ও আইনের শিথিলতা

প্রতিক্ষেত্রে প্রশাসনের দুর্বলতাই সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। সন্ত্রাসের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রশাসনের দুর্নীতিও প্রভাবশালীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বিধায় তাদের প্রতিপালিত সন্ত্রাসীরা প্রশাসন থেকে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা বেশী সুবিধা ও প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আবার কখনো আইনের দৃষ্টিতে দোষী চিহ্নিত হলেও বিভিন্ন ফাঁক ফোকরে পার পেয়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ প্রশাসন ও আইনের আশ্রয় নিতে আস্থাহীন হয়ে পড়ে। এজন্য সমাজে সন্ত্রাসীদের জয়-জয়কার অবস্থা।

চ) অস্ত্রের সহজলভ্যতা

অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা সন্ত্রাসীদের অপকর্মকে নানা সুবিধা দিচ্ছে। এর ফলে ভীতি সৃষ্টি সহজ হচ্ছে। কিন্তু দেশে অবৈধ অস্ত্রের আমদানি ও উদ্ধার মোটেই সন্তোসজনক নয়। একজন সন্ত্রাসী প্রথম জীবনে হাতে একটা অবৈধ অস্ত্র পেলে সে তার অপব্যবহারের জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরাধ।

ছ) অবৈধ ব্যবসা হতে অর্জিত বিপুল মুনাফা

অবৈধ ব্যবসায় মুনাফা অর্জন হয় প্রচুর। এসব কালো টাকা খরচের পথও হয় নানান অবৈধ পথে। ফলে মাদকসেবন, কুরুচিপূর্ণ বিনোদন, ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে। সব কিছুর সাথে বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যা, সেই সাথে অপরাধ ও সন্ত্রাস।

জ) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার

এখনও দেখা যাচ্ছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও শোষণের শিকার কোন কোন মানুষ জীবনের খেই হারিয়ে ফেলে সন্ত্রাসী দলের সাথে নিজেকে অর্ন্তভূক্ত করে নিচ্ছে। সমাজের ভুল পরিস্থিতিই এক্ষেত্রে তাকে ভুল পথে প্ররোচিত করছে। অভাব, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক দূরাবস্থা ইত্যাদির কারণেও সন্ত্রাসী হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

ঝ) প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, মাদকাসক্তি

এসব কারণে জীবনের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে একজন মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। তার এই বেপরোয়া মানসিকতার কারণেই সন্ত্রাসী হবার মতো চরম ভুল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে নিজের বিবেককে বিবেচনা করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

ঞ) সমাজ থেকে প্রতিবাদের ক্ষেত্র না থাকায়

সন্ত্রাস রোধে সমাজ থেকে প্রতিবাদের কোন ক্ষেত্র না থাকায় সন্ত্রাসীরা এই পথকে নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট মনে করে। ফলে অপকর্মে তারা অধিকতর সাহসী হয়। ফলে এই প্রতিবাদহীনতা একজন সাধারণ মানুষকে সন্ত্রাসের পথটি বেছে নিতে সাহায্য করে।

সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধে আমাদের করণীয়

সন্ত্রাস যেহেতু সামাজিকভাবে সৃষ্ট একটা ব্যাধি তাই সমাজেই এর প্রতিকার সম্ভব। এজন্য আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে।

ক) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অত্যাচার, নিপীড়ন ও লুটপাটসহ আরব বেদুইনদের জাতীয় জীবন ছিল নিত্যসঙ্গী। সে জাতিই পবিত্র কোরানের পরশে এসে সন্ত্রাস লুট পাট, হানাহানি ছেড়ে দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছে। কাজেই সন্ত্রাস সহ সকল অন্যায় দুর করতে হলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। কোন রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতা, মুসলিম শাসক বা রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম বলে ঘোষনা করলেই তাতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় না। একটি রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য।

প্রথমতঃ সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা ও স্বীকৃতি।

দ্বিতীয়তঃ একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহকে রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস হিসাবে ঘোষণা করা।

এছাড়া সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চয়তা, শিক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক নেতৃত্ব ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মমতের লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুবিচার সুদ মুক্ত, যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বানিজ্যনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক লেন-দেন। নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী সরকার, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পুনর্গঠন হচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের প্রধান কর্তব্য।

খ) নৈতিক অবক্ষয় রোধ

নৈতিক উৎকর্ষ সাধন ও আত্মিক প্রশান্তি লাভের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমান, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রতি ভালোবাসা, তাকে ভয় করা, পরকালে জবাবদিহিতার ভয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উন্নত চরিত্র, খোদাভীরু নেতৃত্বের অনুসরণ, আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো। আত্মিক অশান্তি দূরীকরণে ইসলাম আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য শাস্তির বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করেছে। চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারী নারী-পুরুষের উপর বেত মারা বা পাথর নিক্ষেপ। হত্যা, মদ, জুয়া, হাউজি ইত্যাদির ব্যাপারে কঠোর বিধান পালন করে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করেছে। সংস্কৃতির নামে বিশ্বব্যাপী যে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা চলছিল তা নিষিদ্ধ করে যুগোপযোগী, বাস্তবমূখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করেছে।

যুদ্ধ নয় শান্তি, ক্ষমা, বদান্যতা, উদারতা, দানশীলতা, কল্যাণ কামিতা ইত্যাদি গুণের উন্মেষ ঘটিয়েছে ইসলাম। যার ফলে প্রথম শতাব্দীতে ইসলাম সমগ্র বিশ্বে তার স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ) সমাজে প্রতিবাদের ক্ষেত্র গড়ে তোলা

সমাজে সন্ত্রাসের প্রতিবাদের ক্ষেত্র নেই। এর অন্যতম কারণ প্রশাসন ও আইন সর্বসাধারণের জন্য সহজ নয় এবং সামাজিক ঐক্য নেই। সমাজে প্রতিবাদের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে উপরের দুটি দিকেই সচেতন হওয়া আবশ্যক। সমাজের বৃহত্তর ঐক্য রক্ষার জন্য ধর্ম, সম্প্রদায়, রাজনীতিসহ ছোট-খাট সমস্যাগুলো পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সহমর্তিতার ভিত্তিতে মিটিয়ে ফেলতে হবে। তারপর সন্ত্রাসের মতো বড় সমস্যা মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে হবে।

ঘ) পরিবার থেকে প্রতিবাদের ক্ষেত্র তৈরী করা

প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের উচিত তাদের পরিবারের কেউ যাতে এসব কার্যকলাপের সাথে জড়িত না হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। কিন্তু কেউ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করলে ঐ পরিবার থেকেই তার প্রতিবাদ করা উচিত। বলা বাহুল্য নিজ পরিবার থেকে যদি ভুল বুঝিয়ে দেবার মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হতে বিরত করা সম্ভব হয় তা যতটা সহজ হবে অন্য কোন উপায়ে ততটা সহজ হবে না। তাই পরিবারের সকল সদস্যের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষার জন্য ঘর থেকেই প্রথম প্রতিবাদ করা উচিত।

ঙ) সন্ত্রাসীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ

সন্ত্রাসী একজন মানুষ। পারিপার্শ্বিক কারণে তার বিবেক ও চেতনা সাময়িকভাবে ভিন্নখাতে প্রলুব্ধ হলেও অন্যের মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে তার ভুল শোধরানো সম্ভব। এজন্য সমাজের মানুষের উচিত এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। মানুষকে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তন করার অনেক দৃষ্টান্ত সমাজে রয়েছে। একজন সন্ত্রাসীকে প্রথম থেকেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

চ) প্রশাসনকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট করা

কলুষিত প্রশাসনকে পরিস্থিতি বিদুরিত করতে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করতে হবে। ব্যাপক গণ আন্দোলন ব্যতীত বড় ধরণের রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রতিকার সম্ভব নয়। এজন্য নিয়মতান্ত্রিক গণ আন্দোলনের বিকল্প নেই।

পরিশেষে বলা যায়, সন্ত্রাস একটা সামাজিক ব্যাধি। সমাজের নানা বিশৃঙ্খলা, বৈষম্য ও অনাচার থেকে এর উদ্ভব। এসব প্রয়োজনেই সমাজের অসাধু ব্যক্তিরা সন্ত্রাসকে লালন করে। অনেক সাধারণ মানুষও এখন সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে অপরাধ বৃদ্ধি করছে। বর্তমান সমাজের অনেক কিছুতেই সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চালালেও এখনো পুরোপুরি তাদের হাতে চলে যায়নি। সরকারের আইনী সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে খুব সহজেই সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব। তারা যাতে এই ইচ্ছা পোষণ করতে বাধ্য হয় এজন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন সন্ত্রাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সন্ত্রাসীরা যত বড় ক্ষমতাশীনদের ছত্র-ছায়াই থাকুন না কেন তাদের সকল কিছুই অবৈধ। এদিক থেকে তাদের ভিত্তি কখনোই মজবুত হতে পারে না। কাজেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করে সন্ত্রাসকে বিদূরিত করা মোটেই অসম্ভব নয়।

আইয়্যামে জাহেলিয়াত যুগে সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে ইসলামের দিক নির্দেশনায় যে ভাবে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে বর্তমানে আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। তাহলে অবশ্যই সন্ত্রাসসহ সকল প্রকার অপরাধ দুর করা সম্ভব হবে। এই আত্মবিশ্বাস আমাদের মধ্যে দৃঢ় করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. মাওলানা আবু তৈয়ব আবদুল্লাপুরী, প্রসঙ্গঃ সন্ত্রাস ও একটি সমীক্ষা, "মাসিক মঈনুল ইসলাম" বর্ষ-১৩, সংখ্যা-৪, রজব' ২৪ হিঃ/সেপ্টেম্বর-২০০৩, পৃঃ ৩০।

২. ঐ পৃঃ ৩১

৩. ঐ পৃঃ ৩০

৪. ঐ পৃঃ ৩০'

৫. Oxford Advance Learner's Dictionary, Sixth edition, page no-1342

৬. "সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচার" প্রকাশনায়, কিবরিয়া পরিবার, প্রকাশকাল, আগষ্ট-২০০৫, পৃষ্ঠা-৪১

৭. ASHU TOSH DEV, Student's Favourite Dictionary, New Edition: September- 2003. Page No-813

৮. প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, এপ্রিল ২০০৩, পৃষ্ঠা নং ৬৮।

৯. প্রফেসর'স বি.সি.এস স্পেশাল ডাইজেষ্ট, সংস্করন নভেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা নং ১৯৮।

১০. মাওলানা আবু তৈয়ব আবদুল্লাপুরী, প্রসঙ্গঃ সন্ত্রাস ও একটি সমীক্ষা, "মাসিক মঈনুল ইসলাম" বর্ষ-১৩, সংখ্যা-৪, রজব' ২৪ হিঃ/সেপ্টেম্বর-২০০৩, পৃঃ ২৬।

১১. ফরহাদ মজহার, "সন্ত্রাস, আইন ও ইনসাফ" 'প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত, সাপ্তাহিক ২০০০, ১৪ অক্টোবার' ০৫, বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৩, পৃঃ ১৫৮।

১২. ঐ পৃঃ ১৫৮

১৩. ঐ পৃঃ ১৬৩

১৪. ঐ পৃঃ ১৬৩

১৫. ঐ পৃঃ ১৬৩

১৬. মোঃ আবদুল কাদের মিয়া, "সন্ত্রাস ও অপরাধ প্রতিরোধ বিধান" এ.কে প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ৮ ও ৯।

১৭. ম. আবু তাহের, অধ্যাপক, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস; একটি মতামত পর্যালোচনা" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা ৫৬, ৫৭, ৫৮, অক্টোবর' ৯৬- জুন' ৯৭, পৃঃ ২২৬।

১৮. ঐ পৃঃ ২২৭

১৯. ঐ পৃঃ ২২৭

২০. এন.এস.এফ প্রচার পত্র, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৬৯।

২১. জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা, দুর্নীতির স্বরূপ ও পুলিশ প্রশাসন, প্রকাশকাল; সেপ্টেম্বর ২০০১, প্রকাশক, "ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার" পৃঃ ৬।

২২. ঐ পৃঃ ৬

২৩. ঐ পৃঃ ৬

২৪. ঐ পৃঃ ৬

২৫. কামরুল হাসান মঞ্জু, গবেষণা প্রতিবেদন; চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ প্রকাশকাল; জুলাই ২০০২, পৃঃ ১২

২৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ফেব্রয়ারী' ২০০২, পৃঃ ৩

২৭. Student development Training guide. Publication: Working for Better Life, P- 48

২৮. ঐ পৃঃ ৪৮

২৯. ঐ পৃঃ ৪৮

৩০. কামরুল হাসান মঞ্জু, সংবাদ পত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র প্রকাশকাল; ১৯৯৯, এমএমসি, ঢাকা, পৃঃ ১৬

৩১. ঐ পৃঃ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২
সন্ত্রাস এবং ইসলাম

একেবারে প্রথমদিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফের মুশরিকদের একটা অন্যতম বড় অভিযোগ ছিল, তিনি ভ্রাতৃকলহ সৃষ্টি করে আত্মীয়-পরিবার-পরিজন তথা পুরো সমাজের স্থিতি শীলতা নষ্ট করার মাধ্যমে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করছেন। এবং তাঁরই কারণে পিতার সঙ্গে পুত্রের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়ে পুরো সমাজে এক অনভিপ্রেত ফিত্না বা সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যা সামাজিক প্রয়োজনে অঙ্কুরেই নির্মূল করা অত্যন্ত জরুরী। কাফেরদের কাছে বিষয়টি ছিল পরিষ্কারভাবে সমাজদ্রোহিতা; যে কারণে তারা ওকায-এর মেলায় সকল তাঁবুতে গিয়ে গিয়ে নানা অঞ্চল থেকে আগত লোকদের কাছে বলে বেড়াতো, 'তোমরা ভাই, মোহাম্মদ (সঃ)-এর কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করো না; যদি করো; তোমরা এক অকথ্য সন্ত্রাস দ্বারা আক্রান্ত হবে।'

এমনকি নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েও হিজরতকারী সাহাবীদের (রাঃ) বিরুদ্ধে এ একই অভিযোগ পেশ করেছিল। তারপর মাদানী-জিন্দিগীতে এসে ইসলাম যখন রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি মোটামুটি শক্ত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন আর নিন্দা ও কটু বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কাফেররা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে বারবার ছুটে আসতে লাগলো মদীনার দিকে। কিন্তু বারবার পরাজিত হবার পর এ আগ্রাসী কাফেররাই বলতে শুরু করলো, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ জিহাদের নামে আগ্রাসী-আক্রমণকে তাদের রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। মক্কা বিজয় এমনকি তৎপরবর্তী হুনাইন-এর যুদ্ধ পর্যন্ত এই অপপ্রচার অব্যাহত ছিল। রোমানদের বিরুদ্ধে রাসূল (সঃ) যে কঠিন তাবুক-অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হন, রোমানরা পূর্বপ্রস্তুতি সত্ত্বেও ভয়ে যদিও ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল; কিন্তু তারাও মুসলমানদের এ অপরিহার্য সাহসী-অভিযানকে আগ্রাসন বলেই অভিহিত করেছিল। এবং তারপর দুই দশক অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুসলমানদের হাতে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো; এবং মোটামুটি অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যেই ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিরাট ভূখন্ডে সগৌরবে উড্ডীন হলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিজয় পতাকা।

অতীতের নিরপেক্ষ ইতিহাস এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয় যে, মুসলমান কখনো শুধুশুধুই আলেকজান্ডার কি সিজারের মত দিগ্বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে কোন দেশে অভিযান চালায়নি। স্পেন থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যেখানেই যত অভিযান পরিচালিত হয়েছে, সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট জনপদের নিগৃহীত অত্যাচারিত মুক্তিপ্রত্যাশী অসহায় মানুষের ক্রন্দন ও হাহাকার এমনভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, যা মুসলমান উপেক্ষা করতে পারেনি, উপেক্ষা করা সমীচীনও ছিল না। কারণ আল-কোরআনের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ-শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সওগাত নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো মুসলমানদের জন্য ফরজ। ইসলাম পৃথিবীতে বাদশাহী করার সওগাত নিয়ে আসেনি; এসেছে সত্য ও সাম্যের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবসম্প্রদায়ের কাছে মুক্তির সওগাত পৌঁছে দিতে, এসেছে জালিমের ঔদ্ধত্যকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে। এ জন্যই ইসলাম যেখানেই গেছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ তাকে পরম আশীর্বাদরূপে স্বাগত জানিয়েছে অন্যথায় কোন দেশ পরাভূত হতে পারে, মনের দুঃখ মনে রেখে মুসলিম শাসনাধীন জিযিয়া কর প্রদান করতঃ জীবননির্বাহ করতে পারে; কিন্তু দলে দলে ইসলামের ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে কেন? কারণ একটাই, ইসলাম যে সর্বমানবিক প্রেম ও ইনসাফকে আল্লাহপাকের অবিসংবাদিত হেদায়াতরূপে বিশ্বসমক্ষে উপস্থাপন করেছে, সেই অব্যর্থ নূরের সংস্পর্শে আসামাত্র তাকে গ্রহণ না করে পারেনি। কারণ, এটা ছিল অন্ধকারের সকল অচলায়তন ভেঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে একটি বিশ্বমানবিক প্রেম ও সাফল্যের নির্ভুল রূপরেখা, এক পরম আশীর্বাদকে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। অথচ অন্য কোন ধর্মের ক্ষেত্রে কি এ রকমের কোন দৃষ্টান্ত আছে? নেই, ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে একেবারেই নেই। এ বিষয়ে আমরা একটু বিশদ আলোচনা করতে পারি।

যীশুখ্রিস্টের অব্যবহিত পরবর্তী সেন্টপলের কথা আমরা জানি, তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও মধ্যস্থতায় রোমানরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য নয়, রোমানদের ধর্মান্তর ছিল প্রায় নিরঙ্কুশভাবে রাজনৈতিক, যে কারণে খ্রিষ্ট ধর্মের মূল অনুসারীদের সঙ্গে এ নবদীক্ষিত রোমানদের এখন পর্যন্ত একটা বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টান ধর্মের একটা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসার যদিও ঘটেছে, কিন্তু শ্বেতচর্মের প্রাধান্য যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে তারা খুবই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেই খ্রিস্টান হওয়া যায়, কিন্তু শ্বেতচর্ম প্রভাবিত মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত বা একীভূত হওয়া যায় না। এবং এজন্যই আমাদের অতি-পরিচিত এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা আফ্রিকান বা ইউরোপ-আমেরিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা Black জনগোষ্ঠী কখনো শ্বেতসাহেবদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। অন্য সকলক্ষেত্রে তো বটেই, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। খ্রিষ্টান ধর্মে এ বিভাজন প্রশ্নের সম্মুখীন নয় কি?

আর ইহুদী ধর্মের বিষয়টিতো আরো করুণ। বনি ইসরাইলদের এই ধর্ম সর্বাধিক পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীদের সংখ্যা আদৌ বর্ধিত হয়নি; বরং হ্রাসই পেয়েছে। এ ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাববস্তু যাই হোক, সেই হযরত মুসা (আঃ) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যে ইতিহাস, তাওরাত বা Old Testament নির্ভর এ ধর্ম সম্প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগত শুধু সংকুচিতই হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্মীরা যে চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো তার কারণ, কনফুসিয়াস-এর দর্শন ও ভাবাবেগের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের একজাতীয় সহজ গ্রহণযোগ্যতা, যা ছিল ধর্মীয় বিবেচনায় কিছুটা সংস্কার ও কিছুটা তৃপ্তিকর আত্মবিস্মৃতির পরিপোষক মাত্র। হিন্দু ধর্মও অনেকটা একই রকম, যাকে ধর্ম না বলে বহু ধরনের বিশ্বাস ও নানামুখী ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার একটি দীর্ঘচর্চিত অংশীবাদী সংস্কার বলাই যুক্তিযুক্ত; যে কারণে হিন্দুধর্ম কখনোই বহির্জগতে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি, শুধু সীমাবদ্ধ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অবশ্য সব ধরনের ক্ষেত্রেই যে এক এক ধরনের স্বসৃষ্ট প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অন্তত ধর্মীয় বিশ্বাসের সর্বমানবিকতার প্রশ্নে, তার কারণ ব্যাখ্যা করা আমাদের লক্ষ্য নয়; আমরা শুধু বলতে চাই, কারণ যাই হোক, অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে এ রকমটাই ঘটেছে।

বিভিন্ন ধর্মের এই সীমাবদ্ধতা ও প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখলে এটা খুবই পরিস্কার, ইসলাম যে চতুর্দিকে দুর্বার বেগে ছড়িয়ে পড়লো, তার মধ্যে যতটা ছিল জিহাদের বিষয়, তার চেয়ে আরো অধিক পরিমাণে ছিল সাম্য, সত্য, ইনসাফ ও তাওহীদের সওগাত, যা খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অন্তর্জগতকে অধিকার করে নিয়েছে। অথচ কী বিস্ময়কর, ইসলামের এ বার্তা ও ইসলামের হেদায়াতসমৃদ্ধ মানুষের জন্য এই অন্তর্জাগতিক মুক্তির বিপ্লবকেই বলা হলো আগ্রাসন; পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়া হলো ইসলাম আগ্রাসী নীতি দ্বারা চালিত একটি ভয়ংকর ধরনের ধর্ম। যাই হোক, এই অপবাদ সেই প্রথমকালের কথা, যা রীতিমত অব্যাহত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

তারপর খ্রিস্টান শক্তির ক্রমাগত বিকাশ, নানামুখী অগ্রাভিযান ও প্রযুক্তিগত সাফল্য যখন দুর্বার হয়ে উঠলো, মুসলিম উম্মাহ যখন ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো, ইসলাম-বিরোধীদের রসনায় তখন নতুন অপবাদঃ ইসলাম আসলে অনাধুনিক ও প্রগতিচেতনা বিবর্জিত একটি রক্ষণশীল ধর্ম। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া একটি জাতির জন্য এই অপবাদ অস্বাভাবিক কিছু নয়; কিন্তু ইসলামবিরোধীরা এখানেই নিরস্ত হলো না। তারা বলতে শুরু করলো, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ হলো আপাদমস্তক 'মৌলবাদী'; আর এই মৌলবাদ এতটাই প্রবল যে, তাদের কর্ণকুহরে আধুনিক দাবী ও সভ্যতার কোন

Dhaka University Institutional Repository

আহবান প্রবেশ করতেই পারে না। এবং এতদসঙ্গেই ইসলামের বৈরী দুশমনদের সর্বশেষ সংযোজন হলো 'সন্ত্রাস', যে সন্ত্রাসকে তারা শুধু প্রিয় জ্ঞান করে না, ধর্ম ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে এই সন্ত্রাসকে মুসলিম উম্মাহ অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য বলেও জ্ঞান করে। এবং ইহুদী-খ্রিস্টান ও মুশরিকদের প্রায় একচ্ছত্র সর্বতোমুখী মিডিয়া-শক্তির কল্যাণে সারা পৃথিবীতে এটা অবাধে ছড়িয়ে পড়লো যে, মুসলমান মানেই 'সন্ত্রাসী' এবং ইসলাম মানেই একটি অবিসংবাদিত 'সন্ত্রাসী' ধর্ম। অথচ 'আগ্রাসন' কি 'রক্ষণশীলতা' বা 'মৌলবাদ'-এর যে অপবাদ, সেই অপবাদ মিথ্যা হলেও, তার সঙ্গে কিছু দুর্বল যুক্তি-তথ্য হয়তো অবতারণা করা যায়; কিন্তু 'সন্ত্রাস' তো ইসলামে একেবারেই অস্তিত্বহীন।

আল-কোরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শ তো বটেই, ইতিহাসও বার বার এ সাক্ষ্য দিচ্ছে, সন্ত্রাস ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। যারা এই অপবাদে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে অভিযুক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়, কথাটা তারাও জানে। কিন্তু জানলে কী হবে, তারা যেহেতু একটি গর্হিত ও ভয়ানক অসদুদ্দেশ্য দ্বারা চালিত, মিথ্যা জেনেও দুর্বার উৎসাহ নিয়ে তারা ইসলামকে সন্ত্রাসের পরিচ্ছদে বিশ্বসমক্ষে কাঠগড়ায় দন্ডায়মান করতে চায়। এবং এই লক্ষ্যেই তারা তাদের সকল শক্তি ও পরিকল্পনা আজ একত্রিত করেছে।

রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তৎপরবর্তীকালেও সংঘটিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু লড়াইয়ের কথা আমরা জানি, কিন্তু কোথাও একটিবারের জন্যও কখনো কোন সন্ত্রাসের সাক্ষাৎ মেলে না। আসলে মিলবে কী করে? পবিত্র আল-কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাতে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।" [১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।" [২]

আবার আল্লাহ তায়ালা বলেন, "সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞাস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। [৩]

গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জেহাদ' ও কেতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী' এবনে-আনাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত ১৯১ আয়াতটি নাযিল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফেকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকার যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয।

হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-সহ সে ওমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে ওমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে-কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয় তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকলো। অর্থাৎ "আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখানে থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।"

হরমে-মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র পশু হত্যার করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। অর্থাৎ, 'মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।'

সাহাবিগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এ ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভূক্ত, যেগুর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। অর্থাৎ রজব, যিলকদ, যিলহজ্ব এবং মহাররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা হারাম। কুরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। এ মাসসমূহে কোথাও কারও সংগে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো। তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার হরম-শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসের (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে, ফিতনা নরহত্যার চেয়েও গর্হিত, গুরুতর ও ভয়ংকর; এবং আল্লাহপাক ফিতনা ফাছাদকে খুবই অপছন্দ করেন। এমন পরিস্কার অলংঘনীয় নিষেধ সত্ত্বেও কোন প্রকৃত মুসলমান কি ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে? তার পক্ষে কি সম্ভব দেশ ও সমাজকে সন্ত্রাসকন্টকিত করে তোলা?

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা হলো, ইসলাম কী করতে চায় সেটা তো বটেই ইসলাম কী বলে, সেটাও কাফের-মুশরিকদের জন্য প্রচন্ড ভীতি ও গাত্রদাহের কারণ। বাকস্বাধীনতা অন্য সকল ক্ষেত্রে সমর্থিত হলেও ইসলামের ক্ষেত্রে এই গনতান্ত্রিক বাকস্বাধীনতাকে কাফের-মুশরিকরা কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত নয় এই জন্য যে, যেখানে যত মতবাদই প্রবল হয়ে উঠুক, হয়ে উটুক যতই গগনবিদারী, তার মধ্যে এমন কিছু সারবস্তু নেই যা দ্বারা প্রচলিত পার্থিব ব্যবস্থাপনা কোনরূপ ঝুঁকি, ক্ষতি ও বিপদের মধ্যে পড়তে পারে। এসব অসার ও ফাঁকা চিৎকার থেকে পৃথিবীবিস্তৃত ইবলিসী ব্যবস্থাপনার কোন তারতম্য ঘটে না, বরং প্রকারান্তরে উপকৃতই হয়। কিন্তু ইসলাম এরকম নয়; তার ব্যবহারিক প্রয়োগের 'ভয়াবহতা' নিয়ে কাফের মুশরিকদের কাছে তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, শুধু ইসলামের কথাই তাদের কাছে এত ভয়ংকর যে, তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা ছাড়া তারা স্বস্তি পায় না। এবং এটা শুধু আধুনিক বিশ্বের কথা নয়, একেবারে শুরু থেকে কাফেরদের এই গাত্রদাহী অস্বস্তি ও তৎপরতা একইভাবে অব্যাহত আছে।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর ১৩ বছরের মক্কীজীবনে শুধু ইসলামের কথা শোনানো ছাড়া অন্য আর কিছুই করেননি; কিন্তু এই কথাই কাফেরদের অন্তরে এমন অসহিষ্ণুতা ও জিঘাংসার আগুন সৃষ্টি করেছিল যে, রাসূল (সঃ) সহ নগণ্য কিছুসংখ্যক সাহাবীর ওপর তারা বদ্ধ উন্মাদের মত চাপিয়ে দিয়েছিল অকথ্য নিগ্রহ নির্যাতন ও মৃত্যুর বিভীষিকা। তবু সেদিন ইসলামের শুভসূচনাকে রাসূল (সঃ) নীরবতা ও আপসকামিতার মধ্যে নিষ্ক্রিয় রাখেননি। আজ এই বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে। কাফেররা পৃথিবীর সব কথা ও মতবাদকে ওয়াকওভার দিতে প্রস্তুত, শুধু ইসলামের কথা শুনলেই তারা জলাতঙ্ক রোগীর মত ছটফট করে ওঠে। ওঠে তার কারণ তারা ব্যাধিগ্রস্ত, তারা কল্যাণ ও মানবমুক্তির ব্যবস্থাকে ভয় পায়।

কিন্তু ভয়ই হোক আর কায়েমি স্বার্থরক্ষার কুৎসিত অপচেষ্টাই হোক, মুসলিম উম্মাহর কাজ হলো, এসব মানববিদ্বেষী ষড়যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনাকে উৎখাত করে একটি সুস্থ, সুন্দর ও সুষম পৃথিবীর রচনা করা এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই তো ইসলামের আবির্ভাব; ইসলামের সকল কথা ও কর্মের তো এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ থেকে দিকভ্রষ্ট হয়ে অর্পিত পার্থিব দায়িত্ব যদি কোন তথাকথিত হিকমতের অছিলায় ভুলে থাকা হয়, তাহলে আল্লাহপাক ভালো জানেন, তবে আমাদের বিশ্বাস মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। অতএব, মুসলমানের জন্য যা অবশ্য করণীয় তাহলো যেখানে কথার প্রয়োজন সেখানে কথা, আর যেখানে আগ্রাসী শক্তির মোকাবিলা প্রয়োজন সেখানে ধনসম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করে হলেও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া।

সন্দেহ নেই, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা মুসলিম উম্মাহর এই জিহাদী মনোভাবকে যমদূতের মত ভয় পায় এবং তারা জানে, মুসলমান যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাগুতি শক্তির সকল ব্যবস্তাপনা ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাহরে তাদের সাজানো 'পুষ্পোদ্যান' এমন এক প্রবঞ্চনের মুখোমুখি হবে, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এই জন্যই ইসলামের যারা দুশমন, তাদের কাছে জিহাদ এত অপ্রিয় এবং এই জন্যই নানারকম মিথ্যা তথ্য খাড়া করে জিহাদকে সন্ত্রাস ও হঠকারিতা অপবাদে আজ আখ্যায়িত করতে প্রাণান্ত চেষ্টা তারা অব্যাহত রেখেছে। শত্রুদের জন্য এটাই স্বাভাবিক কিন্তু মুসলিম উম্মাহর একটি অংশও যে জিহাদকে পরিহার করে নিষ্ক্রিয় নির্বিবাদ পরহেজগারীর আড়ালে আত্মগোপন করে ঝুঁকিহীন সাওয়াব লাভে মেহনত করে চলেছে, তাদের এ 'মেহনত' ইসলামের বিপ্লবী পয়গামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। ইসলাম যেহেতু সমগ্র মানবজীবনের জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী একটি নির্ভুল ঐশী হেদায়াত, ইসলাম অসত্য, অন্যায় ও বেইনসাফীর সামনে নীরব ও নির্বাক থাকতে পারে না। উদারতার নামে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে ইসলাম যদি নীরব ও নির্বিকার ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে এ পৃথিবীতে ইসলামের আসার তো কোন প্রয়োজনই ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

কাফের-মুশরিকরা চায়, ইসলাম এই ধরাপৃষ্ঠে নামকাওয়াস্তে এমনভাবে অবস্থান করুক, যাতে ইবলিসী-ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সর্বমানবিক কল্যাণ ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় এনে ইসলাম কোনরূপ কোন কথা না বলে এবং তাদের ধারণা, এমন ইসলামই 'আসল ইসলাম' যার মধ্যে প্রতিবাদহীন মারেফাতি ও আধ্যাত্মিকতা আছে কিন্তু অসত্যের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠার মত কোন তেজস্ক্রিয়তা নেই। আর এই ধরনের 'যে আসল ইসলাম', তার জন্য পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য-সহায়তা প্রদানেও তারা অকৃপণ। পুনরায় উল্লেখ করি, মুসলিম উম্মাহর একটি বড় অংশ যদিও আজ এই 'আসল' ইসলামের প্রবক্তা ও অনুসারী কিন্তু অপর একটি অংশ তো এমন আছে, ছিল ও থাকবে, যারা সর্বদা সত্যের প্রহরী হয়ে জাগরুক, যারা বিশ্বব্যাপী বিপর্যস্ত জনজীবনে শান্তি ও সত্যের বার্তা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর, যারা তাগুতি শক্তির সকল বদ-মতলবকে উন্মোচন ও ছিন্নভিন্ন করে দিতে ইনশাআল্লাহ সদাপ্রস্তুত। বলা নিষ্প্রয়োজন, মুসলিম উম্মাহর এই জিহাদী তেজস্ক্রিয়তাকে নির্বাপিত করার জন্যই আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামকে 'সন্ত্রাসী' ও 'জঙ্গী' অভিধায় চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে। এবং তাওহীদ বিনাশী এই মিথ্যাবাদী দুশমনদের অপচেষ্টা আজ এতটাই নীচ ও ইতর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা শুধু কিছু উচ্ছিষ্ট ভোজী দালাল ও ক্রীতদাস সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত নয়; ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু মানুষকে দাঁড়ি-টুপি-পাগড়িতে সজ্জিত করে ত্রাস ও নাশকতা সৃষ্টির দায়িত্ব দিয়ে এমনভাবে অর্থ ও অস্ত্র হাতে তুলে দিচ্ছে, যাতে সকল আলেম-উলামা ও তালেবে-ইলমকে সহজেই প্রশ্নবিদ্ধ করা সম্ভব হয়।

আমরা বলবো না যে, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এমন ব্যক্তি একেবারেই নেই, যারা ইসলামের ভুল ও মতলবী ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত নয়। কিন্তু এ কারণে ইসলাম ও পুরো আলেম সমাজকে একবাক্যে অভিযুক্ত করা কি যৌক্তিক? এটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব অপরাধ। দু'চারজন পুলিশ চাঁদাবাজির মত অপকর্মে জড়িয়ে পড়তে পারে, সামরিক পোশাক পরে কেউ রাতের আঁধারে ডাকাতি করতে পারে, তাই বলে কি পুরো পুলিশ বা সামরিক বাহিনীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি তো প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, ছাত্রীরা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে, কিছু কিছু শিক্ষকের কথাও শোনা যায়, যারা নানাবর্ণ অপকর্মের সঙ্গে জড়িত কিন্তু কেই, কখনো তো বলা হয় না সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই যেহেতু জন্ম নিচ্ছে এসব রোগ-ব্যাধি সেহেতু পুরো ব্যবস্থারই বিলুপ্তি প্রয়োজন। অথচ কোথায় কে একজন মুফতী কি মাওলানা কি মাদ্রাসা-শিক্ষার্থী কোন অনুচিত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া মাত্র পুরো দেশ, পুরো পৃথিবী এমনভাবে উন্মাতাল হয়ে ওঠে, যেন ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার অভ্যন্তরেই নিহিত আছে সকল সুনামি, ক্যাটরিনা ও সাড়ে আট রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প! কী বালখিল্য চিন্তা ও সিদ্ধান্ত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ সৃষ্টির কতই না কুৎসিত এ মিথ্যা চক্রান্তজাল।

এমতাবস্থায় আমাদের অবশ্য বেশী কথা বলার নেই; কথা একটাই এবং তা হলো ইসলাম ও আলেম-উলামাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে কোন লাভ নেই। আধুনিক সময়ে মুসলিম উম্মাহ নিঃসন্দেহে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অনেকটাই হীনবল কিন্তু তার চিন্তা ও চৈতন্যে সর্বদা বিরাজ করছে এমন এক আত্মোৎসর্গের অফুরন্ত শক্তি, যা অজেয়, যা অপরাজেয়। আর ইসলামের সার্বিক সংরক্ষণ ও হেফাজতের দায়িত্ব যেহেতু স্বয়ং আল্লাহপাক গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, "আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" [৪]

এই দ্বীনের অনুমাত্র ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা কোন দুশমনের নেই। অতএব আবু জেহেল, আবু লাহাবদের মত বর্তমান এই আধুনিক দুশমনদের ললাটে শুধু খোদিত হয়ে থাকবে ইতিহাসের ঘৃণা ও স্থায়ী-অমোচনীয় কলঙ্ক।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, "কাফের-মুশরিকদের কাছে যত অপ্রীতিকর ও কষ্টের কারণই হোক, আল্লাহর নূর অবশ্যই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে এবং রাসূল (সঃ) আনীত দ্বীন ও হেদায়াত সকল অসত্যের ওপর অবশ্যই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে।" [৫]

আর এতদসঙ্গে কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের জন্য তো বটেই, দোদুল্যমান ঈমানের অধিকারী মুসলমানদের জন্যও এটা বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য যে, ইসলাম কোন সেবা-সংস্থা বা Non-profit non-politcal NGO নয়, ইসলাম কোন নির্জন তপস্যামুখী অনিকেত (Rootless, imaginary) আত্মসর্বস্ব দর্শনচর্চার নাম নয়; ইসলাম একটি সর্বতোমুখী ইতিবাচক বিপ্লব। সকল অসত্য, ভ্রান্তি ও কুহেলিকার বিরুদ্ধে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য সত্য ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের পয়গাম।

সন্ত্রাসকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাকে সাধ্যমত প্রতিরোধ ও প্রতিহত করারও চেষ্টা করি; কারণ ইসলামে কোন ধরনের কোন ফিতনা ও ত্রাস সৃষ্টির এতটুকু জায়গা নেই। কিন্তু অশুভ শক্তির অশুভ অভিপ্রায়কে মেনে নিয়ে এবং তাদের ভালোবাসায় ইবলিসের সাথে সখ্য স্থাপন করবে, এমন আত্মঘাতী আপসকামিতা ইসলামে নিষিদ্ধ। এবং আল কোরআনের শত শত আয়াত ও রাসূল (সঃ)-এর আমৃত্যু-সংগ্রামের বার্তাবহ অসংখ্য হাদীস, মুসলিম মিল্লাতের কাছে এ দ্ব্যর্থহীন জিহাদের হেদায়াতই পৌঁছে দিচ্ছে। আর বলাই বাহুল্য,এইখানেই ইহুদি-খ্রিষ্টান অংশীবাদী মুশরিক ও তাদের স্বল্পমূল্যে ক্রীত ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীদের আপত্তি ও আতঙ্ক। সন্দেহ নেই, এই আতঙ্কহেতুই কাফেররা এখন জলস্থলে, অন্তরীক্ষে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে। দেখা যাক, তাদের ষড়যন্ত্র ও বেপরোয়া উন্মত্ততা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ইনশাআল্লাহ আমাদের কোন ভয় নেই; আসলে ভয়তো তাদের, যারা অসত্যকে বিজয়ী করে তুলতে চায়।

এ ভয়ার্ত ইবলিসদের লক্ষ্য করেই আল্লাপাক পবিত্র কুরআনে বলেন, 'শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দূর্বল'[৬]

তারা খুবই কৌশলবাজ কিন্তু আমি মহাপরাক্রান্ত কৌশলী, অতএব কাফেরদেরকে কিছু অবকাশ দেয়া যেতে পারে' [৭]

যাই হোক, সকলের জ্ঞাতার্থে আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য হলো, ইসলামের জিহাদ এবং সন্ত্রাস দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু; শুধু আলাদা নয়, রীতিমত সাংঘর্ষিকও বটে। অথচ জেনে হোক না জেনে হোক, এই দুই বিপরীতধর্মী বস্তুকে আজ সম্পূর্ণ একাকার করে দেয়া হচ্ছে। খুবই কুশলতার সঙ্গে জিহাদ এবং সন্ত্রাসকে একই অভিজ্ঞানে চিহ্নিত করা হেচ্ছে। আমরা উল্লেখ করতে পারি, মানব সম্প্রদায় আবহমানকাল থেকেই নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত, যে কারণে মানবিক মহিমা ও মনুষ্যত্ব বারবার শুধু ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। মহান আল্লাহপাক এই সকল রোগের প্রতিষেধক হিসেবেই ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করেছেন ইসলাম ও ইসলামের বার্তাবহ অসংখ্য নবী-রাসূল (আঃ)। সবশেষে ইসলামের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ রূপরেখা সমৃদ্ধ আল কোরআন এবং সর্বশেষ রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)।

মনে রাখা আবশ্যক, যে নামে ও যে-লক্ষ্যেই হোক, সন্ত্রাস কোন চিকিৎসা নয়, বরং সন্ত্রাস নিজেই একটি গুরুতর ব্যাধি। রোগাক্রান্ত মানবসম্প্রদায়ের জন্য প্রকৃত চিকিৎসা হলো একমাত্র ইসলাম। যদি সাধারণভাবে রোগ-নিরাময় অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলে চূড়ান্ত প্রতিবিধান হিসেবে ইসলাম শল্যচিকিৎসার কথা বলে। ইসলামী পরিভাষায় একেই বলে জিহাদ। দৃশ্যত যাই মনে হোক, এই জিহাদের লক্ষ্য ত্রাস সৃষ্টি করা নয়, লক্ষ্য রোগগ্রস্ত অসুস্থ পৃথিবীকে নিরাময় করে তোলা। আর এটাতো একেবারেই সাধারণ বুদ্ধির (Common sense) কথা।

Dhaka University Institutional Repository

নবী রাসূলরা কি কোন চেগুয়েভারা বা নকশালী চারু মজুমদার ছিলেন যে, তাঁদের উত্তরসূরিরা এক-একটি ভূগর্ভবাসী (Underground) ভয়ংকর 'বীরপুরুষে' পরিণত হবেন। অতএব আলেম-ওলামারই যেহেতু নবী-রাসূলের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী, তাঁরা কি কখনো গোপন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন! আসলে দেখার ভুল এবং বোঝার ভুলতো বটেই; বস্তুত, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আন্দোলন কোন যুক্তিতেই কোন সন্ত্রাসী কর্মপ্রক্রিয়া নয় এবং আলেম-ওলামারাও নন কোন জঙ্গী-সন্ত্রাসী। ভ্রান্তিবিলাসে আচ্ছন্ন এক-আধজন সন্ত্রাসপ্রেমী মুফতী কি মাওলানা হয়ত আছেন, কিন্তু অবশ্যস্বীকার্য বাস্তবতা হলো, সব আলেম-ওলামাই আসলে ইসলামের নির্ভুল হেদায়াতবাহী এক-একজন প্রকাশ্য শল্য-চিকিৎসক। তাঁদের কথা, কর্ম ও আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবেকভ্রষ্ট বিশ্বাসহীন পৃথিবীকে ইসলামের আলোয় দীপ্তিমান করে তোলা। বলাই বাহুল্য, অন্ধকারবিলাসী অদ্যকার আবু জেহেলদের বিবেচনায় এটাই অসহনীয় 'অপরাধ'। কিন্তু বলবার কথা হলো, এই 'অপরাধকর্ম' থেকে কারো ভয়ে ও প্ররোচনায় আলেমরা যেমন নিবৃত্ত হতে পারেন না, একই সঙ্গে দুর্মতিগ্রস্ত আবু জেহেলদের তৎপরতা ও চক্রান্তও কখনো স্তিমিত হবে না।

আবু জেহেলদের মত বর্তমানেও অধিকাংশ ব্যক্তিরা ইসলাম সম্পর্কে অমূলক কথাবর্তা বলে থাকেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সুর্যোদয়ের পূর্বে, সুর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ ও দিবাভাগে, সম্ভবতঃ তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।" [৮]

মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্যে নানারকম বাহানা খুঁজতে এবং রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নামে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে।

এক. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন।
দুই. আল্লাহর এবাদতে মশগুল হয়ে যান।

এ জগতে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কোন মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে; যদিও তা মৌখিক গালি-গালাজই হয়। সম্মুখে গালি-গালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে।
এক, সবর; অর্থাৎ, স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া।
দুই, আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ও এবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রবাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্যে একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধান করতে পারে না এবং আল্লাহর সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, অতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে; তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সন্ত্রাস সৃষ্টির উৎস গালি গালাজ, খারাপ কথা এমনকি কটু বাক্যও বলতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

"আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" [৯]

ইসলাম মুসলমানদেরকে তো দূরের কথা কাফেরদের সাথে ও কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটু কথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, উক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তায় বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম, মুসলমানেরাই কি সন্ত্রাসী?

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রচার চালানো হচ্ছে, ইসলাম মানেই চরমপন্থী সন্ত্রাসের ধর্ম, আর মুসলমান মানেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সন্ত্রাসী। পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন ব্যাপক প্রচার পাচ্ছে মিডিয়াতে এবং তাতে এরূপ ধারণাই দেয়া হচ্ছে যে মুসলমানরাই সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ও অশান্তির সৃষ্টি ও লালন করে চলেছে। অতএব, এরা বিশ্বশান্তি ও মানবতার জন্য হুমকি স্বরূপ। কিন্তু মুসলমানরা কেন সন্ত্রাস ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রচার করা হচ্ছে না। একজন দু'জন লাদেন, সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে বিশ্ব ব্যাপী প্রমাণ তুলে ধরা হচ্ছে, এরাই হচ্ছে মুসলিম, আর এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডই হচ্ছে এদের ধর্মের শিক্ষা। কিন্তু আসলে কি তাই? ইসলাম কি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড শিক্ষা দেয়? নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে বলে? অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখতে উৎসাহ যোগায়? অন্যায় বা জোর-জুলুম করতে বলে?

নিম্নে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

"দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটায়ো না।----" [১০]

"অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও অংশীবাদীদের তুমি সবচেয়ে বেশী উগ্র দেখবে।" [১১]

"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না' তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি বজায় রাখি'। সাবধান! এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না।" [১২]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইহুদী আগ্রাসন এবং তার পিছনে যারা আছে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং টনি ব্লেয়ার যখন বলেন, তারা বিশ্বে শান্তি রক্ষা করছেন, আর মি, বুশ যখন ইরাইলী প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বলেন, 'শ্যারন তো

Dhaka University Institutional Repository

একজন শান্তিবাদী মানুষ', তখন বিশ্বের বিবেকবান মানুষ হাসবে না কাঁদবে, তা বুঝতে পারে না। তাদের কথা, কাজ ও চরিত্রের সাথে কুরআনের বাণীর কি আশ্চর্য মিল।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানে সন্ত্রাস নয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, তবে সীমালংঘন করো না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না।" [১৩]

উদ্ধৃত আয়াতে লক্ষণীয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের, আগ্রাসী যুদ্ধের নয়। কখনোই বলা হয়নি, তোমরা আগে আক্রমণ করো। অন্যত্র আরো বলা হয়েছে, "যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে----"। [১৪]

মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না, কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হযে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রসুলে করীম (সঃ) জওয়াবে বলতেন, সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।

যখন রসূলে করীম (সঃ) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় প্রথম তিনি বলেন, 'এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এছাড়া যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলাম একটি পুর্নাঙ্গ দিক নির্দেশনা দেয়েছে। যুদ্ধে যাতে সীমালংঘন করা না হয় সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনোই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে; আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" [১৫]

এ পসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, "হে মুমিনগণ! কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে; তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।" [১৬]

আল্লাহপাক বলেন, "মানুষের প্রাণসত্তাকে আল্লাহ সম্মানার্হ বলে ঘোষণা করেছেন। একে হনন করবে না সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ ব্যতীত।" [১৭]

আবার আল্লাহপাক বলেন, "আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" [১৮]

Dhaka University Institutional Repository

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যুদ্ধে যে সকল সীমা মেনে চলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

১. অতর্কিত আক্রমণ নিষিদ্ধ।
২. আগুনে পোড়ানো নিষিদ্ধ।
৩. নির্যাতনপূর্বক হত্যার নিষেধাজ্ঞা।
৪. লুটতরাজ নিষিদ্ধ।
৫. ফলবান বৃক্ষ, ফসলের ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পদ নষ্ট করার উপর নিষেধাজ্ঞা।
৬. লাশ বিকৃত করা নিষিদ্ধ।
৭. বন্দী হত্যার নিষেধাজ্ঞা।
৮. দূত হত্যার নিষেধাজ্ঞা।
৯. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অবৈধতা।
১০. উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্য নিষিদ্ধ।
১১. হাঙ্গামা ও গোলযোগ সৃষ্টি অবৈধ।
১২. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে।
১৩. সন্ন্যাসী ও তপস্বীদের যেন কষ্ট না দেয়া হয় এবং কোনো উপাসনালয় যেন ভাঙ্গাচোরা না হয়।
১৪. পশুদের যেন হত্যা করা না হয়।
১৫. সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনবসতিগুলোকে যেন জনশূন্য না করা হয়।
১৬. যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদের জান-মালকে অবিকল মুসলমানদের জান-মালের মত নিরাপত্তা দিতে হবে।
১৭. গণীমতের সম্পত্তি যেন আত্মসাৎ করা না হয়।
১৮. যুদ্ধে যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা না হয়।" [১৯]

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন কোন সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাতেন তখনি তিনি তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের প্রথমে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন অতঃপর বলতেন,

"আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে অভিযান শুরু কর। আল্লাহর সাথে যারা কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাপী করো না। গণীমতের মাল আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। এরপর সৈন্যদেরকে বলে দিতেন শত্রুর সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখবে, ১. ইসলাম, ২. জিযিয়া, ৩. যুদ্ধ। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে কিছু বলো না। যদি জিযিয়া দিতে রাজি হয় তাহলে তার জান ও মালের ওপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করো না। কিন্তু সে যদি তাও না মানে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ কর। [২০]

সীমালংঘন সম্পর্কে হযরত মায়াজ বিন জাবাল হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যুদ্ধ দুই রকমের" যে ব্যক্তি খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং নেতার আনুগত্য করে, নিজের উত্তম সম্পদ ব্যয় করে এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়ায় না, সে জাগ্রত বা ঘুমন্ত যে অবস্থাতেই থাক, পুণ্য লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য এবং খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, নেতার আনুগত্য করে না এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়ায় সে পাল্টা আযাব ভোগ করবে। [২১]

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে আল কুরআন

ইসলামে জোর জবরদস্তি করা হয়, এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিজ নিজ ধর্ম পালনের ব্যাপারে অন্য ধর্মের অনুসারীদের উপর কোনরূপ জুলুম, বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তি করেনা তা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতের মধ্যে নিম্নে মাত্র দু'টি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

"ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। সৎপথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে তাগুত (অসত্য দেবতা) কে অস্বীকার করবে ও আল্লহর প্রতি বিশ্বস করবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনো ভাংবে না।" [২২]

"ওরা যা বলে তা আমি ভালভাবেই জানি। তোমাকে ওদের উপর জবরদস্তি করার জন্য পাঠানো হয়নি। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও।" [২৩]

মুসলমানদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও (খ্রীস্টান ও ইহুদী) আহবান জানানো হয়েছে,

"হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বল।" [২৪]

"হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না আর যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল-খূশির অনুসরণ করো না।" [২৫]

পরধর্ম সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে আল কুরআন

ইসলামকে বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসী ও অসহিষ্ণুতার ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে কি বলা হয়েছে তা জানা আবশ্যক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা কিতাবীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালংঘন করে তাদের সাথে নয়। আর বলো, আমাদের উপর ও তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই, আর তাঁরই কাছে আমরা আত্ম সমর্পণ করি।" [২৬]

"আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গাল দেবে না, তাহলে তারা (সীমালংঘন করে) অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গাল দেবে। এভাবে প্রত্যেক জাতির চোখে তাদের কার্যকলাপ শোভন করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন।" [২৭]

"-----আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে আর এক দল দিয়ে বাধা না দিতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খ্রীস্টানদের মঠ ও গির্জা, ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদীদের ভজনালয়, আর মুসলমানদের মসজিদ-যেখানে আল্লাহর নাম বেশী বেশী করে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তার ধর্মকে সাহায্য করে।" [২৮]

"আমি প্রত্যেক সময়ের জন্য নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও। তুমি তো সরল পথেই আছো। ওরা যদি তোমার সাথে তর্ক করে তবে বলো, 'তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে ভাল করেই জানেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবেন।" [২৯]

"বলো, 'হে অবিশ্বাসীরা! আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর, আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও যার উপাসনা আমি করি। আর আমি উপাসনাকারী হবো না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছো। আর তোমরাও উপাসনাকারী হয়ে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের আমার ধর্ম আমার।" [৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয়

আরবিতে জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পরিশ্রম করা, মেহনত করা, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো এ অর্থেই এর পারিভাষিক অর্থ হয় সত্যের জন্য চেষ্টা সাধনা করা, সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এবং তার সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। এ পথে সব রকমের কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে যেসব দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তি দান করা হয়েছে তা সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে নিয়োজিত করা এবং শেষ পর্যায়ে যদি বিরোধী পক্ষের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষ করতে হয়, তাহলে সেজন্যেও প্রস্তুত থাকা। শরীয়াতের পরিভাষায় এটিই হচ্ছে জিহাদ।

ইসলামে জিহাদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। তবে সর্বাধিক প্রচলিত ধারণা হলো, আল্লাহর মনোনীত ধর্মে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অসত্য, অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও যুদ্ধ । এই অর্থে কুরআনের অনেক আয়াতে জিহাদের উল্লেখ আছে। জিহাদ সম্পর্কে কুরআনের বিধান অতি কঠোর। কারণ এ হচ্ছে ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, মজলুম ও জালিমের মধ্যে ফায়সালার সংগ্রাম। এক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন মানেই অন্যায়, অসত্য ও জুলুমের নিকট আত্মসমর্পণ ও পরাজয় বরণ। তাই আল্লাহর পথে ন্যায়ের সংগ্রামে একবার জড়িয়ে পড়লে তা থেকে পিছু হটার কোন নির্দেশ কুরআনে নেই, যদি না শত্রু পক্ষ আগে যুদ্ধে বিরত হয়।

নিম্নে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, "তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো, যদিও এ তোমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য ভাল। আর তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।" [৩১]

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় ও আল্লাহর ধর্ম সামগ্রীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে নিশ্চত আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন।" [৩২]

"আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। নিশ্চয় তিনি সব দেখেন, সব জানেন।" [৩৩]

"অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবেলা কর তখন তাদের ঘাড়ে-গর্দানে আঘাত কর। শেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। তখন তোমরা ইচ্ছা করলে ওদেরকে মুক্ত করে দিতে পার বা মুক্তিপণ নিয়েও ছেড়ে দিতে পার। যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংবরণ করে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ-ই বিধান।" [৩৪]

উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে দেখে যায় যে, আল্লাহর মনোনীত ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ফিতনা বা সন্ত্রাস দূর করার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যই জিহাদ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তিন প্রকার জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম দুই প্রকার অর্থাৎ ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ জবান দিয়ে জিহাদটি হচ্ছে মুখের কথার মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এ জিহাদের ব্যাপকতা অনেক। অর্থাৎ বই-পত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম সব কিছুর মাধ্যমে ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জিহাদে লিপ্ত থাকা।

আবু হুরাইরা ও জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল ও চালবাজি।" [৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

নবী (সঃ)-এর জিহাদের ডাকে সর্বস্তরের সাহাবীরাই সাড়া দিয়েছিলেন। সফল যুদ্ধ বা জিহাদ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণকে তিনটি ভাগ করা যায়ঃ

১. তথ্য বিভাগীয়।
২. পরিচালনা ও আনুগত্য।
৩. শারীরিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন বিষয়ক।

ময়দানের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানা থাকলে জনশক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না এবং সে ক্ষেত্রে শারীরিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তা প্রয়োজন মুহূর্তে লাগানো সম্ভব না।

বিশ্বের যত বৃহৎ শক্তি রয়েছে, যেমন আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত, ইসরাঈল, এদের প্রত্যেকেরই তথ্য বিভাগ খুবই শক্তিশালী। এদের নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ১৯৬৫ সালে মিসর ইসরাঈল যুদ্ধে আমেরিকা ছিল ইসরাঈলের পক্ষে আর রাশিয়া ছিল মিসরের পক্ষে। কিন্তু রাশিয়া মিসরের-পক্ষে থাকলেও ইসরাঈলের কোন এক সামরিক পরিকল্পনার কথা মিসরের কাছে গোপন রাখার কারণে মিসর ইসরাঈলের কাছে চরম পরাজয় বরণ করে। কিন্তু সামরিক দিক দিয়ে তখন মিসর ইসরাঈলের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। সুতরাং সফল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শক্তিশালী তথ্য বিভাগের কোনো বিকল্প নেই।

ময়দানের সঠিক তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও পরিচালনায় যদি ত্রুটি থাকে তথা কোরআন-সুন্নাহর ঘোষিত নীতিমালার আলোকে যদি কোনো নেতৃত্ব কর্মীবাহিনীকে পরিচালনা করতে ও আনুগত্য করাতে ব্যর্থ হন, তবে বিজয়ের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে উপাদান আল্লাহর সাহায্য তা হতে বঞ্চিত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও অভিযান ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং জিহাদ বা যুদ্ধ পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই ইসলামের সামরিক নীতিমালা, যুদ্ধ কৌশল ইত্যাদি জ্ঞানগত বিষয়ে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

সবশেষে শারীরিক যোগ্যতা। যুদ্ধের ময়দানে নবীকরীম (সঃ) কোনো নাবালেগ শিশু বা কিশোরকে যেমন অনেননি তেমনি বৃদ্ধলোকদেরকেও এর অন্তর্ভক্ত করেননি। সুতরাং ন্যূনতম শারীরিক যোগ্যতা এবং কৌশল অবশ্যই জানা থাকতে হবে। আর এ জন্যেই বয়সের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য নবীপাক (সঃ) ৪০ বছরে নবুয়াত প্রাপ্তির পরও বদর, ওহুদসহ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন নিজে। আর পরিচালনা করেছেন তার চেয়েও বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তথ্যগত ও পরিচালনাগত দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক যোগ্যতা ও কৌশল জানা না থাকলে দক্ষতা কোনো কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

আবার যুদ্ধকে কৌশল ও চালবাজি বলার অর্থ হচ্ছে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করা। যুদ্ধে শত্রুপক্ষ মুসলিম পক্ষের উদ্দেশ্য ও চাল বুঝতে অসমর্থ হয় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করাকে এখানে চালবাজি বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে মিথ্যা বলা ও সুস্পষ্ট মিথ্যার বেসাতি করার কথা এখানে বলা হয়নি, যা পাশ্চাত্যে ডিপ্লোমেসি বলা হয়।

নবীপাক (সঃ) কোনো সমর বা যুদ্ধ প্রস্তুতিই শত্রুর গতিবিধি না জেনে গ্রহণ করেননি। নবীপাক (সঃ)-এর গোটা জিন্দেগীতে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। শত্রুর গতিবিধি জেনে পরামর্শভিত্তিক একটি পরিকল্পনা মাফিক লোক নিয়োগ করেছেন ময়দানে। ওহুদের যুদ্ধের কথা আপনাদের সকলের জানা আছে। পিছনের দিকে পাহাড়ে যাদেরকে তিনি মোতায়েন করেছিলেন তাদেরকে বলেছিলেন যে, আমাদেরকে হত্যা করে ছিন্ন ভিন্ন করার পর পাখিও যদি খায় তবুও তোমরা এ স্থান ত্যাগ করবে না। কিন্তু বিজয়ের আনন্দে যখনই সাহাবী (রাঃ) গণ সে স্থান ছেড়ে দিলেন তখনই আসলো বিপর্যয়টা। সুতরাং সামরিক সাফল্যের জন্য তথ্যগত নিশ্চয়তা, সঠিক পরিচালনা এবং নিরঙ্কুশ আনুগত্য এ সবেরই প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

অনিবার্যভাবে। আর নবীপাক (সঃ)-এর সাহাবীদের শারীরিক যোগ্যতার কথা নাই-বা বললাম। একা আলী (রাঃ) কেই আল্লাহপাক একটি দুর্গের ফটককে যুদ্ধের ঢাল হিসেবে ব্যবহারের যোগ্যতা দিয়েছিলেন। যদিও তিনি তা অন্য সময় উত্তোলন করতে সক্ষম হননি।

ইসলামী আন্দোলন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। দাওয়াত হচ্ছে এ রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল হাতিয়ার। আর সামরিক প্রতিরোধ বা পদক্ষেপ হচ্ছে দ্বীন কায়েমের পথে দৃঢ়তার পরীক্ষার পথমাত্র। আল্লাহপাক এ পরীক্ষা যুগে যুগে সকল মুমিনদের নিয়েছেন। কখনো বিজয় দিয়েছেন বিনা যুদ্ধে। যেমন তাবুকের যুদ্ধ, কখনো বিপর্যয় দিয়েছেন। যেমন ওহুদে- কখনো নিরঙ্কুশ বিজয় দিয়েছেন, যেমন বদরের যুদ্ধ। আর মঞ্জুর করেছেন কিছু শাহাদাত।

আল্লাহপাক বলেন, "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারাতো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।" [৩৬]

আল্লাহপাক আরো বলেন, "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্য্যশীল তা এখনও জানেন না।" [৩৭]

আল্লাহপাক আরো বলেন, "মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।" [৩৮]

রাজনৈতিকভাবে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক ফায়সালার মাধ্যমে। যেমন হয়েছে ইরানে, হয়েছে আফগানিস্তানে, হয়েছে বসনিয়ায়, হচ্ছে চেচনিয়ায়, হচ্ছে কাশ্মীরে, হচ্ছে আলজেরিয়ায়, ফিলিস্তিনে। মুসলিম জিন্দেগীর জন্য এ এক অমোঘ পরীক্ষা। এদেশেও ইসলামী আদর্শের রাজনৈতিক বা আদর্শগত পরিচয় মিটিয়ে দেবার চেষ্টা সাধনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন এখন এখন এক কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত। এসবই বাস্তবতা।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যার প্রচেষ্টা চালালেও তিনি কোনো প্রতিরোধ করেননি বরং কৌশলে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু, মদীনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির পর সুচিন্তিতভাবে প্রতিটি বাধার মোকাবেলা করা হয়েছে। তবে আক্রমণকারী হিসেবে নয়, আক্রমণ প্রতিরোধকারী হিসেবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, "হে লোকেরা জেনে নাও যে জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।

কুরআনে বর্ণিত জিহাদ ও বর্তমান সময়ে সংঘটিত সন্ত্রাসের ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমান বিশ্বে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড যথা-হত্যা, অন্যায় যুদ্ধ, আগ্রাসন এগুলো কুরআনে বর্ণিত ফিতনা, অশান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজের পর্যায়ভুক্ত। এগুলোর বিরুদ্ধেও কুরআনে জিহাদ করতে বলা হয়েছে।

তবে আমেরিকা, বৃটেন ও তাদের দোসরদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস বলতে বুঝায়- যারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংগ্রামরত, যারা ইসরাইলের আগ্রাসন থেকে নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মঘাতী হচ্ছে, যারা নিজ দেশে পরবাসী এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে দখলদার বিদেশী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যেসব দেশ আফগানিস্তান, ইরাকের

Dhaka University Institutional Repository

মতো সম্ভাব্য আগ্রাসী আক্রমণ ঠেকানোর মতো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তারাই সন্ত্রাসী! যাদের সন্ত্রাসী ও বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকি বলে সারা বিশ্বকে বুঝানো হয়েছে, তারা কোথা থেকে কিভাবে বড়ে উঠলো সেটাও বিবেচনায় আনা দরকার।

সবশেষে বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সন্ত্রাসের মাধ্যমে তথা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে, জোর জবরদস্তিমূলকভাবে আবু জেহেল, আবু লাহাবের মত ঘোর অন্ধ বিরোধিতাকারীদেরকে খুন করে ইসলামী বিপ্লব সাধন করেননি। বরং উপর্যুপরি ভয় দেখিয়েছেন আল্লাহর আযাবের; আশা দেখিয়েছেন জান্নাতের। আর নির্যাতন, অত্যাচার, গালি-গালাজ, বয়কট, হত্যা, সবকিছুর বিপরীতে কোনো প্রতিশোধমূলক সন্ত্রাসী পদক্ষেপ নেননি,

নিয়েছেন রাজনৈতিক অথবা কৌশলগত (Political or Diplomatic) পদক্ষেপ। আর রাজনৈতিক ও কৌশলগত পদক্ষেপের কোনো কোনো পর্যায়ে অনিবার্যভাবে এসে গিয়েছিল সামরিক কার্যক্রম। আর তিনি তা সাহাবীদের (রাঃ) নিয়ে জীবন বাজী রেখে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। বস্তুতঃ রাজনৈতিক বা আদর্শগত বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সামরিক পদক্ষেপের। ন্যায়সংগত সামরিক পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিকভাবেও সন্ত্রাসবাদিতা বলা যায় না।

কাজেই বলা যায় অন্যায়-অবিচার, জুলম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সন্ত্রাস নয়।

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন ২ ঃ ১৯১
২. আল কুরআন ২ ঃ ২০৫
৩. আল কুরআন ২ ঃ ২১৭
৪. আল কুরআন ১৫ঃ ৯
৫. আল কুরআন ৬১ ঃ ৮-৯
৬. আল কুরআন ৪ ঃ ৭৬
৭. আল কুরআন ৮৬ ঃ ১৫-১৭
৮. আল কুরআন ২০ঃ ১৩০
৯. আল কুরআন ১৭ ঃ ৫৩
১০. আল কুরআন ৭ ঃ ৫৬
১১. আল কুরআন ৫ ঃ ৮২
১২. আল কুরআন ২ ঃ ১১-১২
১৩. আল কুরআন ২ ঃ ১৯০
১৪. আল কুরআন ২২ ঃ ৩৯
১৫. আল কুরআন ৫ ঃ ২
১৬. আল কুরআন ৫ ঃ ৮
১৭. আল কুরআন ৬ঃ ১৫১
১৮. আল কুরআন ৮ ঃ ৬৬
১৯. আবুল আলা, আল জিহাদ, পৃষ্ঠা-২৩০
উদৃত্ত শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির "রাজনৈতিক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদিতা ও ইসলাম" মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর-২০০১, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২২।
২০. আবুল আলা, আল জিহাদ, পৃষ্ঠা-২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

উদৃত্ত শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির "রাজনৈতিক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদিতা ও ইসলাম" মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর-২০০১, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২২।

২১. আবুল আলা, আল জিহাদ, পৃষ্ঠা-২২৮
উদৃত্ত শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির "রাজনৈতিক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদিতা ও ইসলাম" মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর-২০০১, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২২।

২২. আল কুরআন ২ ঃ ২৫৬

২৩. আল কুরআন ৫০ ঃ ৪৫

২৪. আল কুরআন ৪ ঃ ১৭১

২৫. আল কুরআন ৫ ঃ ৭৭

২৬. আল কুরআন ২৯ ঃ ৪৬

২৭. আল কুরআন ৬ ঃ ১৮

২৮. আল কুরআন ১২ ঃ ৪০

২৯. আল কুরআন ২২ ঃ ৬৭-৬৯

৩০. আল কুরআন ১০৯ ঃ ১-৬

৩১. আল কুরআন ২ ঃ ২১৬

৩২. আল কুরআন ৮ ঃ ৩৯

৩৩. আল কুরআন ৮ ঃ ৬১

৩৪. আল কুরআন ৪৭ ঃ ৪

৩৫. সহীহ বোখারী শরীফ, হাদীস নং ২৮১৬-২৮১৮, পৃষ্ঠা-৪২০
রিয়াদুস সালেহীন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২০৯

৩৬. আল কুরআন ৯ ঃ ৪৪-৪৫

৩৭. আল কুরআন ৩ ঃ ১৪২

৩৮. আল কুরআন ২৯ ঃ ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

দুর্নীতিঃ সন্ত্রাসের প্রধান উৎস, প্রেক্ষাপট আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ

কোন কিছুর বিনিময়ে অনিয়মতান্ত্রিক, অন্যায় বা অবৈধ কাজ করার নাম দুর্নীতি। অবৈধ বা অন্যায় কাজ করার ফলে এর প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে পড়ে। বেড়ে যায় অস্থিরতা, শুরু হয় সন্ত্রাস এবং সীমাহীন সন্ত্রাসের রাজত্ব। কাজেই সকল সন্ত্রাসের মূল উৎস++++++++++++++++++ দুর্নীতি।
মুলতঃ ব্যক্তিগত, দলীয় বা গোষ্ঠীগত লাভের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি।

দারিদ্রের লীলাভূমি বাংলাদেশের মাটি দুর্নীতির জন্যও খুবই উর্বর তা অন্ধব্যক্তিও স্পষ্ট দেখতে পায়। দারিদ্র ও দুর্নীতি যেন দুই সহোদর। অবিচ্ছিন্ন জমজ। দুর্নীতির প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রের বিস্তৃতিও অব্যাহত আছে। সেই সঙ্গে সাহায্যের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি। এ এক দুষ্ট চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ। ট্রেইড, নট এইড। সাহায্য নয়, বাণিজ্য। এই স্লোগান এখন এখানে একেবারেই শোনা যায় না। সাহায্যলোভী দুর্নীতিবাজেরা বাণিজ্যের কণ্ঠ স্তব্ধ করে রেখেছে। সাহায্যের নামে এক অপূর্ব ভানুমতির খেইল চলছে দেশে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ।

ব্যাপারটা ভূত তাড়ানোর মহৌষধ সর্ষেকেই ভূতে পাওয়ার মতো বলা যেতে পারে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বেশ তোড়জোড় করেই দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ব্যুরোর বরকতে দুর্নীতির পাল্লা-ই ভারী হলো। অর্ধশতাব্দী যাবৎ এই সুবিশাল প্রতিষ্ঠানটি দেশে দুর্নীতি রোধে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির এমন ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে যে, এক সময়ে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বের সেরা দেশ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। এ পরিচয় আজও ঘোচেনি। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর এই সুদীর্ঘকালীন চরম ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে একটি শক্তিশালী সফল স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের সার্বজনীন দাবি এত প্রবল হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত সেই দাবি মেনে নেয়া ছাড়া সরকারের গত্যন্তর ছিল না। অবশেষে দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত হলো। সেই শুন্যস্থান পূরণে মহা ধুমধামে আত্মপ্রকাশ করল স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন (এসিসি)'।

নভেম্বর-২০০৫ এই কমিশন গঠনের পর এক বছর গত হয়েছে। ২০০৫ সালেও বাংলাদেশ পঞ্চমবারের মতো বিশ্বে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশেগুলোর শীর্ষেই আছে। কিন্তু কমিশন এখনও গা ঝাড়া দিয়ে উঠেনি।

কমিশনের এহেন অপ্রত্যাশিত উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে দুর্নীতি দমন ব্যুরো এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য এখনও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; এটা পরম পরিতাপের বিষয়।

২০০১ সালের পূর্বে সারা বিশ্বজুড়ে দুর্নীতির যে রিপোর্টগুলো আমরা দেখেছি তার প্রায় সবগুলোতেই নাইজেরিয়া দখল করেছে সর্বশীর্ষ স্থান। আর আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশের অধিবাসীরা ক্রমাগত দুর্নীতি দ্বারা পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিত ছিলাম যে, বাংলাদেশের দুর্নীতির মাত্রা এখনও নাইজেরিয়ার ধারে-কাছে পৌছুতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশ ৯৬ সালে যেখানে চার নম্বরে অবস্থান করছিল, সেখানে ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত পর পর পাঁচবার সব দেশকে ছাড়িয়ে এক নম্বরে অবস্থান নিয়েছে। টিআই-এর Corruption Perception Index (CPI) অনুসারে দুর্নীতির সূচকে শূন্য থেকে ১০ স্কোর আছে। এক্ষেত্রে শূন্য হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের জন্যে এবং ১০ স্কোর হচ্ছে সবচেয়ে কম দুর্নীতি গ্রস্থ দেশের জন্যে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচকের দিক থেকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ঃ বাংলাদেশ

সাল	মোট দেশ	বাংলাদেশের স্কোর	অবস্থান
২০০১	৯১	০.৪	সর্বশেষ
২০০২	১০২	১.২	সর্বশেষ
২০০৩	১৩৩	১.৩	সর্বশেষ
২০০৪	১৪৬	১.৫	সর্বশেষ
২০০৫	১৫৯	১.৭	সর্বশেষ

সূত্রঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট-২০০৫

টিআই রিপোর্ট তৈরি হয় যেসব বিষয়ে উপর ভিত্তি করে তা হলো একটি দেশে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সরকারি প্রশাসনে বিদ্যমান দুর্নীতি সম্পর্কে ঐদেশে অবস্থানরত বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে কর্মরত উর্ধ্বতন নির্বাহী ও ব্যবস্থাপক এবং দেশ সম্পর্কে বিশ্লেষকদের ধারণা বা মতামতের উপর ভিত্তি করেই দুর্নীতির ধারণা সূচক তৈরী করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সূচক নির্ধারণের জন্যে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত Business Environment Survey 2001, World Economic Forum এর Global Competitiveness Report 2001 এবং Economist Intelligence Umt-এই তিনটি জরিপকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত Business executive, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, বিদেশী বিনিয়োগকারী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে। টিআই কর্তৃপক্ষ যদিও বলেছেন যে, আরো বেশি দুর্নীতিগ্রস্থের তালিকায় নাম লেখাতে পারে এরকম কয়েকটি দেশ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি ব'লে এই সূচকে সেগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তবে যাই হোক না কেন বাংলাদেশ যে প্রথম সারির দুর্নীতিভারাক্রান্ত দেশ তা প্রায় সব আন্তর্জাতিক জরিপেই চিহ্নিত হয়েছে।

'তলাবিহীন ঝুড়ি', 'আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি', 'ম্যালথাসের দেশ', 'ভূমিদাসের দেশ', 'উন্নয়নের টেস্টকেস', 'পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রামীণ বস্তি' ইত্যাদি খেতাবের সাথে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এবার যুক্ত হলো নতুন খেতাব 'বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ন দেশ'। CPI সম্পর্কে বিভিন্ন বিরূপ মন্তব্য থাকলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশে দুর্নীতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে দুর্নীতি তার স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। এ ধরনের সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতি প্রভাব ফেলছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি স্থির থাকছে না, বরং তা ছড়িয়ে পড়ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিদেশী বিনিয়োগ, দেশের আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এর সাথে জড়িত। দুর্নীতি দূর না হলে দারিদ্র্যও যাচ্ছে না, উন্নয়নও হচ্ছে না এবং সৎ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে না। দুর্নীতিগ্রস্থ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই যে, আর এ দুর্নীতি হচ্ছে সকল সন্ত্রাসের প্রধান উৎস।

"দুর্নীতির ধরণ বা প্রকার সম্পর্কেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি স্কুলের মতবাদ অনুযায়ী দুর্নীতি তিন প্রকার হতে পারে। যেমন-

ধরন-১

- *Petty Corruption*-পরিব্যাপ্ত, সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- *Middling Corruption*-এন্টাপ্রাইজ লেভেলে হয়, জড়িত থাকেন আমলারা।
- *Grand Corruption*-রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে হয়। এক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়টি জড়িত থাকে।

ধরন-২

- ব্যক্তিগত-ব্যক্তি রাজনীতিবিদ বা আমলা এক্ষেত্রে জড়িত থাকেন। পুরো প্রক্রিয়াটি সিস্টেমেটিক নয় এবং বিচ্ছিন্ন।
- প্রতিষ্ঠানগত-যখন দুর্নীতি হয় বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা সেক্টরে।
- নিয়মতান্ত্রিক-যখন দুর্নীতি পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল প্রকার লেনদেনের স্বীকৃত মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়।

ধরণ-৩

- আমলাতান্ত্রিক-আমরা সাধারণত দুর্নীতি বলতে যা বুঝি সেটাই আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি। এক্ষেত্রে আমলারা তাদের দায়িত্বে অবহেলা করেন ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে।

- রাজনৈতিক-এটি মূলত আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির বর্ধিত রূপ। প্রথম রূপ এ রকম, রাজনৈতিক নেতা বা তার আত্মীয়, কোন গোষ্ঠী, সরকারি অফিসের কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছে। যেমন কোনো কাজের কন্ট্রাক্ট থেকে কমিশন নেয়া। দ্বিতীয় রূপটি হলো সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেয়ার জন্য ঘুষ নেয়া। তৃতীয়টি হচ্ছে শহর এলাকার চাহিদা সম্পন্ন জমি দখল করা। চতুর্থ রূপ-চাকরি বা সম্পদে সুবিধাজনক অবস্থান দেয়ার জন্য কাছের লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং পঞ্চম রূপটি হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রভাব এবং ভোট কিনে নেয়া।" [১]

এক্ষেত্রে সামাজিক দুর্নীতিকেও একটি ধরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যে ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তা পর্যালোচনা করা আবশ্যেক। সামাজিক দুর্নীতি অনেক সময় আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। এ ছাড়াও সতর্ক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে আমরা অনেক বড় বড় দুর্নীতিকর্মকে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মর্যাদা দেই। চতুর দুর্নীতিবাজেরা তাদের দুর্নীতিকর্মের মধ্যদিয়ে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের সাহায্যে কেউ যদি সমাজে সকলের ব্যবহারের জন্যে একটি সেবামূলক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল নির্মাণ করেন তাহলে সাধারণত সে উদ্যোগ প্রশংসিত হয়। কিন্তু, কিভাবে উপার্জিত অর্থ দিয়ে একাজ করা হলো তা বিচার করে একে নিন্দা করা হয় না। দুর্নীতির গড ফাদারেরা এ ধরনের সামাজিক ঘুষ দিয়ে নিজেদের মর্যাদা ক্রয় করেছেন যা এধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে সাহায্য করছি।

"মুচকুন্দ দুবে দুর্নীতিকে আবার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রধান কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

- Wholesale corruption-বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে এটি হয়।
- Retail corruption-এক্ষেত্রে ছোট-খাট ঘুষের আদান-প্রদান হয়।
- Centralisted corruption-যখন সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বা উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি হয়।
- Decentralized corruption-যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে যায়, রাষ্ট্রের উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত।" [২]

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতির কয়েকটি প্রধান কারণ

১. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় আইনের ব্যবহার।

২. জনসাধারণের কাছে সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নেই বল্লেই চলে। সরকারী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনসাধারণের জানার অধিকার নেই। এমনকি এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনসাধারণের মতামতই নেয়া হয় না।

৩. শক্তিশালী ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাবে সরকার পরিচালিত।

৪. সরকার এমনকি জনগণের পক্ষ থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনগত উদ্যোগের অনীহা। প্রকৃতপক্ষে, সবাই এর সাথে এমনই অভ্যস্থ হয়ে গেছে যে, এটাকে স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ মনে করতে বাধ্য হচ্ছে।

৫. যথাযথ আইনগত কাঠামোর অভাব। এছাড়া আইনের ফাঁক-ফোকর এত বেশি যে, দুর্নীতির হোতারা জানেন যে, যে কোনোভাবে তারা এর দায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন বিনিময়ের মাধ্যমে।

৬. দুর্নীতির স্থায়ী চক্র অসাধু ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আমলারা মিলে এই চক্রটি তৈরি করেছেন। মূলতঃ রাজনীতি বিদেরা দুর্নীতির প্রধান হোতা।

৭. বিদ্যমান রাজনৈতিক দুর্নীতি, যা আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় বলে সকলের নিশ্চিত বিশ্বাস।

৮. রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব, সরকারি অফিসে স্বায়ত্বশাসন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বা পারস্পরিক সংহতির অভাব রয়েছে।

৯. আমাদের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনেক কম। আধুনিকায়নের সাথে সাথে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে কিন্তু সে অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধার হার বাড়ে না।

১০. দুর্নীতির মূলকারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের। যারা বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা ভোগ করেন তারা তা ব্যবহার করে নিজেরা ফায়দা লুটেন। এক্ষেত্রে অন্য ক্ষমতাশীন ব্যক্তিরা তাকে protection দেন।

১১. Special Anti-corruption Court নেই। কার্যকরী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অভাব এবং ন্যায়পালের মত সাংবিধানিক পদ বাস্তবায়িত না করা।

সমাজে দুর্নীতির প্রভাব

দুর্নীতির প্রভাব সম্পর্কে অনেক তত্ত্ববিদ ইতিবাচক বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে 'Speed money' আমলাতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূর করে। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমিয়ে দেয়, স্থবির কাঠামোকে সচলতা দান করে। তাতে অর্থনৈতিক অবস্থা গতির মধ্যে ফিরে আসে এবং সামাজিক ভারসাম্য তৈরি হবে। যারা এই দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক, তাদের যুক্তি হচ্ছে অনুন্নত রাষ্টগুলোতে রাজনৈতিক, সামাজিক,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক স্থবিরতা তৈরি হয় তাদের অবকাঠামোগত কিছু সমস্যার জন্যে। এতে গোটা প্রক্রিয়াটা মার খেয়ে যায়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যর্থ হতে বাধ্য হয় এ ধরনের স্থবিরতা দূর করতে। এরকম চরম পরিস্থিতিতে দুর্নীতির মাধ্যমে সচলতা ফিরিয়ে আনা যায় এবং আমলাতন্ত্রকে কর্মমুখী করা যায়। উদাহরণ হিসেবে Theobold প্রাক্তণ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শহরের Patronage system এর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা দুর্নীতির এ ধরনের Instrumental advantage নিয়েছিল। অনেক তত্ত্ববিদের মতে, ঘুষ ব্যক্তি বিশেষের মুলধন গঠনে সাহায্য করে সত্য তবে তার দ্বারা পরবর্তীতে সমাজ বা রাষ্ট্র লাভবান হয়।

তত্ত্ববিদেরা মনে করেন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্নীতি নৈর্ব্যক্তিক ও স্থবির অবস্থানের পরিবর্তে অনেক বেশি ভালো আচরণ উপহার দেয়। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের জন্যে ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে এবং নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে ব্রাজিলের কথা বলা যেতে পারে। যেখানে কোনো একটি export licence পাওয়ার জন্যে ১৪৭০ টি legal actions রয়েছে এবং ১৩টি সরকারি মন্ত্রণালয় এবং ৫০টি এজেন্সির কাছে গিয়ে ধর্ণা দরতে হয়। এখানে একদল broker-রা কাজ করেন মধ্যবর্তী লোক হিসেবে, যাদের কাজই হলো কারো কাছ থেকে নির্দিষ্ট অংকের টাকা নিয়ে কাজ পাইয়ে বা করিয়ে দেয়া।

কিন্তু দুর্নীতির ইতিবাচক দিকটি সম্পর্কে যে ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তা আদতে কতটুকু ইতিবাচক তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ যে প্রক্রিয়াটি প্রশাসনকে গতিশীল করবে তাই আবার প্রশাসনকে ঘুষ নির্ভর করে তুলছে। এই নির্ভরশীলতা এমনই যে, দুর্নীতি ছাড়া প্রশাসন আবার স্থবির হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া দুর্নীতি প্রশাসনকে সচল করলেও প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ হিসেবে তা অত্যন্ত নেতিবাচক। এবং এটি রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্যে কনো গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে না। বরং ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধা নেয়ার জন্যে ক্ষমতাশালীদের সুবিধা দানের মাধ্যমে প্ররোচনা করা, যা একই অবস্থানে চাকরিরত ব্যক্তিদের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। এটি এক ধরনের সামাজিক ভারসাম্যহীনতাও সৃষ্টি করে। আর সরকারি কর্মকর্তারা যে ঘুষ নিচ্ছেন তার কোনো আয়কর দেন না। ফলে সরকার এ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

আবার ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে হলে বিভিন্ন স্থানে ঘুষ দিতে হয়। কাজেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায় এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগের আগ্রহ কমে যেতে থাকে। এবং একই সাথে বিদেশী বিনিয়োগ কমে যায়।

দুর্নীতির ফলে বিশেষ ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ফলাফল ফেলেও সরকারী সকল কাজ হয় বিলম্বিত এবং দরিদ্র জনসাধারণ সরকারী সেবা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

দুর্নীতির ফলে কোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। জনগণের জন্যে গৃহীত প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন সুবিধাবাদীর সুবিধা গ্রহণের প্রকল্প বলা যায়।

বিচার বিভাগ, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদি পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দুর্নীতির কারণে দেশের আইনশৃংঙ্খলার অবনতি হয় মারাত্মকভাবে, ফলে সন্ত্রাসের সীমাহীন রাজত্ব কায়েম হয় যেটা অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

"World Bank এর মতে Another economic cost can be in the form of environmental degradation that can take place due to the presence of corruption and Misgovernance. পরিবেশ আইন বাস্তবায়নের জন্যে দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে অপরিবেশবাদী শিল্প স্থাপন এবং অন্যায় কাজ করে থাকে অনেক দেশের শিল্পপতিরা। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক অস্থিরতা, হতাশা ছড়িয়ে পড়ে সবার মধ্যে যা উন্নয়নের অন্তরায়।" [৩]

Dhaka University Institutional Repository

"দুর্নীতির প্রক্রিয়া মূলত দুটি। প্রথমত, সরকারি সম্পদ বা আয় অত্মসাৎ করা এবং দ্বিতীয়ত, সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্যে তাকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেয়া। প্রথমটি সমাজ বা রাষ্ট্রকে ক্রমাগত দরিদ্র্যে পরিণত করে এবং দ্বিতীয়টি প্রবৃদ্ধিকে স্তিমিত করে দেয়। ফলে দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজ বা রাষ্ট্র একপা না এগিয়েও দুই পা করে পিছিয়ে যায়। Robert Klitgard দুর্নীতির সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে একটি সাধারণ সূত্র ব্যবহার করেছেন। তাঁর সূত্রটি হলো-

$$C = M + D - A - S$$

এখানে C = corruption

M = Monopoly

C = Discretion

A = Accountability

S = Public Salaries

সুতরাং দুর্নীতি মানেই হচ্ছে ক্ষমতাসীনের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং মর্জিমাফিক সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং একই সাথে জবাবদিহিতার শূন্যতা এবং কর্মীদের নিম্নমানের বেতন প্রাপ্তি। আবার বিপরীত দিক থেকে যে সমাজেই এই বৈশিষ্টগুলো বিদ্যমান সেখানেই দুর্নীতি বেশি।" [৪]

বিভিন্ন দেশে দুর্নীতির পরিস্থিতি

বিশ্বে দুর্নীতির শুরু সেই প্রাচীন কাল থেকে। চতুর্থ শতকের রোমান সম্রাট থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানরা দুর্নীতির স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পরেছেন। সিউল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক Los Angeles times-এ লিখেছেন যে, কোরিয়ান দুর্নীতির উদ্ভবই হয়েছে ঐতিহ্যগত আচার এবং আধুনিক শিল্পোন্নয়নের পারস্পরিক সংস্পর্শের কারণে।

"Huntington মনে করেন সারা বিশ্বজুড়ে আধুনিকায়নের সাথে সাথে দুর্নীতির মাত্রাও বাড়ছে। কারণ ১৯ শতকের আমেরিকার থেকে ১৮ শতকের আমেরিকায় কিংবা ১৮ শতকের বৃটেন থেকে ১৭ শতকের বৃটেনে দুর্নীতির মাত্রা কম। তাঁর মতে, Corruption may be more prevalent in some cultures than in others, but in most cultures it seems to be most prevalent during the most intense phase of modernization." [৫]

সারাবিশ্ব জুড়ে যে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা এখন বাস্তব সত্য। দুর্নীতির এই প্রাদুর্ভাব (Moises Naim একে বলেছেন corruption eruption) সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা কিংবা আয়গত বৈষম্য ছাড়িয়ে প্রত্যেক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থাৎ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো এর শিকার সবচেয়ে বেশি। টিআই এর দুর্নীতির ধারণায় যে দেশগুলোর নাম দুর্নীতির শীর্ষে থাকে তার অধিকাংশই আফ্রিকা এবং এশিয়ার, যেমন-নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, প্যারাগুয়ে, হন্দুরাস, তানজানিয়া, ঘানা, মোজাম্বিক, ইন্দোনেশিয়া, ইকুয়েডর, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, উগান্ডা ইত্যাদি। তবে প্রাক্তণ সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের সদ্য গণতান্ত্রিক দেশগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টিতেও সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশগুলোর তালিকায় স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

লিথুয়ানিয়ায় ২৮ শতাংশ এবং রাশিয়ায় ৪০ শতাংশ জিডিপি নিয়ন্ত্রিত হয় 'Shadow economy' দ্বারা। বুলগেরিয়ায় এক তৃতীয়াংশ কর্মী কাজে নিযুক্ত হয় অপদ্ধতিগতভাবে। তাজাকিস্তানে সরকারই স্বীকার করে নিয়েছে যে ১৯৯৭ প্রথমার্ধের খুচরা কাজের প্রায় ৯৫ শতাংশ হয়েছে ব্লাক মার্কেট। Freedom House Founattection এর এক জরিপে দেখা গেছে, বেলারুসে প্রায় সব চাকরিতেই ঘুষ আদান-প্রদান হয়। স্লোভাকিয়ায় প্রশাসনের সাথে যে কোন কাজেই ঘুষ একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে এবং তুর্কিমেনিস্তানেও যে সকল কাজে সরকারি কর্মকর্তারা জড়িত সেখানে অর্থদান বাধ্যতামূলক।

রুমানিয়ার দুর্নীতি সম্পর্কে একটি মজার গল্প চালু আছে যেটা CIGARETTE COLONELS নামে পরিচিত। গল্পটি হলো IMF Europian ফিরিয়ে আনার জন্যে Union (EU) প্রতিনিধিরা রুমানিয়ায় গেছেন বাজেটের ব্যালান্স করতে। কিন্তু রুমানিয়ান সরকার তার ব্যয় কমাতে রাজী নয়, বরং তারা সিগারেটের ওপর ৬০ ভাগ কর আরোপ করল। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই চোরাচালান শুরু হয়ে গেলো সিগারেটের।

যার সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জড়িত ছিল সামরিক বাহিনী। কাস্টমস এজেন্ট যথারীতি এটা ধরে ফেলত তবে কাস্টমস ব্যুরো এই বাজেয়াপ্ত লিগারেট বিক্রির অনুমোদন লাভ করেছিল। এতে কাস্টমস বাজেটে লাভের অর্থ যেত এবং সামরিক বাহিনীও বিক্রির অর্থ লাভ করতো। ফলে তারা দু-পক্ষই খুশী। সরকারকেও আর আগের মত কাস্টমস ব্যুরো কিংবা সেনাবাহিনীতে খরচ করতে হতো না, ফলে সরকারও খুশী। রুমানিয়ান সরকার কমপক্ষে রাজস্ব আয় বাড়াবার চেষ্টা করেছে ফলে IMF এবং EU ও খুশি।

"ইউক্রেনও দুর্নীতি প্রবল এলাকা। এখানকার ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ অর্থনীতিই কালোবাজারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্ধাংশ মানুষের জীবিকাই অ-আইনগত। ফলে কেউ যদি ইউক্রেনবাসীর প্রতিদিনকার ডায়েরী পড়েন তাহলে দেখা যাবে তাতে লেখা Got up, made coffee, broke into the neighbor's apartment for eggs. গত বছরই জার্মানীর সাবেক চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল অর্থ কেলেঙ্কারীর দায়ে অভিযুক্ত হন। অভিযোগটি ছিল যে, এশিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন দলের প্রধান এবং চ্যান্সেলর থাকাকালীন তিনি ১০ লাখ ডলার চাঁদা নিয়েছিলেন বেআইনিভাবে। কোহল তাঁর ভূল স্বীকার করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। এমনকি তার বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেন।" [৬]

"থাইল্যান্ডের প্রায় সব ইন্সটিটিউশনে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। Laurence W. Sreshthaputra লিখেছেন The list of scandals gets longer each day in a country where corruption drains away 10 to 20 Percent of the national budget about 2.25 to 4.5 billon dollars.

অর্থনীতিবিদ Edgardo Buscaglia-এর একটি জরিপ অনুযায়ী ব্রাজিল, আর্জেনটিনা, ইকুয়েডর এবং ভেনেজুয়েলায় ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত সময়ে ঘুষ এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অর্থ দেয়ার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। U.S. Information Agency কৃত জরিপে দেখা গেছে মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের জনগণ মনে করেন যে, কম্যুনিজমের পতনের সময় থেকে এ অঞ্চলে দুর্নীতি বাড়ছে।" [৭]

চীনে দুর্নীতির দায়ে আটক ব্যক্তিদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৮০-র দশকের শুরুতে ঘুষের অংকের পরিমাণ যেখানে শ বা হাজারে ছিল বর্তমানে তা বিলিয়নে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে চীন ঘোষণা করে যে, ১৮.৩ বিলিয়ন যুআন অর্থাৎ ২.২ বিলিয়ন ডলার আত্মসাতের জন্যে ১৮ জন প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তার বিচার করা হবে। চীনে জুলাই ১৯৮৮ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৯ এই আঠার মাসে ৬১৯টি দুর্নীতি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে একটি পত্রিকা।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পোন্নত দেশ যেমন জাপান, ইটালীও দুর্নীতিমুক্ত নয়। এই দেশগুলো একসময় পশ্চিমা জোটের 'most stable members' হিসেবে পরিণত থাকলেও বর্তমানে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের খাতায় নাম লিখিয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে পর পর কয়েকজন জাপানী প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির স্ক্যান্ডেলের শিকার হয়েছেন। ১৯৯৩ সালে ঘুষ নেয়ার দায়ে ৯৯ জন সরকারি কর্মকর্তাকে অপরাধের সাজা দিয়েছে। ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহৎ জোটের ৯ জন রাজনৈতিক নেতা ও এক জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ দুইজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ঘুষ গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

এশিয়ার অন্য দুইটি দেশ ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ায় দুর্নীতির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ফিলিপাইনের জোসেফ এস্ত্রোদা দুর্নীতির কারণে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এক্ষেত্রে মোটামুটি অপরাজেয় একটা অবস্থানে পৌছেছিলেন। অবস্থাটা এরকম দাঁড়িয়েছিল যে, সুহার্তো পরিবারের সদস্য বা তার বন্ধুর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে প্রজেক্টগুলোর অর্থ সরকারী ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা হতো। তার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদও দুর্নীতির দায়ে শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত হন এবং তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়।

নাইজেরিয়ায় জেনারেল সানি আবাচা দেশের সম্পদের প্রধান উৎস তেল সম্পদ থেকে বিলিয়ন ডলার মেরে দিয়েছেন। এছাড়া সরকারি রাজস্বের প্রায় শতাংশ নিজের জন্যে ব্যয় করতেন। নাইজেরিয়ায় ৮০এর দশকের মাথাপিছু আয় ছিল ৮০০ ডলার, দুর্নীতিবাজ শাসকদের কবলে পড়ে ৯০ দশকের শেষের দিকে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩০০ ডলার। তেল সম্পদে সমৃদ্ধ এই দশটি জ্বালানী সংকটে ভুগছে সব সময়।

জায়ারের সরকার প্রধান মবুতু কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে। নিছক ব্যক্তিগত কাজেও তিনি কনকর্ড বিমানে যাতায়াত করতেন।

"আমাদের পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান এবং ভারতের দুর্নীতির স্বরূপ-তো আমাদের কাছে প্রকাশ্য। দুর্নীতির ধরন অনেকটা আমাদের মতই। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে খোদ যুক্তরাষ্ট্র দুর্নীতি দুর করার জন্যে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সেখানে বহাল তবিয়তে দুর্নীতিবাজরা রাজত্ব করছে। অধিকাংশ আমেরিকানই মনে করেন, 'Politicians today characterized by glib rhetoric, empty promises, corruption and moral bankruptcy. Police and firefighters and teachers and nurses in some cases abandon their posts to picket." [৮]

সাড়া বিশ্বজুড়ে দুর্নীতি সম্পর্কে এসব তথ্য দেখেই কেবল আচঁ করা যাবে না যে, সত্যিকারের দুর্নীতির মাত্রা কতখানি। জেরেমী পোপ এর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, দুর্নীতি কোনো আইসবার্গ নয় যে, যতটুকু ভেসে থাকে তা দেখে উপলব্ধি করা যাবে। সুতরাং যা পত্র-পত্রিকায়, বই-পুস্তকে প্রকাশিত হয় বাস্তবে দুর্নীতির মাত্রা তার থেকে অনেক বেশি। এটা সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গত ২০০০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত দুর্নীতি দমন বিষয়ক এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন সিউলে ADB-র ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. লিন্টজার বলেছেন----- আমার আশঙ্কা বিশ্ব অর্থনীতিতে দুর্নীতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বিজনেস ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম, ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেডারিক ডি টেম্পল বলেছেন, 'দুর্নীতি ও দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হচ্ছে না। দুর্নীতি এখন বাংলাদেশের প্রশাসনের নিত্যসঙ্গী। বিষয়টি এখন নৈতিকতা ও আইনগত বিষয়ের উর্ধ্বে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।' ইউএনডিপির দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন বিষয়ক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে এখানকার নেতারা দুর্নীতিপরায়ণ। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। গত পাঁচ বছরে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির ইতিহাস

দুর্নীতি পর্যুদস্ত বাংলাদেশ হঠাৎ করেই এর শিকার হয়নি। বরং ক্রমাগত প্রক্রিয়ায় মাধ্যমেই এই অবস্থার সম্মুখীন আমাদের এই দেশ।

মূলত ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই এদেশে দুর্নীতি শুরু হয়। এটিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ শাসনকাল। কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের এত কম বেতন দেয়া হত যে তারা বাধ্য হত সাধারন জনগণের ওপর বল প্রয়োগ করতে অথবা ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করতে। রামদুলাল দে নামক একজন সরকারি ক্লার্ক মাসিক বেতন পেতেন ৫ রুপী কিন্তু কিছুদিন পর তিনি একটি rich ship এর মালিক হয়েছিলেন। এরকম বহু ঘটনা উল্লেখ করা যায়। লর্ড ক্লাইভ, যিনি নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে এসেছিলেন, তিনি দেশে ফিরলেন ২৫ লক্ষ পাউন্ড নিয়ে। এছাড়াও প্রতি বছর তার আয় ছিল ২৭০০০ পাউন্ড। কোম্পানীর চাকুরেদের ক্ষেত্রে ক্লাইভের মন্তব্য ছিল set of men whose sense of honour and duty to their employes had been estrauged by the larger pursuit of their own immediate advantages. পরবর্তীতে কর্ণওয়ালিসের প্রশাসনিক সংস্কারের কারণে তা অত্যন্ত কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। কিন্তু সেটা দুর্নীতি দূর করার মাধ্যমে নয় বরং আমলাতন্ত্রের নিম্নস্তরের কর্মীদের মধ্যে দুর্নীতি বজায় রেখে।

পাকিস্তান আমল থেকেই জনগণের ওপর দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছিল। যার ফলে ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারণার দুর্নীতির বিষয়টি বিশেষভাবে এসেছে। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সময় এটি পেয়েছিল ধ্রুপদী মর্যাদা। সাধারণত সামরিক শাসকগণ যেহেতু অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করেন সেহেতু তারা সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং অনুগত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অবারিত সুযোগ দেন দুর্নীতি করার। এটা করেন তারা নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্যই। এতে করে সমাজে সুবিধাবাদী একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়, যারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার জন্যে যে কোন ধরনের আপোষে প্রস্তুত থাকে। আইয়ুব আমলে হয়েছিল তাই। নিজস্ব দল ছাড়াও আইয়ুব পরিবার এই দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। তাঁর মৌলিক গণতন্ত্র সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দকে সুযোগ করে দেয় তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতি করার জন্যে। 'আইওয়াশ' হিসেবে এই সামরিক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। তবে আইয়ুব শাসনের এই দুর্নীতিমূলক চরিত্র জনগণকে প্রতারিত করতে পারেনি। বরং তার প্রতি ঘৃণা ও বিক্ষোভকেই জাগ্রত করেছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চালে বদ ও অসৎ মাতাব্বর বিডি মেম্বারদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযানে তার ঐ ঘৃনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। এই ঘৃণা ও বিক্ষোভ এতটাই তীব্র ছিল যে, অনেক স্থানে গণআদালত গঠন করে প্রাকাশ্যে জবাব দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দুর্নীতি থেকে মুক্তি এবং সৎ, পরিশ্রমী ও বিবেকবান আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা। নয়মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন করা একটি দেশের কাছে জনগণের এই দাবী খুব একটা অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের আমলে বাংলাদেশের অবস্থানদৃষ্টে মনে হয় এ দেশের জনগণের আকাঙ্খা অনেকটাই ইউটোপীয়।

স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধ বিপর্যস্ত বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের জন্যে অনেক সাহায্য আসে। এই সাহায্য অধিকাংশই লোপাট হতে শুরু করে। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রেই তারা তাদের ভোগের ভাগ নিশ্চিত করতে গিয়ে নতুন রাষ্ট্রটিকেই দুর্নীতির ঐ অতীতের পঙ্কে ঠেলে দেয়। যে বাঙ্গালী পাহারাহীন বাংলাদেশে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করার কথা ভাবেনি, তারাই এখন রিলিফের মাল চুরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রযুক্ত কারখানার প্রশাসক হয়ে শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, উৎপাদিত পণ্যকে লুটের মালে পরিণত করে। লাল বাহিনীর নামে ট্রেড ইউনিয়ন দখল, মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে অফিস আদালতে সিনিয়রিটি আদায়, নানা ধরনের পারমিট লাইসেন্স, বাড়ি দখল, গাড়ি দখল এবং বাংলাদেশের যাত্রালগ্নে এক ভয়ালদর্শন দুর্নীতির জন্ম দেয়।

অবস্থাটা এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে, স্বয়ং শেখ মুজিবকে এ নিয়ে খেদ করতে দেখা যায়- 'আমি ভিক্ষা করে নিয়ে আসি আর চাটার দল সব চেটে নেয়', 'আমি সাতকোটি মানুষের জন্য সাত কোটি কম্বল এনেছি, আমার কম্বলটা কই'। তাঁর এসব বিখ্যাত উক্তি সে সময়ে বাংলাদেশের এই দুর্নীতির চেহারাটাই তুলে ধরে। বঙ্গবন্ধু এজন্যে দায়ী করেন একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীকে।

পরবর্তী সরকার অর্থাৎ সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সময়ই মূলত দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছিল। তিনি নিজের শাসনকে পাকাপোক্ত এবং বৈধ করার জন্যে দুর্নীতির সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে সৎ প্রমাণিত করার চেষ্টায় সফল হন। এসময় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ সাহায্যের একটা বিরাট অংশ পকেটস্থ করে ফেলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এসময় থেকেই ঋণ-খেলাপী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। ১৯৮১ সালে প্রায় ৫০০ কোটি কালো টাকা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়া অর্থনীতিবিদদের এক সম্মেলনে বলেছিলেন, উন্নয়নের জন্যে সংরক্ষিত মোট সম্পদের চল্লিশ ভাগ বিনষ্ট হচ্ছে দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্যে। 'মানি ইজ নো প্রবলেম' - এর প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের মানি এসেছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার, ঋণখেলাপী ও বিদেশী সাহায্য থেকে। এয়ার ভাইস মার্শাল মাহবুব মন্তব্য করেছিলেন- 'জিয়া সবাইকে ও সবকিছুকে, সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে দুষিত করেছেন। জাতি অবমাননার ক্ষেত্রে শেখ মুজিব থেকে তার অবদান বেশি।

দুর্নীতির স্বর্ণযুগ ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের সময়। দুর্নীতি পূর্বে বা পরে আর কখনও এত উচ্চমাত্রা লাভ করেনি। পুরো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে কোনো দিকেই নীতি ছিলনা। সর্বত্রই দুর্নীতি। একটা বিশেষ গোষ্ঠী এরশাদ সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। শিল্পপতির চেয়ে মধ্যসত্ত্ব কোটিপতি বৃদ্ধি পেয়েছে এই সময়। বেসরকারিকরণের নামে কোটি কোটি টাকার সরকারি শিল্পকারখানা নামমাত্র মূল্যে দিয়ে দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের, চামচাদের। ব্যবসা, টেন্ডারের সুযোগ-সুবিধাও পেয়েছিল এরা। তবে এর থেকে একটা বিশেষ অংশ দিতে হতো রওশন এরশাদকে (তৎকালীন ফার্স্টলেডী)। এ কারণে যে তার খ্যাতি ছিল 'ম্যাডাম টেন পার্সেন্ট' হিসেবে।

১৯৮৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত শিল্পঋণ সংস্থার মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। এ টাকা আটকে ছিল ৩৮২ টি প্রকল্পে। আর সেই ৩৮২টির মধ্যে মাত্র ২২টি প্রকল্পেই ছিল প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। যার অর্থ হচ্ছে ২২ জন ব্যক্তি বা গ্রুপ শিল্পঋণের প্রায় অর্ধাংশ আত্মসাৎ করে

Dhaka University Institutional Repository

বসে আছে। ব্যক্তিগতভাবে এরশাদ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন যার অধিকাংশই তিনি বিদেশী ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছেন। ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবার পর তার বিরুদ্ধে ২২টি দুর্নীতির মামলা হয়েছিল। এরশাদ সময়েই ১৯৮৮ সালে দুর্নীতি দমন কাউন্সিলকে বাতিল করা হয় এবং এ ব্যুরোকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন করে দেয়া হয়।

গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটাবার উদ্দেশ্য ছিল সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। পরপর তিনটি গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনকাল আমরা অতিক্রান্ত করেছি। কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করা যায়নি। বরং ২০০১ সাল হতে ২০০৫ পর্যন্ত পর পর পাঁচবার বিশ্বের বুকে প্রতি বছরই দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

খালেদা জিয়ার সময়কালে (১৯৯১-১৯৯৫) বিমানের এয়ারবাস ক্রয়, সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, গ্যাস ক্ষেত্রের ইজারাদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বড় বড় চুরির ঘটনা ঘটেছে। জিয়ার রেখে যাওয়া ভাঙ্গা সুটকেস, ছেড়া গেঞ্জি থেকে কোকো লঞ্চ এবং ৫ বছরে ৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছিল খালেদা জিয়ার পরিবার। সবচেয়ে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, খাদ্য, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, পানি সম্পদ, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ডিভিশন, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি বিমান পরিবহন এবং নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ে।

খালেদা, হাসিনা সরকারের প্রত্যেকেই নির্বাচনের আগে এমপি মন্ত্রীদের সম্পদের হিসাবদান, ন্যায়পাল নিয়োগ, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করা এবং রেডিও-টিভির স্বায়ত্বশাসনের কথা ইশতেহারে প্রকাশ পেলেও বাস্তবে ক্ষমতার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত করার পরেও তারা এসব অঙ্গীকার পুরণ করেনি।

খালেদা জিয়া সরকারের (১৯৯১-১৯৯৫) আমলে ৬৩০০ টাকা স্কেলের এবং তার ওপরের যে কোনো সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে মামলা দায়ের ও চার্জ শীটের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। এছাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সংসদ সদস্য, পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং রাজনীতির অঙ্গণে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও চার্জশীট অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া হয় সরকার প্রধানের। ঐ ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার দুর্নীতি দমন বিভাগের স্বাভাবিক কর্মকান্ডকে ব্যহত করে।

হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময়তো বাংলাদেশ দুর্নীতির ক্ষেত্রে অন্যতম শীর্ষস্থান দখল করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জরিপে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশের দুর্নীতির ওপর প্রণীত রিপোর্ট সরকারকে বিব্রত অবস্থায় ফেলে দেয়। যার ফলে, তারা বিশ্বব্যাংককে অনুরোধ করেন রিপোর্টটি প্রকাশ না করতে এবং তারা এর জবাব দেয়ার জন্যে সময় চেয়ে নেন। কিন্তু পরবর্তীতে তথ্যটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে ইউএনডিপির একটি সেমিনারে।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ঘুষ, দুর্নীতিতে সবকিছু ছেয়ে গেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম, দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারীতা শেকড় গেড়ে বসেছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে আসামীদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে বিচার বিভাগকে দায়ী করাসহ বিভিন্ন মন্তব্য করেন। যেমন, 'ফুয়েল না হলে ফাইল নড়েনা' এবং 'ঘুষেও দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে' ইত্যাদি।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগ সরকার ব্যর্থ হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দায়ের করা ১৫১টি মামলা ঝুলে ছিল আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে। কারণ মামলায় অভিযুক্ত প্রায় অর্ধশত ব্যক্তি হচ্ছেন ভিআইপি। একটি দৈনিকের সংবাদ অনুযায়ী এদের মধ্যে রয়েছেন সংসদের ৩৪ সদস্যসহ কয়েক মন্ত্রী এবং বর্তমান ও সাবেক সচিব।

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সালের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশিত দুর্নীতির সংবাদের ওপর ভিত্তি করে। তৈরি করা দুর্নীতির তথ্য ভান্ডার রিপোর্টে একটি ছকে দেখানো হয়েছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কতটুকু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ থেকে দুর্নীতির লালনের বিষয়টি আন্দাজ করা যাবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

ব্যবস্থা গ্রহণের ধরন	সংখ্যা (মোট)
মামলা দায়ের	১৮২
তদন্ত	১২৩
কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ	৭৭
বরখাস্ত	৭৫
প্রতিবাদ	৭১
সাময়িক বরখাস্ত	৩৪
দায়ী	১৫
ক্লোজ	১২
বদলী	৯
স্ট্যান্ড রিলিজ	৮
চার্জশীট	৬
মোট	৬১২

এই সময়কালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ১৯৪৮টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ৬১২টি (৩১.৪%) ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো না কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনেরই ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতি

টিআই বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের দুর্নীতি তথ্য ভান্ডারের দ্বিতীয় রিপোর্ট দুর্নীতির সাথে জড়িত ৩৮টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ৮টি বেসরকারি খাতের রাজনৈতিক দল, এনজিও এবং বেসামরিক সেবামূলক সংস্থা। বাকী ৩০টি সরকারি খাত। টিআইএর রিপোর্টে যথারীতি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা দুর্নীতির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতির বড় বড় খাতগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষাখাত

শিক্ষাখাতে দুর্নীতির শুরুটা বেশ আগেই। শিক্ষার মহান ব্রত নিয়ে শিক্ষকরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি স্বজনপ্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়েন। জ্ঞানের আলোতে নিজেকে আলোকিত করতে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু অংশ নকলের আশ্রয় নেয়। আর শিক্ষা অফিসগুলোতো দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অভিযোগ আছে যে, বাংলাদেশের মোট ১ লাখ ৬৩ হাজার ২৪৭ জন প্রাইমারী স্কুলে কর্মরত শিক্ষকের মধ্যে ২০ হাজার শিক্ষক স্কুলে না গিয়েও মাসের পর মাস বেতন তুলছেন। থানা শিক্ষা অফিসের লোকজন ঘুষের বিনিময়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এছাড়া শিক্ষকরা অভিযোগ করেন যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করতে বাঁধা দেন কর্মচারীরা এবং তাদের কাছে টাকা দাবী করেন। আবার অধিদপ্তরে বহু শিক্ষকের ফাইল গোপন করা হয়। এভাবে ফাইল আটকে রেখে অসহায় শিক্ষকদের হয়রানি করা হয়। বাস্তবে অস্তিত্বমান স্কুলের শিক্ষকদের বেতন/ভাতা নিয়ে ঘাপলা হলেও ভূয়া স্কুল, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত ঘুষ দিয়ে টাকা পেয়ে যান নিয়মিত। আবার অনেক সময় ভুয়া স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় বিরোধীতা করলে সৎ অফিসারদেরও হয়রানি করে এর সাথে সংশ্লিষ্টরা। কারণ ওপর মহলে তাদের যোগাযোগ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলগুলোতে বিভিন্নভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয়। কোনো কোনো বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ডোনেশন দিতে হয়। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত শিশুর ১৫.৫% অভিভাবক বলেছেন এ জন্যে তাদেরকে টাকা দিতে হয়েছে এবং ৬৮% অভিভাবক বলেছেন বরাদ্দকৃত খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ৩৪ শতাংশ প্রধান শিক্ষক বলেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসে কাজের জন্যে মাঝে মাঝে ঘুষ দিতে হয় এবং ১৩ শতাংশ সবসময়ই ঘুষ দিতে বাধ্য হন।

শিক্ষাখাতে সাধারণত যে সব সেক্টরে দুর্নীতি হয় সেগুলো হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ফুড ফর এডুকেশন, শিক্ষাবোর্ড, কারিগরি শিক্ষা, শিক্ষা বিষয়ক সচিবালয়, মেডিকেল কলেজ ও প্রশাসন। এবং এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণত যে দুর্নীতি হয় তাহলো ক্ষমতার অপব্যবহার ঘুষ, আত্মসাৎ, ভীতি প্রদর্শন করে আদায়, প্রতারণা, প্রভাব বিস্তার, সম্পদের অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, দায়িত্বে অবহেলা। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি আর্থিক অনিয়ম হয়।

স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যকরী একমাত্র স্থানীয় সরকার হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই পরিষদের পরিচিতি আছে গম আত্মসাতের জায়গা হিসেবে। অধিকাংশ ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যেও এ ধারণা প্রচলিত যে, তারা নিয়মিত গমের ভাগ পাবেন। তাদের আগ্রহ VGF, VGD, GR কার্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্যে যে অংকের টাকা ও গম বরাদ্দ করা হয় তার অর্ধেকও কাজে লাগানো হয় না। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি অর্থ আত্মসাতের কারণে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে দেশের উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। এছাড়া গম বিতরণ বা অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জায়গা নির্ধারণের ক্ষেত্রে চলে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি। এছাড়া স্থানীয় সরকারের অন্যান্য অংশগুলো যেমন সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোতে জনপ্রতিনিধিরা তাদের ভোটের খরচ ওঠাতে সচেষ্ট থাকেন। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যেমন এলজিইডি, ওয়াসা এবং ডিপিএইচই এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তাগণ দুর্নীতি করেন বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। ২০০০ সালের শেষ ছয় মাসে ২১ টি দৈনিক স্থানীয় সরকারের দুর্নীতি বিষয়ে মোট ২১৯টি সংবাদ ছাপা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাত

স্বাস্থ্যখাত সেবামুলক হলেও বর্তমানে এর বাস্তব চিত্র ভয়াবহ। হাসপাতলে পরিদর্শন কালে দেখা যায় হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিম্নমানের খাবার, ঔষুধের অপ্রতুলতা, হাসপাতালের চিকিৎসার জন্য যথাযথ যন্ত্রপাতির অভাব, কম সংখ্যক ডাক্তার-কর্মচারী, সরকারি ডাক্তারদের প্রাইভেট ক্লিনিকে চাকরি। এক কথায় সরকারি হাসপাতাল থেকে কতজন মানুষ যে সুচিকিৎসা পান সেটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এ ধরনের অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের বহু রোগী পার্শ্ববর্তী দেশ কিংবা বিদেশে চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছেন। আরও ভয়াবহ চিত্র হচ্ছে অফিস চলাকালিন সময়ে ডাক্তারগণ চার্জ করে টাকা নিচ্ছে গ্রামের অসহায়, গরীব, দুঃস্থ, খেটে খাওয়া দিনমজুরদের কাছ থেকে। যদি টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে ডাক্তারগণ রোগী দেখে অযত্ন, অবহেলা আর দুর্ব্যবহার এর সাথে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দূর্দশার মূলে আছে দুর্নীতি। জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস এবং পরিবার কল্যানসহ স্বাস্থ্য খাত আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা বেশি ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি

বিচার বিভাগের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি বিধানের মাধ্যমে দেশে দুর্নীতি দূর করার কথা। সেখানে নিম্ন আদালতগুলোতে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। ডিসেম্বর ১৯৯৭ তে টিআইবি-র সারা বাংলাদেশ জুড়ে করা একটি জরিপে দেখা গেছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতা (৫২.৪%) বলেছেন যে, কোর্টের কাজ উদ্ধারের জন্যে তাদের কে ঘুষ দিতে হয়েছে। এদের মধ্যে ৫১.১ শতাংশ সরাসরি দিয়েছেন, বাকীরা অন্য ব্যক্তি কিংবা আইনজীবীর মাধ্যমে দিয়েছেন।

নিম্ন আদালতের পরিবেশ অনেকটা অস্বাস্থ্যকর। এখানে কিছু টাউট-বাটপারদেরও দেখা যায়, যারা গ্রামের সাধারণ মানুষদের হয়রানি করে। মোট কথা, যেখান থেকে বিচার পাবার কথা সেখানে প্রতারিত এবং অর্থ সর্বশান্ত হচ্ছেন অনেকে।

প্রশাসন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের অবস্থার বাস্তব উপলব্ধি করেছিলেন যে, ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না। প্রকৃতপক্ষে জন প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব প্রকট। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিকতা একটা স্থবির অবস্থানে রয়েছে। লাল ফিতার দৌরাত্ম একটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সচিবালয়ে ঢোকার আগেই পাস দেখাতে হয়, তবে তা সবার ক্ষেত্রে দরকার হয় না। যারা গার্ডকে কিছু টাকা-পয়সা দিতে পারেন তারা বিনা বাঁধায় পৌঁছে যান সচিবালয়ের দুর্গে। তারপর কাঙ্খিত কাজ পাওয়ার জন্যে তাকে হয়ত টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরতে হয়।

বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থার কারণে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় উপরিকাঠামোর মধ্যে। ফলে দুর্নীতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যক্রম, দক্ষতা ও যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্যে 'বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পদ্ধতি' ও দুর্নীতির অবকাশ রাখে। প্রশাসনের সব কর্মকর্তাদের auto promotion system থাকার কারণে এবং কার্যক্রমে দক্ষতার বিষয়টি না দেখার কারণেও অনেকে দুর্নীতিতে প্ররোচিত হন।

ভূমি প্রশাসনেও দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এখানে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের একটি বিশাল অংশ দুর্নীতির সাথে জড়িত। গ্রামের সাধারণ কৃষক, প্রান্তিক কৃষকরা তাদের কাছে অনেকটা জিম্মি। ড. কানিজ সিদ্দিকী তার একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, তার জরিপের ১৪৯৩ খানার মধ্যে ১২৪২টি খানা ভূমি অফিসে ঘুষ দেয়। মোট ৪টি অফিসে ঘুষ দিতে হয়। এগুলো হলো ভূমি জরিপ অফিস, ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং তফসিল অফিস। এই দুর্নীতির আর্থিক মূল্য নিম্নে একটি ছকে বর্ণনা করা হলো।

ভূমি অফিসে দুর্নীতির আর্থিক মূল্য

আয় গ্রুপ	ভূমি অফিসে যান এরকম খানা	দুর্নীতির আর্থিক মূল্য
> ১০০০	১৯৪	১৯৪,৬৭৬.৩২
< ৩০০০	১৭৩	৭৪২,৮৫৫.৫২
> ৩০০০	৩২৩	২৮১,৩১৩.৫৩
মোট	১৪৯৩	১,২১৮,৮৪৫.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি

বাংলাদেশে দুর্নীতির সূত্রপাত করেছেন কিছু অসৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং দুর্নীতির লালনও করছেন তারা। গত দুই সরকারের আমলে মন্ত্রী, এমপিদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি। জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনগুলো এত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে যে, এখানে এখন সত্যিকারের রাজনীতিবিদদের পরিবর্তে কালো টাকার মালিকরাই নির্বাচন করছে। আগে শিল্পপতিরা একটা Interest group হিসেবে কাজ করতেন। এখন তারা রাজনীতির খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। এ কারণেও নির্বাচনে অর্থ এবং অস্ত্রের ছড়াছড়ি হয়ে পড়ছে। এত টাকা খরচ করার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে নির্বাচিত হয়ে এ টাকাটা উঠিয়ে ফেলা এবং একই সাথে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য সঞ্চয় করা।

মূলত রাজনীতিবিদরা দুর্নীতি করছেন বলেই আমলা, পুলিশ, শিক্ষক সবাই দুর্নীতি করার সুযোগ পাচ্ছেন। বাংলাদেশের দুর্নীতির গ্রাস সর্বব্যাপী। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে দুর্নীতির বিকাশ এবং বিস্তার ঘটেনি। বিশ্বব্যাংক ১৯৯৬ সালে এ বিষয়ে একটি জরিপ করে দেখেছে বিভিন্ন সেক্টরে জনগণের কাছ থেকে অবৈধভাবে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নেয় যা সরকারি কোষাগারে জমা না হয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পকেটে যায়। সেক্টরগুলোর মধ্যে আছে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, ট্রেড লাইসেন্স ও কন্সট্রাকশন লাইসেন্স। এভাবে গড়ে বছরে দেশে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি মূল্যের সম্পদ চুরি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আছে অন্যান্য চুরি। যেমন চট্টগ্রাম বন্দরে শুল্ক ও কর বিভাগের লোকজনের মাধ্যমে বছরে অন্তত ৫০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার মূল্যের সম্পদ চুরি হয়। বছরে গড়ে এ বন্দর থেকে চুরি হয় ৫০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ। আই এম এফ এর একটি জরিপ মতে, ৭০০ জনের মধ্যে মাত্র ৫৬ শতাংশ কর পরিশোধ করেছেন এমন প্রমাণ আছে। ব্যাংক সেক্টরের উচ্চ দুর্নীতির কারণে মূলধন আমানত এবং সুষ্ঠু ঋণ প্রদান ব্যহত হয়ে চলেছে মারাত্মকভাবে। ৫০ শতাংশ ব্যাংক ঋণ সত্যিকারভাবে কাজে লাগছে না দুর্নীতির কারণে। ব্যাংকের উর্ধ্বতন মহলের অসততা জনিত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের কারণে ৫-১০ শতাংশ ঋণ দেয়া হয় অবৈধভাবে।

পুলিশের দুর্নীতি

পত্র-পত্রিকায় পুলিশ সম্পর্কিত তথ্য আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জরিপের ফলাফল দেখলে এটাই প্রমাণিত হয় পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ অংশ। টিআইবি তথ্য ভান্ডার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০০ সালের শেষ ৬ মাসে ২১ টি পত্রিকায় মোট ৩২০ টি দুর্নীতি রিপোর্ট ছাপা হয় আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীর (পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও ভিডিপি) ওপর। এরমধ্যে ২৮৫টি রিপোর্ট পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতি বিষয়ক। ২৮৫টি রিপোর্টের মধ্যে ৫০.৯ শতাংশ ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত, ১৭.৫ শতাংশ ঘুষ সংক্রান্ত, ১৫.৮ শতাংশ দায়িত্বে অবহেলা সংক্রান্ত। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রধান কারণ হচ্ছে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের কৌশল হিসেবে পুলিশ আইনের ৫৪ ধারার যথেচ্ছ ব্যবহার। পুলিশের উর্ধ্বস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত নানা পর্যায়ে অর্থের একটি নির্দিষ্ট লেনদেন হয়ে থাকে এবং প্রথমেই পুলিশকে অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংকের কোটা বেঁধে দেয়া হয়। এই কোটা পূরণের জন্যে অনেক সময় নিরীহ জনসাধারণকে ৫৪ ধরায় গ্রেফতার করে অর্থ আদায় করা হয়।

পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে অভিযোগ আছে তারা ঘুষ নেয়, নিরীহ জনগণকে ধরে অত্যাচার করে, থানায় গেলে মামলা নেয়া হয় না। তাছাড়া সন্ত্রাসী দুস্কৃতিকারী, চোরাকারবারী এবং মাদক পাচারকারীদের সাথে ঘনিষ্ট সংযোগ রক্ষা করে চলে।

কানিজ সিদ্দিকীর গবেষণায় ২৮১ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৮ শতাংশ পুলিশের কাছে গেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করতে। তার মধ্যে ৮৮ শতাংশকে ঘুষ দিতে হয়েছে বিভিন্ন সময়। পুলিশকে কেস ফাইল করার জন্যে গড়ে ৫৬৩.৩০ টাকা এবং কোর্টে না নিয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্যে গড়ে ৫৭৪০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে পুলিশকে। আর্থিক মূল্যের বিষয়টি একটি ছকের মাধ্যমে বর্ণণা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতির আর্থিক মূল্য

আয় গ্রুপ	পুলিশ প্রশাসন অফিসে গেছে এরকম থানা	দুর্নীতির আর্থিক মূল্য
> ১০০০	১৭	৩১,৮৪০.০৫
< ৩০০০	২০২	১২৭,৫৩৫.৭২
> ৩০০০	৬২	৩২৩,৪৮৪.৮৪
মোট	২৮১	৪৮১,৮৪৪.৬১

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। সাপ্তাহিক ২০০০ এর ৯৮ সালের একটি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীরা সারা ঢাকা শহরে ভারতীয় শাড়ি সাপ্লাই দেয়। তাই বঙ্গবাজার থেকেই প্রতিমাসে পুলিশকে দেয়া হয় দশ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা। তারপরও তারা মাঝে মাঝেই মার্কেট ঘেরাও করে বাড়তি টাকার জন্যে নিয়ে যায় ভারতীয় শাড়ি। মিরপুর এলাকার একজন গার্মেন্টস মালিক বলেন, এই এলাকার থানার একজন ওসি শুধু গার্মেন্টস খাত থেকেই আয় করে মাসে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা।

পুলিশ টাকা নেয় হকারদের কাছ থেকে। পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা দালালরা হকারদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে। গুলিস্তান, রমনা ভবন বঙ্গবন্ধু এ্যভিনিউ, বায়তুল মোকাররম প্রভৃতি এলাকার হকারদের কাছ থেকে প্রতি দোকান পিছু নেয়া হয় ৪০-৭০ টাকা।

প্রতি ট্রাকে ৫ টন মাল বহনের কথা থাকলেও এর থেকে বেশি বহন করা হয়। এ বিষয়ে ট্রাক মালিক সমিতির বক্তব্য, 'ঢাকা শহরের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ট্রাক পিছু পুলিশকে টাকা দিতে হয়। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই আমরা অতিরিক্ত মাল বহন করি।' বেবি ও অটোরিক্সা সমিতির বক্তব্য, 'সমস্ত বৈধ কাগজপত্র থাকলেও পুলিশ এটা নেই ওটা নেই বেল ড্রাইভারদের হয়রানি করে। এরচেয়ে কাগজপত্র না রেখে পুলিশকে টাকা দিয়ে চললেই সুবিধা হয়।"

ঢাকাসহ সারাদেশে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসাও চলে। পুলিশের আগোচরে অবশ্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাবশালী ক্যাডারের বক্তব্য, 'আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্রের কোনো হিসেব দিতে পারবেনা পুলিশ।'

পুলিশ বাহিনীর কোনো কোনো ক্ষেত্র থাকে যেটা ঘুষের জন্যে বিখ্যাত। এরকমই একটা জায়গা হচ্ছে ডিবি। ডিবি অফিসের ইন্সপেক্টর পর্যায় পর্যন্ত প্রায় সবারই ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি আছে। এসি, এডিসিরা সবাই কোটিপতি। বলা হয়ে থাকে এক বছর ডিসি ডিবি থাকলে তিনি কত টাকা আয় করেন সেটা তার নিজের পক্ষেই হিসেব রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অবৈধ অর্থের ডিপো ডিবি অফিসে আসতে হলে একজন কনস্টেবলকেও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। ইন্সপেক্টর এবং ওসিরা ১০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে ডিবি অফিসে পোস্টিং নেন।

পুলিশের অর্থ-সম্পদ ও গাড়ি-বাড়ির হিসেব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেক অফিসারদের সম্পত্তির হিসেব দিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছে অনেক। পুলিশ প্রশাসনের বেশ কিছু ব্যক্তির এরকম দুর্নীতির সংবাদ পড়ে আমরা সাধারণ মানুষেরা হতবাক হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

রুবেল হত্যা মামলার প্রধান আসামী একজন আলোচিত এসি'র ক্যান্টনমেন্ট থানার খিলক্ষেত এলাকায় এক বিঘা ও টঙ্গি থানার কাউনিয়ায় ৫০ বিঘা জমি আছে। টাঙ্গাইল শহরের ঢাকাইয়া পট্টিতে রয়েছে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন বিল্ডিং। মিরপুর ১০ নম্বরে ৫ তলা ফ্লাট বাড়ি। গুলশানে একটি ফ্লাট যার আর্থিক মূল্য ৫৬ লাখ টাকা। এছাড়া তার স্ত্রীর নামে এক কোটি ষাট লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করা ছিল টাঙ্গাইলের সিটি ব্যাংকের শাখায়।

অন্য একজন এসি, যিনি জালাল হত্যা মামলায় বেশ আলোচিত হয়েছিলেন তিনি মগবাজারের যে বাসায় থাকতেন তার ভাড়া এবং সার্ভিস চার্জ ছিল মোট ১৯ হাজার টাকা। পূর্ব রামপুরায় তার দেড় কোটি মূল্যের একটি বাড়ি আছে। দুই ছেলে পড়াশুনা করে সিঙ্গাপুরে। তাদেরকে পাঠাতে হয় প্রতিমাসে লক্ষাধিক টাকা। তিনি নিজে দুটো গাড়ির মালিক। যার একটির দাম ৪০ লক্ষ টাকা, অন্যটির ৫৬ লক্ষ টাকা।

ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকায় ফ্লাটগুলোর দাম বিশ থেকে আশি লাখ টাকা পর্যন্ত। এগুলোর বড় একটা অংশের মালিক পুলিশ কর্মকর্তারা। একাধিক গোয়েন্দা কর্মকর্তার কনকর্ড টাওয়ারে ফ্ল্যাট রয়েছে। লালমাটিয়ায় একজন পুলিশ কর্মকর্তার এগারো তলা বাড়ি রয়েছে। ইষ্টার্ন টাওয়ারে রয়েছে একাধিক পুলিশ কর্মকর্তার ফ্ল্যাট।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, পুলিশের লোকেরাই পকেটমার ও ছিনতাইকারী আমদানী করে, এই অভিযোগ উঠেছে এক সার্জেন্টের বিরুদ্ধে। বিসিএস পরীক্ষার 'Police Verification'র পুলিশের টাকা নেয়াটা তো এখন একটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে সাপ্তাহিক ২০০ লিখেছে স্বর্ণ চোরাচালানের পুরো বিষয়টির সঙ্গেই রয়েছে পুলিশের ঘনিষ্ট যোগাযোগ। কাস্টসম এবং পুলিশের সমন্বয়েই স্বর্ণের চালান প্রবেশ করে বাংলাদেশে। পরবর্তীতে এদের সহযোগিতায়ই স্বর্ণ সীমান্ত পার হয়ে চলে যায় ভারতে। এছাড়া বিভিন্ন সময় ধরা পড়ে যাওয়া হেরোইন, সাপের বিষ এবং ফেন্সিডিল গায়েব হয়ে যায় থানা থেকে। হেরোইনের পরিবর্তে ময়দা আর ইউরিয়ার মিশ্রণ দেখা যায় পরে।

থানাগুলোতে টাকা না দিলে মামলা ফাইল করা হয় না এবং অনেক সময় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেয়া হয় না। আবার সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করেও রাজনীতিবিদদের চাপে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ মানুষকে আসামী হিসাবে ধরে নিয়ে চরম শারীরিক নির্যাতনের পর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। রুবেল হত্যা মামলা এর সাক্ষ্য বহন করে। পুলিশ এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে মিথ্যে ঘটনা সাজিয়েছিল। একই ব্যাপার ঘটেছিল ইয়াসমীন এবং সীমা ধর্ষণ ও হত্যা পরবর্তী ঘটনায়।

প্রতি বছর এবং বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলে। কিন্তু এ কাজে তারা ১০ ভাগও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। অথচ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুমান করা হয়, দেশে এখন বিভিন্ন ধরনের অবৈধ অস্ত্রের সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই লাখের মতো। অন্যদিকে, বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। এর পেছনে কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে পুলিশের এসব অভিযানের খবর এক শ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তা এবং সোর্সদের মাধ্যমে আগেই চলে যায় সন্ত্রাসীদের কাছে। জানা গেছে এক শ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তা নিয়মিত মাসোহারা পায় মুখচেনা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ শিকদারের গ্রেফতারের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি তাদের রিপোর্টের মূল অংশে এরশাদ শিকদারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধাগ্রহণকারী বিভিন্ন পেশার ৩৫ জনের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে। এই ৩৫ জনের মধ্যে এডিশনাল আইজি থেকে ইন্সপেক্টর লেভেল পর্যন্ত ১৯ জন পুলিশ কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া নিম্নপদস্থ কিছু সদস্যের নাম মূল তদন্ত রিপোর্টের বাইরে উল্লেখ করা হয়েছে।

"২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশের ছয়জন কোটিপতি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন বিষয়ে তদন্ত করার অনুমোদন হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২০ হাজারেরও বেশি পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে কনস্টেবল পর্যন্ত রয়েছেন। তবে বেশির ভাগ শাস্তি পেয়েছে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে বিরাট অংশকে চাকরি থেকে হয় বরখাস্ত নয় অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও পুলিশের দুর্নীতি কমেনি।" [৯]

বর্তমানে পুলিশের কতিপয় সদস্যের সর্বগ্রাসী মনোভাব দেখে ভগবত গীতার এই শ্লোকটির কথা উল্লেখ করা যায়-

"This today I have gaind. This desire I shall obtain. This wealth is mine. That also will be mind in future. This enemy has been shain. Other also I shall slay. I am rich and well born. Who else is equal to me? I will sacrifice, I will give, I will rejoice. Thus deluded by ignorance, bewildered by many fancies, entagled by the meshes of delusion, addicted to the gratification of lust, they fall down into a foul hell." [১০]

"প্রাচীনকালে এ উপমহাদেশে আইন রক্ষাকারী সংস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। বাল্মিকী তার রামায়নে পাহারা দেয়া, নিরাপত্তা রক্ষা এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা বৃত্তি ইত্যাদির জন্যে একটা জনসংগঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। Dharmasutra (৫০০-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) তেও চোরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রাম এবং শহরে শুদ্ধ এবং সত্যবাদী (Pure and truthful) কিছু লোক নিয়োগের পরামর্শ দান করা হয়। ৩০০-২০০ খ্রীষ্টপূর্বে মৌর্য যুগের যে জটিল প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয় তাতে আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে এদের কার্যক্রম সংগঠন সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শাসনামলে কোতোয়াল নিযুক্ত করা হতো। মূলত উপমহাদেশে পুলিশ বাহিনীর উৎপত্তি বৃটিশ শাসনামল থেকে। লর্ড কর্নওয়ালিশের সময়ে (১৭৮৬-৯৩) প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশ বাহিনী আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্টের মাধ্যমে। এ এ্যাক্টের সরমর্ম ছিল এরকম যে, পুলিশ বাহিনী সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং তাদের সর্বোতভাবে সহায়তা করবে। এই বৃটিশ পুলিশ বাহিনীর ত্রাসে কাঁপত তখন সাধারণ শানুষেরা। জুজুবুড়ির পরিবর্তে পুলিশের ভয় দেখানো যথেষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রচলিত দন্ডনীতিতে পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন এরকম,

'ছেলেবেলার পুলিশকে একটা প্রকান্ড বিভীষিকা বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন স্বাভাবিক মানব জীবনের সঙ্গে দৈত্যদানব-ভূতপ্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই, এ যেন সেই রকম।'

বর্তমানেও পুলিশ সম্পর্কে একই ধরনের বিভীষিকা রয়েছে। প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে 'বাঘে ছু'লে আঠারো ঘা আর পুলিশ ছু'লে ছত্রিশ ঘা।' পুলিশের ওপর সাধারণ এবং ভুক্তভোগী মানুষ আস্তাহীন। এ ধরনের একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে দুর্নীতির কারণেই। তবে দুর্নীতির শুরু আজকে নয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় দুর্নীতির অস্তিত্ব প্রাচীন কালেই দেখা গেছে। পুলিশ বিভাগে বিশেষ করে স্টেশন হাউস অফিসারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিল ইন্ডিয়ান পুলিশ কমিশনও (১৯০২-০৩)। তাদের একটি রিপোর্টে এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে,

Dhaka University Institutional Repository

The forms of this corruption are very numerous. It menifests itself in every stage of the work of the police Station. The police officer may buy a fee or receive a present for every duty he performs. The complainant has often to pay a fee for having his complaint recorded. He has to give the investigating officer a present to secure his prompt and earnest attention to the cause. More money is extorted as the investigation proceeds." [১১]

রিপোর্টটি এখানেই শেষ নয়। এখানে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে পুলিশের দুর্নীতির। ইংরেজ শাসনের পরেও পাকিস্তান আমলেও পুলিশের এই একই রূপ আমরা দেখেছি। পরিবর্তনটা হয়েছে শুধু বাহ্যিক। হাফপ্যান্ট আর তিনহাত লম্বা লাঠির পরিবর্তে ফুলপ্যান্ট আর কাঁধে আট কেজি ওজনের ৩০৩ রাইফেল। বাংলাদেশের পুলিশও এই উত্তরাধিকার বহন করে চলছে।

পরিশেষে বলা যায় মিশরীয় রাজা এমাসিস তার রাজ্যে দুর্নীতি দূর করার একটি প্রশংসনীয় প্রথা প্রবর্তন করেন। এই প্রথাটি, সোলোন ধার করে নিয়ে এসে এথেন্সে চালু করেন। প্রথাটি এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বছরে একবার করে নোমার্ক অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্ণরের সম্মুখে তার জীবিকার উৎস ঘোষণা করতে হবে; কেউ তা না পারলে কিংবা উৎসটি যে সৎ একথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। বর্তমানে এই পদ্ধতি চালু করা না গেলেও দুর্নীতিবাজদের শাস্তির বিধান দুর্নীতিকে অনেকখানি কমিয়ে দিতে পারে। রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্টদের জীবিকার উৎসটি সৎ হয় তাহলে হয়ত দুর্নীতি অনেকখানি কমে যাবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিছু অসৎ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণেই দুর্নীতির মূল উৎপাটন করা একটি দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকট নিরসনের জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো বিকল্প নেই। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার একটি অনিবার্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেবলমাত্র জনকল্যাণে নিয়োজিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ-ই পারে এ সংস্কারের কাজটিকে সম্পন্ন করতে।

"অর্থনীতিবিদ Gunnar Myrdal তাঁর Asian Drama-য় লিখেছেন "when considering the prospects of reform in countries where corruption is so embedded in institutional and attitudinal remnants of traditional society and where almost everything that happens increases incentives and opportunities for personal gain, the public outcry against corruption must be regarded as a constructive force." [১২]

বলা বাহুল্য, জনস্বার্থে গঠনমূলক সংস্কারের জন্য চাই একটি সচেতন জনগোষ্ঠী। সেই মাত্রা নিরুপণ করে বলা যায়, এদেশে এখন জনগণের মধ্যে সচেতনতা এসেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই সৎ। কেবল উপরি কাঠামোর দুর্নীতির কারণে আজকে আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিসংখ্যানে পর পর পাঁচবার বাংলাদেশ সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত। এই অবস্থার অবসান চান সবাই। তাই উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের কাছে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা, "দুর্নীতির স্বরূপ ও পুলিশ প্রশাসন"। প্রকাশকাল ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১। প্রকাশক, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, পৃষ্ঠা-৬-৭

২. জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা, "দুর্নীতির স্বরূপ ও পুলিশ প্রশাসন"। প্রকাশকাল ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১। প্রকাশক, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, পৃষ্ঠা-৭

৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ এপ্রিল, ২০০০

৪. দৈনিক মুক্ত কণ্ঠ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০০

৫. Samsul P. Huntington, Political order in changing society. Yale University, 1968

৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ এপ্রিল ২০০০

৭. দুর্নীতির তথ্য ভান্ডার রিপোর্ট, জুলাই -ডিসেম্বর, ২০০০, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা। এপ্রিল, ২০০১।

৮. দুর্নীতির তথ্য ভান্ডার রিপোর্ট, জুলাই -ডিসেম্বর, ২০০০, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা। এপ্রিল, ২০০১।

৯. রাশেদ খান মেনন, দুর্নীতি ও বাংলাদেশ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

১০. রাশেদ খান মেনন, দুর্নীতি ও বাংলাদেশ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

১১. শংকর কুমার দে, পুলিশের আরও ছয় ক্রোড়পতি, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

১২. জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা, "দুর্নীতির স্বরূপ ও পুলিশ প্রশাসন"। প্রকাশকাল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১। প্রকাশক, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, পৃষ্ঠা-২৭

এছাড়াও সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. দুর্নীতির তথ্য ভান্ডার রিপোর্ট, জুলাই -ডিসেম্বর, ২০০০, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা। এপ্রিল, ২০০১।

২. রাশেদ খান মেনন, দুর্নীতি ও বাংলাদেশ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

৩. শংকর কুমার দে, পুলিশের আরও ছয় ক্রোড়পতি, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

৪. জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা, "দুর্নীতির স্বরূপ ও পুলিশ প্রশাসন"। প্রকাশকাল ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১। প্রকাশক, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৪

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংবাদ পত্রে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা

সন্ত্রাসী কর্মাকান্ড হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বত্র। সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন রাজনৈতিক কর্মী, সাধারণ নাগরিক, সমাজের অসহায় ও দরিদ্র পুরুষ ও বিশেষভাবে নারীরা। নারীরা বিভিন্ন ভাবে নিগৃহীত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে। আবার ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিতও হচ্ছে। নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও নির্যাতন প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন। কখনও এর কারণ যৌতুকদানে অভিভাবকের অপারগতা, আবার কখনও বা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি অর্থ দিয়ে বশীভূত করছে একটি নারীকে বা তার অভিভাবকদের। তারপর তথাকথিত একটা বিয়ের ফাঁদে ফেলে মেয়েটিকে নির্যাতন করছে দৈহিক ও মানসিকভাবে। আবার দেখা যায়, অসহায় একটি মেয়ের শরীর জোর করে বা ফুসলিয়ে দখল করছে সমাজের পেশীশক্তি সম্পন্ন বিত্তশালী ব্যক্তি।

সন্ত্রাসের উপর গবেষনা করার লক্ষ্যে ৬টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, প্রথম আলো, মুক্তকণ্ঠ, সংবাদ ও দি ইনডিপেনডেন্ট) প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বিগত পাঁচ বছরের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ৫টি বিষয়ের উপর একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১. হত্যা

২. ধর্ষণ

৩. এসিড নিক্ষেপ

৪. ডাকাতি

৫. ছিনতাই

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২ এবং ২০০৩ ইং সালে প্রকাশিত এসব তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের এক ভয়াবহ রূপ লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সন্ত্রাসীরাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন নৈরাজ্যের সীমা থাকবেনা, থাকবেনা মানবিকতার ভিত্তি। এজন্য সন্ত্রাসকে সমাজ থেকে দূর করতে সর্বাত্নক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় সন্ত্রাস পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলবে।

১. সংবাদ পত্রে হত্যার ভয়াবহ চিত্র

পত্রিকার পাতা উল্টালেই আমাদের চোখে পড়বে এক বা একাধিক খবর। হয়তো নৃশংসভাবে হত্যার শিকার হয়েছে এমন কোনো মানুষের বিকৃত মুখচ্ছবি বা দেহ। এমন কোনো দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না যেদিন পত্রিকার পাতায় অন্ততঃ একটি খুনের খবর ছাপা হয়নি। প্রতিনিয়ত আমাদের দেশে ঘটছে হত্যাকান্ড। এলাকাভেদে এসব হত্যাকান্ড যেমন ঘটছে দেশের প্রত্যন্ত কোনো গ্রাম বা গঞ্জে আবার ঘটছে ছোট শহর থেকে রাজধানী শহর ঢাকাতেও। প্রতিদিনের পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র বলে দেয় আমাদের দেশে সন্ত্রাসের ভায়াবহতা ক্রমেই আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে ফিরে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ১৯৯৯ সালে সন্ত্রাসী হত্যার চিত্র

বিবরণ	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
হত্যা	১১৬	৫৭	৪৯	১৪৪	৯৫	১৬১	২০৯	২৩৯	১৭৮	১৯৭	১৮৩	১৬১	১৭৮৯

জানুয়ারিঃ

হত্যাকান্ডের মোট শিকার ১১৬ জন। এ মাসে চুয়াডাঙ্গায় মোট ২১ জনকে হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসী বাহিনীর নেতা সাথী খুন হয়। চরমপন্থীরা পিতা ও পুত্রকে এবং স্বামী স্ত্রীকে জবাই করে হত্যা করে। ঝিনাইদাহে যুবলীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। যশোরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে বিদ্যালয় শিক্ষক খুন হয় এবং অন্য আরেক ব্যক্তিকে জবাই করে হত্যা করা হয়। কুষ্টিয়ায় টিএনও অফিসের সামনে ইউপি চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চুয়াডাঙ্গার এক এউপি সদস্যসহ তিনজনকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। চট্রগ্রামে গৃহে প্রবেশ করে ব্রাশফায়ারে খুন করা হয় ঘুমন্ত দুই যুবককে। সীতাকুন্ডু ও বোয়ালখালীতে শিশুসহ দুইজন খুন হয়। পাঁচবিবিতে যৌতুকের দাবীতে স্বামী খুন করেছে স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে।

ফেব্রুয়ারিঃ

পত্রিকায় আসা খবর মতে ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে ৫৭ জন খুন হয়েছে। হত্যা মামলা হয়েছে ২৯টি। এ মাসে কুষ্টিয়ায় এক জনসভায় জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদসহ পাঁচজনের খুন হওয়ার ঘটনা সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ মাসে তিনদিনের হরতালে নিহত হয় ছয় জন। সাভারে ডাকাতের হাতে নিহত হয়েছে তিনজন। মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়াতে মা মেরে ফেলে ৩ মাসের শিশু কন্যাকে। সিলেটে ২১ দিনের শিশুকে গলাটিপে হত্যা করে সৎমা। জয়পুরহাটে একব্যক্তি স্ত্রীকে জবাই করে ও শিশু কন্যাকে গলাটিপে হত্যা করে।

মার্চঃ

মার্চ'৯৯-এ দেশে ৪৮ টি ঘটনায় ৪৯ জন হত্যার শিকার হয়েছে। পত্রিকায় তাৎক্ষণিকভাবে ১৮টি হত্যাকান্ডের মামলা দায়ের করার খবর এসেছে। এ মাসে সবচেয়ে বেশি ১৬ টি হত্যাকান্ড ঘটেছে ঢাকাতে। ঢাকায় ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কে ডিবি-র ইনফরমার শফির লাশ পাওয়া যায়, যেটা সারাদেশে পুলিশ প্রশাসনে তুমুল তোলপাড় সৃষ্টি করে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কলেজছাত্র। চাঁদাবাজের হাতে নিহত হয় তিনজন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চরমপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছে পাঁচজন।

এপ্রিলঃ

এপ্রিল'৯৯-এ ১৪৪ জন হত্যার শিকার হয় ১২৪টি ঘটনায়। মামলা হয়েছে ১৫টির। এ মাসে চট্রগ্রাম, ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় সবচেয়ে বেশী হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গায় এক ঘটনায় চরমপন্থীদের হাতে সাতজন খুন হয়। কুষ্টিয়ায় চরমপন্থীদের হাতে তিনজনের মৃত্যু ঘটে। চট্রগ্রামে সন্ত্রাসীদের গুলিতে জামায়াত নেতা জয়নাল আবেদীন নিহত হন। কাঠুরিয়া দম্পতিকে হত্যা, অন্য আরেক ঘটনায় ডাকাতের হাতে গৃহকর্তা খুন, রাজধানীর এক হোটেলকক্ষে তরুণী খুন হয়। সেনানিবাসে কর্নেলপুত্র মামুনুর রহমান সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। গোপীবাগের টপটেরর খোকন খুন হয় এ মাসেই। মতিঝিলে খুন হয় যুবলীগ নেতা কামাল হোসেন পাটোয়ারী।

মেঃ

১৯৯৯ সালের মে মাসে বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী হত্যাকান্ড ঘটেছে ৯৫টি। এসব ঘটনার মধ্যে ৫০টির মামলা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে দেখা যায় গ্রেফতার হয়েছে মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচজন। কুমিল্লায় হোমনা থানার এক পাগল দু'শিশুকে জবাই করে হত্যা করে এবং পরবর্তীতে গ্রামবাসীদের গণপিটুনীতে পাগল মারা যায়। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানা এলাকায় চোরাই পণ্যের ভাগ-বাটোয়ারা এবং জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে পৃথক দুটি ঘটনায় খুন হয়েছে দুজন। চাচাতো বোনকে উত্যক্ত ও সম্ভ্রমহানীর চেষ্টার প্রতিবাদে সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে ভাই।

জুনঃ

জুন'৯৯-এ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে ১৬১ জন। এসব খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৭৭টি এবং আসামী গ্রেফতার হয়েছে ১৬জন। ঢাকা জজকোর্ট প্রাঙ্গণে মামলার হাজিরা দিতে এসে খুন হয়েছে আজাদ। চট্টগ্রামের রাউজানে ওয়ার্ড কমিশনারকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। লক্ষীপুরের চন্দ্রগঞ্জে যুবলীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পাবনায় ঠিকাদারকে কুপিয়ে এবং কুলাউড়ায় ব্যাংক কর্মকর্তাকে জবাই করে হত্যা করা হয়। নাটোরে দুলাভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে শ্যালিকা। রাজশাহীতে ধর্ষণের পর জবাই করে হত্যা করা হয় এক তরুণীকে।

জুলাইঃ

জুলাই মাসে দুই শতাধিক ঘটনায় মোট ২০৯ জন হত্যার শিকার হয়েছে। মোট ৬০টি ঘটনার মামলার খবর তাৎক্ষণিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এসব ঘটনায় মোট ১৭ জন অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশি হত্যাকান্ড ঘটেছে রাজধানী ঢাকা, ফেনী, যশোর ও চট্টগ্রামে। টানবাজারের যৌনকর্মী জেসমিন এবং গুলিস্তানে বোমার আঘাতে পুলিশ কনেস্টেবল ফরহাদের হত্যাকান্ড। হরতালে পিকেটারদের ইটের আঘাতে ঢাকায় মারা যায় এক বৃদ্ধ। ফেনীতে চাঁদাবাজদের গুলিতে স্কুলছাত্রী, যুবলীগ ২ কর্মীকে রগকেটে ও রিক্সাচালককে জবাই করে হত্যা করা হয়। নোয়াখালীতে যৌন নির্যাতনের পর দেবর খুন করে ভাবীকে ও অপর ঘটনায় যুবলীগ নেতা খুন হয়।

আগষ্টঃ

সারাদেশে মোট ২৩১টি ঘটনায় ২৩৯ জনকে হত্যা করা হয় আগষ্ট মাসে। তাৎক্ষণিকভাবে ১২৫টি ঘটনার মামলা হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ৩৫টি ঘটনার ৬২ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বিএনপি নেতা মোঃ শাহজাহান খুন হয়। বায়তুল মোকাররমের সামনে দুইজন এবং জুরাইনে একজন ছিনতাইকারী গণপিটুনিতে নিহত হয়। চট্টগ্রামে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনীতে নিহত হয় তিন যুবক। খুলনার রূপসা থানাধীন এক ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হোসেন হাওলাদারকে খুন করে দুর্বৃত্তরা।

সেপ্টেম্বরঃ

মোট ১৬৭টি ঘটনায় ১৭৮ জন হত্যার শিকার হয় সারাদেশে সেপ্টেম্বর মাসে। তাৎক্ষণিকভাবে মাত্র ৭৫টি ঘটনার মামলা হওয়ার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। নারায়নগঞ্জে ছিনতাইকারীর গুলিতে ব্যবসায়ী নিহত হয়। মংলার চিলা ইউনিয়নের সদস্য আবু বকরের খুন হয়। নীলফামারীতে স্বামী খুন হয় স্ত্রী হাতে। দিনাজপুরে মা ৮ বছরের ছেলেকে বটি দিয়ে খুন করে।

অক্টোবরঃ

মোট ১৮৩টি ঘটনায় ১৯৭ জন হত্যার শিকার হয়েছে সারাদেশে অক্টোবর মাসে। মোট ৮৯টি ঘটনার মামলা হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ২৩টি ঘটনায় ৪৭জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জুয়া খেলায় বাঁধা দেয়ায় স্বামী শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে স্ত্রীকে নেত্রকোনায়। ঢাকার আওয়ামীলীগ নেতা শামসুল হক সেলিম খুন হয় সন্ত্রাসীদের হাতে। নারায়নগঞ্জে যৌতুকের কারণে রিপন হত্যা করে স্ত্রী মাম্মীকে। মতিঝিল এলাকায় ছিনতাইকারীরা পুলিশ সার্জেন্ট আহাদকে হত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বরঃ

সারাদেশে ১৬৭টি ঘটনায় ১৮৩ জন হত্যার শিকার হয়। ঘটনা সমূহের ৭৮ টির তাৎক্ষণিক মামলা হওয়ায় খবর পাওয়া যায়। উক্ত ঘটনাসমূহের মধ্যে ৩২টি ঘটনার সাথে জড়িত ৬১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। সিলেটে পুলিশের গুলিতে এক যুবক মারা যায়। বি-বাড়িয়ায় বাস ডাকাতিকালে এবং গণপিটুনিতে ২ ডাকাতের মৃত্যু ঘটে। রাজধানীতে পেট্রোল বোমায় ট্রাক চালকের মৃত্যু ঘটে। তিনি দিনের হরতালের ১ম দিনে মহানগরীতে গৃহবধু রিনা বেগম ও এক বিএনপি নেতা মারা যায়। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জের ধরে আজিমপুরের একই পরিবারের মা,মেয়ে ও ছেলে খুন হয়। ঢাকায় ছিনতাইকারীদের হাতে খুন হয় ডাক্তার মোশারফ হোসেন।

ডিসেম্বরঃ

ডিসেম্বর মাসে সারাদেশে মোট ১৪৭টি ঘটনায় ১৬১ ব্যক্তি হত্যার শিকার হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত এসব ঘটনার ৬০টির তাৎক্ষণিক মামলা হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ১৮টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ৩৯ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। চট্রগ্রামে ছিনতাইকারীদের হাতে দুই ব্যবসায়ী খুন হয়। নগরীতে চাঁদা না দেয়ায় ভিডিও ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেনকে গুলি করে খুন করে চাঁদাবাজরা। ফরিদপুরে নৈশ প্রহরীকে খুন করে বিপুল পরিমাণে ঔষধ লুট হয়। ফেনীতে ১২ ঘন্টার মধ্যে পৌর কমিশনারসহ ৫ জন খুন হয়।

এক নজরে ২০০০ সালের সন্ত্রাসী হত্যার ভয়াবহ চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
হত্যা	২২৬	১৮২	১৯৩	১৮৩	১২৪	১৪২	১৫৪	১৩৩	২২৯	২৯০	১৯৫	২০০	২২৫১

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে হত্যার ঘটনা ঘটেছে ২০১টি এবং এর শিকার হয়েছেন ২২৬ জন। হত্যার ঘটনায় মামলার খবর পাওয়া গিয়েছে ৮৭টি এবং এবং গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ৫২ জন। ১ জানুয়ারি মঙ্গলবার ভোরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) নিকুঞ্জ বিহারী নাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুন হন। ঝিনাইদহে ও কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি ঘটনায় দু জনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে দুটি গাড়ী ছিনতাই করার ঘটনা ঘটেছে। মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার চকবস্তা গ্রামে গণপিটুনিতে একজন ডাকাত নিহত হয়। শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলনের নেতা এবং চরমপন্থী আত্মসমর্পন প্রক্রিয়ার প্রধান সমন্বয়কারী মীর ইলিয়াস হোসেন দিলীপসহ দুই ব্যক্তি ঝিনাইদহ শহরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

ফেব্রুয়ারিঃ

ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫৭টি ঘটনায় ১৮২ জন ব্যক্তি হত্যার শিকার হয়েছে। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে ৬২টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৩০ জন। ফেনীতে সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে বাবুলকে। ঢাকার বিএনপি বস্তিতে পুলিশের গুলিতে এক রিক্সাচালক নিহত হয় এবং সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা যায় এক ঘুমন্ত শিশু। নোয়াখালীতে ইউপি নির্বাচনী জনসভায় প্রতিপক্ষের গুলিতে ২ জন নিহত হয়। আজিমপুর কলোনী ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে ঢুকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করে ঢাকা কলেজের ছাত্রকে এবং গৃহপরিচালিকাকে। চট্রগ্রামে ছাত্রলীগের ক্যাডার পুলককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঈশ্বরদীতে মসজিদের ভেতর মুয়াজ্জিনকে এবং ঢাকার উত্তরায় আর্মড পুলিশের হাবিলদার দেলোয়ারকে হত্যা করা হয়। পীরগাছায় এক বৃদ্ধ দম্পতিকে হাত-পা বেঁধে হত্যা করে সন্ত্রাসীচক্র।

Dhaka University Institutional Repository

মার্চঃ

সারাদেশে ১৭১টি ঘটনায় ১৯৩ জনকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে। ১১৮টি ঘটনায় তাৎক্ষণিক মামলার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ৪৬টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৯৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। বাউফল থানায় দায়ের কোপে খুন হয় বছির মিয়া। শিবগঞ্জ থানায় কন্যা হয়ে জন্ম নেয়ায় সদ্যজাত শিশুকে খুন করে পিতা। মতিঝিলে ট্রাফিক পুলিশকে জবাই করে হত্যা করা হয়। ঢাকা কলেজের বহিস্কৃত ছাত্রলীগ নেতা কামরুজ্জামান সুজন নিহত হয়। পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে এক কিশোরীকে এবং উত্তরায় এক যুবককে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। নেত্রকোনায় পাষন্ড স্বামীর হাতে নিহত হয় সেলিনা বেগম।

এপ্রিলঃ

সারাদেশে ১৭৩টি ঘটনায় ১৮৩ জন হত্যার শিকার হয়। ৮১টি ঘটনার মামলার খবর পাওয়া যায় এবং ১১টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ২৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ৪ এপ্রিল পশ্চিম মনিপুরে মায়ের অসামাজিক কার্যাকলাপ দেখে ফেলার অপরাধে হত্যা করা হয় দুই সহোদরকে। রাজধানীর উত্তরায় ট্যাক্সিক্যাব চালক সমিতির নেতা ফারুককে খুন করা হয়। চট্রগ্রামে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়কালে কুখ্যাত সন্ত্রাসী মানিক নিহত হয় ৩ এপ্রিল রাতে। খাগড়াছড়িতে পরকিয়া প্রেমের জের ধরে আশেক কুমার চাকমার স্ত্রী রেশমা চাকমা ও তার মেয়ে মিনাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

মেঃ

সারাদেশে ১২১টি ঘটনায় ১২৪ জন হত্যার শিকার হয় এ মাসে। ৫৬টি ঘটনার মামলা হয় এবং ১২টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ১৮ জন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়। রাজশাহীতে চোরা চালানিরা তাদের এক সহযোগীকে ধারালো অস্ত্রদিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। চাপাইনবাবগঞ্জে এক পাষন্ড স্বামী তার স্ত্রী রওশন আরা (২৫) কে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

জুনঃ

১৩১ টি ঘটনায় ১৪২ জন হত্যার শিকার হয়। ৮১টি ঘটনার মামলার খবর পাওয়া যায় এবং ২৫টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৩৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মাত্র ছ'শ টাকা চুরির জন্যে কিশোর কাজের ছেলে রশীদ (১৩) কে পিটিয়ে হত্যা করেছে দুই স্কুলছাত্র শাওন ও জনি। সাতক্ষীরায় ছোট্ট শিশু অর্নব (৯) কে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে গ্রামের বাঁশ বাগানে ফেলে রাখে সন্ত্রাসীরা। পাবনায় পৃথক দু'টি ঘটনায় দু'জন গৃহবধু স্বামীর হাতে প্রাণ হারায়। নাটোরে সন্ত্রাসীদের হাতে বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা (৩৮) খুন হয়। পাবনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীদের লাথিতে মৃত্যু হয় মুক্তিযোদ্ধা রতন দাসের।

জুলাইঃ

১৫৪ জন হত্যার শিকার হয় মোট ১৪১টি ঘটনায়। ৭৮টি ঘটনায় মামলা দায়েরের খবর পাওয়া যায় এবং ২১টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৩৭ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। রাজধানীর মাহুতটুলিতে সারা শরীরে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে রমজান নামের এক পুলিশকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। ফেনীতে পৃথক ঘটনায় দুই অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুকে খুন করে বাড়ির পাশের গাছে ঝুলিয়ে রাখে পাষন্ড স্বামী।

আগষ্টঃ

হত্যার ঘটনা ঘটেছে ১২৫টি এবং হত্যার শিকার হয়েছে ১৩৩ জন। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে ৬৬টি এবং এ মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৫০ জন। নগরীতে ৩ যুবককে একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এ মাসে। চট্রগ্রামের আগ্রাবাদ বেপারী পাড়ায় ফজু নামে একজন দারোয়ানকে মধ্যযুগীয় কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। ঢাকায় বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান মন্ডল ও বাগেরহাটে আওয়ামীলীগ নেতা কালীদাস বড়াল খুন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বরঃ

সেপ্টেম্বর মাসে সারাদেশে ২১৯টি হত্যা ঘটনায় ২২৯ জন হত্যার শিকার হয়। ২৫টি ঘটনায় ৫৬ জন গ্রেফতার হয়েছে এবং মামলা হয়েছে ৯০টি। এ মাসে অপহরণের পর দুই যুবককে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয়েছে।

অক্টোবরঃ

অক্টোবর মাসে সারাদেশে ২৭৮টি ঘটনায় ২৯০ জন হত্যার শিকার হয়েছে। মামলা হয়েছে ১৩০টি। ২৪টি ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে ৪৩ জন ঘাতক। সাভার পরিণত হয়েছে গুপ্ত হত্যার ভয়ঙ্কর জনপদে। রাজধানীতে খুন করে লাশ বস্তাবন্দী করে ফেলে দেয়া হচ্ছে সাভারে। এসব হত্যাকান্ডকে ধামাচাপা দিতে লাশ রাতের আঁধারে ফেলে রাখা হয় ঢাকা আরিচা সড়কের উপর। এ মাসে রাজধানীতে ২৪ ঘন্টায় ৬টি খুন হয়েছে।

নভেম্বরঃ

সারাদেশে ১৮৫টি হত্যার ঘটনায় ১৯৫ জন হত্যার শিকার হয়। এসব হত্যার ঘটনায় ৬৫টি মামলা হয় এবং ১৮টি ঘটনায় ৩৩ জন গ্রেফতার হয়। নৃশংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে দেহ-মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দেয়ার পালা শুরু হয়েছে রাজধানীতে। ১৪ ঘন্টার ব্যবধানে ৪ জন খুন হয়েছে। জবাই করে হত্যা সংঘটিত হয়েছে এমাসে খুব বেশি। বগুড়ায় প্রতিমাসে গড়ে ৮টি করে খুন হচ্ছে।

ডিসেম্বরঃ

১৯৪ টি হত্যাকান্ডে শিকার হয়েছে ২০০ জন। এসব খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৬৮টি এবং আসামী গ্রেফতার হয়েছে ৪৬ জন। ১২ ডিসেম্বর নগরীতে গুলি করে, ছুরি মেরে, জবাই করে ৩ জনকে হত্যা করে। পটুয়াখালী, বাগেরহাট ও মুন্সীগঞ্জে গৃহবধু খুন হয়। বাবা-মায়ের সামনে দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হয় চকরিয়া উপজেলার কাউসার জান্নাত (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্রী।

এক নজরে ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হত্যার চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
হত্যা	২৬৭	১৮৭	২২০	২৪৭	২৭৭	১০৯	৩৩২	৪১৮	২৫১	৩৯৪	২৯৪	৩০৩	৩৩৯৯

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে হত্যাকান্ড সংগঠিত হয় ২৪৬টি। এতে হত্যার শিকার হয় ২৬৭ জন। মামলা হয় ১০০টি হত্যাকান্ডের এবং গ্রেফতার হয় মাত্র ৩৩ জন। হত্যাকান্ড সংগঠনের সময় আহত হয় আরো ৭ জন। সাপ্তাহারে পূর্বশত্রুতার জের ধরে একই পরিবারের তিনজনকে জবাই করে হত্যা করা হয়। রাজধানীর বিসিসি রোডে তরুণ ব্যবসায়ী খুন হয় সন্ত্রাসীদের গুলিতে।

ফেব্রুয়ারিঃ

১৭২টি ঘটনায় ১৮৭ জন হত্যার শিকার হয়েছে। ৬০টি মামলা হয়েছে এবং ১১ জন গ্রেফতার হয়েছে। খুলনায় ডুমুরিয়ার চরমপন্থী গ্রুপের দুই সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

মার্চঃ

হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছে ২০৮টি এবং এতে শিকার হয়েছে ২২০ জন। হত্যা মামলা হয়েছে ৮৭টি এবং হত্যাকান্ডের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ৩৪ জন। এ সময় আহত হয়েছে ৫৬ জন। এমাসে ছিনতাইকারীদের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যায় গার্মেন্টস কর্মী ইকবাল হোসেন এবং ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিলঃ

এমাসে ২১৯টি হত্যাকান্ডের ঘটনায় শিকার হয় মোট ২৪৭ জন। এর মধ্যে ২৩৪ জন খুন হয়েছে এবং ১৩ জন হত্যাকান্ডের ঘটনায় আহত হয়েছে। এ ব্যাপারে ৮০টি মামলা হয় এবং ২৪টি ঘটনায় ৬২ জন গ্রেফতার হয়। সুনামগঞ্জে শিশুদের ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল কাদির (৩৫) নামে একজন নিহত হয়েছে।

মেঃ

২৭১টি হত্যাকান্ড ঘটে এবং এতে শিকার হয় ২৭৭ জন। এ ব্যাপারে ৯২টি মামলা হয় এবং ৫৬ জন গ্রেফতার হয়। সাভারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে। রাজধানী গুলশানে গুলি করে শ্রমিকলীগ নেতা লিয়াকত আলীকে (৩৫) হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। রাজধানীতে ২৪ ঘন্টায় ২ মহিলাসহ ৫ জন খুন হয়। নিহতরা হলো গার্মেন্টস কর্মী ময়না আক্তার মনিরা (১৫), আবদুস সামাদ (৩০), ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম (৫০), পথচারী ফাতেমা হক (৫০) এবং বাড্ডায় অজ্ঞাত যুবক (১৮)।

জুনঃ

হত্যার ঘটনা সংগঠিত হয় ১৭২টি এবং এর শিকার হয়েছে ৬ জন সন্ত্রাসীসহ মোট ২০৯ জন। এ ব্যাপারে ৬৪টি মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ৬১ জন। খুলনায় মহানগরীতে সন্ত্রাসীরা হাতকাটা হানিফ (৪০) নামের এক যুবককে খুন করেছে। এ মাসে সাভারে জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছে।

জুলাইঃ

সারা দেশে ৩২৩টি হত্যা ঘটনার শিকার হয়েছে ৩৩২ জন মানুষ। এ মাসে হত্যা মামলা হয়েছে ৯৯টি এবং আসামি গ্রেফতার হয়েছে ৪৩ জন। ২৭ জুলাই ৬ দুর্বৃত্ত বাবু ও অপু নামে দুই ভাইকে আইজি গেট থেকে কৌশলে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে একটি নৌকায় উঠিয়ে গোপন আস্তানায় নিয়ে গলায় রশি পেঁচিয়ে দুই সহোদরকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে।

আগস্টঃ

সারা দেশে হত্যার ঘটনা ঘটেছে ২৬১ টি এবং এর শিকার হয়েছে ৪১৮ জন মানুষ। এ মাসে মামলা হয়েছে ৭৯টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৫৭ জন আসামি। নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় পাষন্ড পুত্রের হাতে সত্তরোর্ধ মদন আলী নিহত হয়েছে। অসুস্থ মদন আলী ঘরের দরজার সামনে মল ত্যাগ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে পুত্র মোক্তার হোসেন (৩০) তাকে মারধর করে। ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

সেপ্টেম্বরঃ

দেশে ১৭৬টি হত্যা ঘটনার শিকার হয়েছে ২৫১ জন ব্যক্তি। হত্যা ঘটনায় এ মাসে মামলা হয়েছে ৪৪টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৬২ জন। রায়ের বাজারে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে এক কাঠমিস্ত্রীকে।

অক্টোবরঃ

২৫০ টি হত্যার ঘটনায় শিকার হয়েছে ৩৯৪ জন। মামলা হয়েছে ৭৪ টি এবং গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ৫৯ জন আসামিকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পটোকল অফিসার মিসেস আয়শা আফসারীকে তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী জহিরুল ইসলাম গুলি করে হত্যা করার পর নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

নভেম্বরঃ

২০৯ টি ঘটনায় মোট ২৯৪ জন হত্যার শিকার হয়েছে। ৮১ টি মামলার ঘটনায় মোট ৫২ জন গ্রেফতার হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। চাঁদা না দেয়ায় রাজধানীর পশ্চিম শেওড়া পাড়ায় দুর্বৃত্তরা দুই সহোদরকে জবাই করে হত্যা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বরঃ

এ মাসে ২১৬ টি হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে শিকার হয় ৩০৩ জন। এ ব্যাপারে ৮১টি মামলা হয় এবং ৮৪ জন গ্রেফতার হয়। কুলাউড়া উপজেলার শরীফপুর সীমান্তে গত ২ ডিসেম্বর মনোহর আলী নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। রাজধানীতে ৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাতে ২ জন খুন হয়েছে। রাজধানীর মহাখালী নিউ ডিওএউচএস এলাকায় ৬ ডিসেম্বর সন্ত্রাসীদের গুলিতে এবিএম গোলাম মোস্তফা মাসুদ (৩৩) নামে জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্র খুন হয়েছে।

এক নজরে ২০০২ সালে সন্ত্রাসী হত্যার চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
হত্যা	২০২	২৪৩	৩০৭	২৭৯	২৪৫	২৪২	২৪০	২২৬	২৪৮	২১৭	১৭০	১৫৪	২৭৭৩

২০০২ সালে ২৭৭৩টি হত্যা ঘটনায় শিকার হয় ৩৩০৬ জন। হত্যা ঘটনায় মামলা করা হয় ৮৬৬টি এবং গ্রেফতার করা হয় ৮০৩ জন আসামিকে। উক্ত ঘটনায় শিকার হয়ে আহত হন ১৫০ জন সাধারণ মানুষ। ২০০২ সালে হত্যা ঘটনায় আদালত ১১০ জনকে ফাঁসি ও ৭৮২ জনকে যাবৎজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে।

বেশ কিছু ঘটনায় দেখা গেছে হত্যার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ আক্রমণের শিকার হচ্ছেন কিন্তু আহত বা নিহত হননি। সেক্ষেত্রে তাকে শিকার হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০০২ সালে মার্চ মাসে হত্যা প্রবণতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে। এ সময় ৩০৭টি হত্যা ঘটনায় শিকার হন ৩৭৯ জন। সর্বনিম্ন হত্যা ঘটনা ঘটে ডিসেম্বর মাসে। এ সময় ১৫৪টি ঘটনায় হত্যার শিকার হন ১৭৩ জন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে সেনা মোতায়েনের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে এ সময় হত্যা ঘটনা অনেক কমে গিয়েছিল।

এক নজরে ২০০৩ সালে সন্ত্রাসী হত্যার চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
হত্যা	১১৪	১৬০	২৩৪	২৪৫	২৮৫	২১৩	২৫৮	২৬৭	২৯৩	২২৫	২৯৫	২৪৮	২৮৩৭

হত্যার প্রধান প্রবণতার মধ্যে দেখা গেছে-জবাই করে হত্যা, বোমা মেরে হত্যা, গুলি করে হত্যা প্রভৃতি। পুরো বছরের হত্যাকান্ডের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে জবাই করে হত্যার ঘটনা বেশি ঘটেছে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে। এছাড়া সারা বছর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জের ধরে চলেছে বেশিরভাগ হত্যাকান্ড। জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতায় প্রতিদিনই এক বা একাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে; অবশ্য এ প্রবণতার পেছনেও রয়েছে রাজনৈতিক বিবাদ এবং অসহিষ্ণুতা। ঈদ-উল আজহার ৩ দিনের ছুটিতে সারাদেশে খুন হয় ২৫ জন সাধারণ মানুষ।

জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার পর মার্চ মাস থেকে সারাদেশে হত্যার ঘটনা আবার বেড়ে যায়। জানুয়ারি মাসে হত্যার ঘটনা ঘটেছে ১১৪ টি; পক্ষান্তরে মার্চ থেকে প্রতি মাসেই এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ শতাধিক।

Dhaka University Institutional Repository

হত্যার সামগ্রিক চিত্র- ২০০৩

মাস	ঘটনা	শিকার	আহত	নিহত	সন্ত্রাসী নিহত	মামলা	গ্রেফতার
জানুয়ারি	১১৪	১২০	-	১২০	-	৩৮	২৬
ফেব্রুয়ারি	১৬০	১৭৭	৭	১৭০	-	৪১	৯৭
মার্চ	২৩৪	২৫৯	২২	২৩৪	৩	৭০	৬৭
এপ্রিল	২৪৫	২৭১	১০	২৪৩	১৮	৫৮	৫৮
মে	২৮৫	৩২৪	-	৩১৭	৭	৫৬	৬২
জুন	২১৩	২৭১	১৫	২৫২	৪	৫২	৬১
জুলাই	২৫৮	২৮৬	১৯	২৫৭	১০	৩৭	৬৭
আগস্ট	২৬৭	৩১২	২৮	২৬৪	২০	৫৮	৬৮
সেপ্টেম্বর	২৯৩	৩৩৯	৩৩	২৯৪	১২	৭২	৩৩
অক্টোবর	২২৫	২২৯	২৪	১৯৫	১০	৪৮	৩৯
নভেম্বর	২৯৫	৫৪১	১৯২	৩৩৫	১৪	৫০	৫৫
ডিসেম্বর	২৪৮	৩২০	৫২	২৫৯	৯	৭৪	৬৪
সর্বমোট	২৮৩৭	৩৪৪৯	৪০২	২৯৪০	১০৭	৬৫৪	৬৯৭

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৩ সালে সারাদেশে ২৮৩৭টি হত্যার ঘটনায় ৩৪৪৯ জন শিকার হন। হত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে নভেম্বর মাসে; এ সংখ্যা ২৯৫টি এবং সবচেয়ে কম ঘটেছে জানুয়ারি মাসে; ১১৪টি। দেশের ৬টি প্রধান দৈনিকের তথ্য বিশ্লেষণ করে উক্ত তথ্য জানা গেছে। পুরো বছর জুড়ে হত্যার বিভিন্ন ঘটনায় মামলা করা হয় ৬৫৪টি এবং গ্রেফতার করা হয় ৬৯৭ জন আসামীকে। হত্যা ঘটনায় এ সময়ে আহত হন আরো ৪০২ জন। নিহতের তালিকায় অপহরণ, ধর্ষণ, ছিনতাই বা কোনোভাবে কেউ খুনের শিকার হলেও সে সংখ্যা এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বছরের সবচেয়ে বড় এবং মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের বাঁশখালি উপজেলায়; একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে ডাকাত বেশে আগত দুষ্কৃতিকারীরা; ১২ জনের এ পরিবারে শুধু একজন পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হন।

৬ জুন নাটোরের সাবেক এমপি মুক্তিযোদ্ধা মমতাজউদ্দিনকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা; আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় এই নেতা নিজ বাড়িতে ফেরার পথে গোপালপুর-আব্দুলপুর সড়কে এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের শিকার হন। এছাড়া ২৫ আগস্ট খুলনা আওয়ামীলীগ সভাপতি মঞ্জুরুল ইমাম রিক্সাযোগে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীদের বোমা ও গুলির আঘাতে খুন হন। ২৪ এপ্রিল নওগাঁর আত্রাই উপজেলার নৈদাঁহি গ্রামে গভীর রাতে একজন ইউপি মেম্বার সহ ৬ জনকে জবাই করে হত্যা করা হয়; কারা কী কারণে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তা স্পষ্ট না হলেও এতে সর্বহারাদের হাত রয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া পাবনার আতাইকুলার লক্ষীপুর গ্রামে মাছ ধরার টং ঘরে হামলা চালিয়ে ৫ জনকে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

৮ থেকে ১৯ জুন সময়কালে নোয়াখালীর বয়ারচরে বিক্ষুব্ধ আইন হাতে তুলে নিয়ে চার দফায় মোট ৩৬ জন বনদস্যুকে হত্যা করেছে। ২০০৩ সালে প্রদত্ত বিভিন্ন হত্যা মামলার রায়ে ২৫৪ জনকে ফাঁসি, ৭১৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ৮৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।

২. সংবাদপত্রে ধর্ষণের ভয়াবহ চিত্র

নারী নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ হচ্ছে ধর্ষণ। কোনো মহিলা একবার ধর্ষিতা হলে সারাজীবন তাকে সে গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়। অথচ তিনি ধর্ষণের অসহায় শিকার মাত্র। সমাজ তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ, আইন তাকে রক্ষা করেনি, আত্মীয়-স্বজন তাকে সাহায্য করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ১৯৯৯ সালে ধর্ষণের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ধর্ষণ	৩৭	১৮	৩৭	৬৮	৭৩	৬২	৯৩	১০২	৬২	৮৮	৪৭	২৯	৭১৬

জানুয়ারিঃ

এ মাসে ৩৭ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের এসব ধর্ষিতাদের মধ্যে কম বয়সী মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। রাজধানী ঢাকায় ৮ বছরের এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। এ ছাড়া নরসিংদি, ঝিনাইদহ ও শাহজাদপুরে পৃথক পৃথক ঘটনায় তিনটি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। পটুয়াখালীতে সার্টিফিকেট আনতে গিয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক ধর্ষিত হয় এক তরুণী। সাভারে নিরাপত্তা প্রহরীদের দ্বারা ধর্ষিত হয় দুই গার্মেন্টসকর্মী। পটুয়াখালীতে এক ঘটনায় স্বামীকে বেঁধে রেখে দুর্বৃত্তরা ধর্ষণ করে স্ত্রীকে। এসব ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে ২১টির এবং গ্রেফতার হয়েছে দুজন।

ফেব্রুয়ারিঃ

সারাদেশে মোট ১৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। এতে দেখা যায় ৩-১৩ বছরের মোট ১২টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয় এ মাসে। এদের মধ্যে একজনকে হত্যাও করা হয়েছে। রাজধানীর মিরপুরে সাড়ে তিন বছরের এক শিশু ধর্ষিত হয়। বনানীতে ১৩ বছরের এক কিশোরী ধর্ষিত হয়। সাতক্ষীরায় ধর্ষণের শিকার হয় এক বোবা তরুণী। এছাড়া যশোরে দুটি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। যশোরে এক আবাসিক হোটেলে এক তরুণীকে আটকে রেখে চারজন ধর্ষণ করে।

মার্চঃ

৩৩টি ঘটনায় মোট ৩৭ জন ধর্ষণের শিকার হয়। দুজন ইউপি নারী সদস্যা ধর্ষণের শিকার হয়। বেগমগঞ্জে ভিজিএফ কার্ড বিতরণের নামে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ইউপি সদস্যাকে ধর্ষণ করে চেয়ারম্যানসহ দুজন।

এপ্রিলঃ

ধর্ষণের শিকার হয় ৬৮ জন। রাজধানীর তেজগাঁও ও মোহাম্মদপুরে পৃথক দুটি ঘটনায় চার বছরের দুটি শিশু ধর্ষিতা হয়। এসব ঘটনার মোট ৩০টির মামলা হয়েছে। ৩০ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।

মেঃ

৭২টি ধর্ষণের ঘটনায় ৭৩ জন ধর্ষিত হয়। এ মাসে ৩৩টি শিশু ও কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়, যার মধ্যে ৪-১০ বছরের ৯টি শিশু রয়েছে। এ মাসে কিশোরগঞ্জের জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের এক নারী সদস্যা পাঁচজন দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়।

জুনঃ

সারাদেশে মোট ৬২ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ঢাকার মিরপুরে একই ব্যক্তি দ্বারা দুই শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। মিরপুর দশ নম্বরের সি ব্লকের জনৈক বস্তিমালিকের ছেলে পরপর দুদিনে ছয় ও দশ বছরের দুটি শিশুকে ধর্ষণ করে। জেলাওয়ারি হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ঢাকা জেলায় ৮টি, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজশাহীতে ছয়টি।

জুলাইঃ

৯৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে ৭৪ জন নারী ও ১৯ জন শিশু। ৫৫ টি ঘটনার মামলা হয়েছে। ১৬টি ঘটনার সংশ্লিষ্ট আসামী গ্রেফতার হয়েছে ২০জন। ৩টি ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ জড়িত ছিল। ধর্ষিত শিশুদের বয়স ৪-১০ বছরের মধ্যে। নীলফামারীতে ৮ বছরের এক শিশু বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে ধর্ষিত হওয়াতে। সাতক্ষীরায় নিজ স্ত্রীকে তিন নরপশু দিয়ে ধর্ষণ করিয়ে স্বামী ছবি তুলে স্ত্রীর কাছে তালাক চায়।

Dhaka University Institutional Repository

আগষ্টঃ

. ১০২ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। এদের মধ্যে ৭৪ জন নারী ও ২৮ জন শিশু। ৬৪টি ঘটনার মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৩০ জন। ভোলাতে এক ইউপি সদস্য ও রাজশাহীতে এক ওয়ার্ড কমিশনার দ্বারা ২ গৃহবধু ধর্ষিত হয়। সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে নীলফামারীতে। ভোলার চরফ্যাশনে মা এবং ভাইকে বেঁধে রেখে তাদের সামনে দুই বোনকে ধর্ষণ করে ২ ব্যক্তি।

সেপ্টেম্বরঃ

মোট ৬২ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। এদের মধ্যে ৩৬ জন নারী ও ২৬ জন শিশু ও কিশোরী। এতদসংক্রান্ত ঘটনার ৩৮টির মামলা হয়েছে এবং ১৫টি ঘটনার ২৭ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়। শেরপুরে আত্মীয় দ্বারা ৮ বছরের শিশু কন্যা ধর্ষিত হয়েছে। পটুয়াখালীতে ১১ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করে ৩জন এবং ৩ জনকেই গ্রেফতার করা হয়। ভয়াপুরে পুলিশ ধর্ষণ করে এক কিশোরীকে।

অক্টোবরঃ

এ মাসে ৮৭ টি ঘটনায় মোট ৮৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৭ জন নারী ও ৪১ জন শিশু। ঘটনাগুলোর ৪৩ টির মামলা হয়েছে এবং ১৭ টি ঘটনার ৩১ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে ৭টি গণধর্ষণের ঘটনা ছিল। লক্ষীপুরে দেবর বড় ভাইয়ের সাবেক বৌকে ধর্ষণ করে।

নভেম্বরঃ

মোট ৪৪টি ধর্ষণের ঘটনায় ৪৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। ধর্ষণের শিকার ছিল ২৬ জন নারী ও ২১ জন শিশু। এতদসংক্রান্ত ঘটনার ২০ টির মামলা হয়েছে। ৭টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ফরিদপুর সদর থানায় কেজুরী ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করে আরেক ইউপি নারী সদস্য জোস্না বেগম।

ডিসেম্বরঃ

এ মাসে মোট ২৯ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হওয়ার খবর পত্রিকার পাতায় এসেছে। এসব ঘটনার ১৭টির মামলা হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। তবে মাত্র ৯ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মাছ দেয়ার লোভ দেখিয়ে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করে দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া হাত-পা বেঁধে শ্লীলতাহানীর পর কিশোরীকে খুন করে সন্ত্রাসীরা।

এক নজরে ২০০০ সালের ধর্ষণের ভয়াবহ চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ধর্ষণ	৪৮	৩৭	৫৮	৫৬	৪৮	৪৮	৫৩	৪৩	৪৮	৭৬	৪৫	৩২	৫৯২

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে ৪৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নারী ৩০ জন ও শিশু ১৮ জন। এসব ঘটনায় ৩২টি মামলা হয়েছে এবং ১৩টি ঘটনায় ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লক্ষীপুর জেলার রামগতি থানার তাহের বাহিনীর হাতে মসজিদের ইমামের স্ত্রী ও কন্যাসহ ৫ জন ধর্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারিঃ

৩৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। ধর্ষিতদের মধ্যে ৩০ জন নারী ও ৭ জন শিশু। ২৩টি ঘটনার মামলা হলেও ১১টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ২২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বরগুনায় ১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করার পর ৭দিন অতিবাহিত হলেও থানা মামলা নেয়নি। সাতক্ষীরায় স্বামীকে বেঁধে রেখে ৮/১০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে।

মার্চঃ

মোট ৫৮টি নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৪ জন নারী ও ১৪টি শিশু। এসব ঘটনায় ২৮টির মামলা হয়েছে। ১২টি ঘটনায় ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরে ৬ বৎসরের এক স্কুল ছাত্রীকে বক্কর আলী চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে পার্শ্ববর্তী গোয়াল ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। ফেনীর সোনাগাজীর ভাগাদিয়া গ্রামে সন্ত্রাসীরা পরিবারের লোকজনের সামনে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করেছে।

এপ্রিলঃ

মোট ৫৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। এদের মধ্যে ৩৭ জন শিশু ও ১৯ জন নারী। ৩৩টি ঘটনায় মামলা হয় ১০টি এবং ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। আপন বেয়াই কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে এক প্রতিবন্ধী গৃহবধু (২০)। তাড়াইল উপজেলায় দুসন্তানের জননী এক গৃহবধু (২৫) কে একই গ্রামের জিয়াউর রহমান অস্ত্রের মুখে স্বামীকে বেঁধে রেখে ধর্ষণ করে। করিমগঞ্জের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী এক নরপশু প্রতিবেশীর হাতে ধর্ষিত হয়।

মেঃ

১৬ জন নারী ও ৩২ জন শিশুসহ মোট ৪৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। ২৬টি ঘটনার মামলা হয় এবং ৮ ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শৈলকূপায় পিতার সামনে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে দুই নরপশু। অপরদিকে ১৯ বছরের এক পাষন্ড যুবক ধর্ষণ করেছে দু'বছরের এক অবুঝ শিশুকে।

জুনঃ

মোট ৪৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। এদের মধ্যে ২২ জন নারী ও ২৬ জন শিশু। ৪৭টি ঘটনায় ৩০টি মামলা হয় এবং ৬টি ঘটনায় ৮ জন গ্রেফতার হয়। যশোরে মা ও বিবাহিত দু'মেয়েকে নিজ বাড়িতেই আটকে রেখে সন্ত্রাসীরা গণধর্ষণ করে টানা দু'দিন। এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে সাত সহোদর ভাই। যশোর ক্যান্টনমেন্টের মেজর রাজ্জাক ধর্ষণ করে তার গৃহপরিচারিকাকে। রাজশাহীর গোদাবাড়ী থানায় স্বামীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে ৪ পাষন্ড। এক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের দায়ে সৈয়দপুর থানার পুলিশ কনস্টেবল শাহীনকে ক্লোজ করা হয়। পঞ্চগড়ে পুলিশ কনস্টেবল কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে এক অবুঝ শিশু।

জুলাইঃ

মোট ৫৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। এদের মধ্যে ২৫ জন শিশু ও ২৮ জন নারী। ৩১টি ঘটনার মামলা হয়েছে। ১১টি ঘটনায় ১৬ জনকে গ্রেফতার করার খবর পাওয়া যায়।

আগষ্টঃ

ধর্ষণের শিকার হয় ৪৩ জন। এর মধ্যে ১৯ জন নারী ও ২৪ জন শিশু। ২৩টি মামলার ঘটনায় ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ হোমিও ডাক্তার ৯ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে। শ্রীমঙ্গল শহরের জালালিয়া আবাসিক এলাকায় ২৫ বছরের এক যুবক কর্তৃক ৪ বছরের শিশু ধর্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বরঃ

৪৫টি ধর্ষনের ঘটনায় ৪৮ জন শিকার হয়। এর মধ্যে ২৩ জন নারী ও ২৫ জন শিশু। সেপ্টেম্বর মাসে ২৯টি ধর্ষণ মামলা হয় এবং ১০টি ঘটনায় ২০ জন ধর্ষক গ্রেফতার হয়।

অক্টোবরঃ

ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৭০টি। ধর্ষণের ঘটনার শিকার হয়েছে ৭৬ জন নারী ও শিশু। এদের মধ্যে ৩৫ জন নারী ও ৪১ জন শিশু। ৪৩টি ধর্ষণ মামলা হয়েছে। ২৩টি ঘটনায় ৩১ জন ধর্ষক গ্রেফতার হয়েছে।

নভেম্বরঃ

৪২ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং এর শিকার হয় ৪৫ জন। ধর্ষিতার মধ্যে ছিল ২৭ জন নারী ও ১৮ জন শিশু। ২৯টি মামলা হয়। ২১টি ঘটনায় ৩৩ জন ধর্ষক গ্রেফতার হয়। গাইবান্ধায় এক বেসরকারী কলেজ প্রভাষক জনৈক দিনমজুরের স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

ডিসেম্বরঃ

ডিসেম্বরে সারাদেশে ২৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ১৯ জন নারী ও ১৩ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ১৪টি ধর্ষণ মামলা হয়েছে। ৯টি ঘটনায় ১৬ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এক নজরে ২০০১ সালের ধর্ষণের ভয়াবহ চিত্র

বিবরণ	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ধর্ষণ	৪৭	৪৫	৩৭	৫৫	৪৯	৪৬	৫৪	৪০	১৭	১৪৩	৫৮	৪৪	৬৩৫

জানুয়ারিঃ

৪৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ১৫ জন নারী ৩২ জন শিশু। উক্ত ঘটনায় মামলা হয়েছে ১২টি এবং গ্রেফতার হয় ১২ জন। পঞ্চগড়ে মাদ্রাসার শিক্ষক ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। সিরাজগঞ্জ জেলার যুগনীদহ গ্রামের স্কুল ছাত্রী বিয়েতে রাজি না হওয়ায় পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হয়। অপরদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্ড আব্দুল রাজ্জাককে গ্রেফতার করেছে এক বিধবাকে দু'দফা ধর্ষণের দায়ে।

ফেব্রুয়ারিঃ

সারাদেশে ৪৪টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এদের মধ্যে নারী ১৯ জন ও শিশু ২৬টি। ২২টি মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ৯ জন। কুড়িগ্রামে এক শিশু কন্যাকে (১২) ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আব্দুর রহমানের পুত্র ও তার কর্মচারী পালাক্রমে ধর্ষণ করে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। শিশুটির মামা কুড়িগ্রাম থানায় মামলা করে ফেরার পথে ধর্ষণকারীরা তাকে রামদা দিয়ে মারাত্মক জখম করে। পুলিশ ধর্ষকদের গ্রেফতারের কোন তৎপরতা চালায়নি।

মার্চঃ

সারাদেশে ৩৪টি ধর্ষণের ঘটনায় ৩৪ জন শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ১৯ জন নারী এবং ১৮ জন শিশু। এ ব্যাপারে ১৩টি মামলা হয়েছে এবং ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে। রূপগঞ্জ থানার সাওগাট গ্রামে ২ পাষন্ড যুবক ধর্ষণ করেছে এক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে। ২৩ মার্চ গভীর রাতে মাদারীপুরে অস্ত্রের মুখে পিতা-মাতাকে জিম্মি করে সদ্য বিবাহিতা কন্যাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে এলাকার কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী।

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিলঃ

সারাদেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫১টি। এতে শিকার হয় মোট ৫৫ জন। ২২ জন নারী ও ৩৩টি শিশু। এ ব্যাপারে ২৭টি মামলা হয় ও ৩১ জন গ্রেফতার হয়। বসতবাড়ীর সীমানা নিয়ে বিরোধের কারণে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ৪ নম্বর ব্লকের এক তরুণীকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণের পর ইট দিয়ে হাত-পা থেঁতলে দিয়েছে এবং ছুঁরি দিয়ে পেট কেটে দিয়েছে।

মেঃ

৪৭টি ধর্ষণের ঘটনার শিকার হয় ৪৯ জন। এর মধ্যে ২৭টি শিশু এবং ২২ জন নারী। এ ব্যাপারে ২৬টি মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ৭ জন। মৌলভীবাজারে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক অসুস্থ তরুণী গণধর্ষণের শিকার হয়। রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকায় এক কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। একদল সন্ত্রাসী বাসার সামনে থেকে অপহরণ করে সেনপাড়া পর্বতা এলাকায় একটি বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করে অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।

টেলিভিশন দেখার লোভ দেখিয়ে পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করেছে। শিশুটি কে ১৩ মে নেত্রকোনা জেলার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জুনঃ

৪৪টি ধর্ষণের ঘটনায় ৩৫ জন শিশু এবং ১১ জন নারীসহ মোট ৪৬ জন শিকার হয়েছে। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৭টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ১৬ জন। দৌলতপুরে বিভিআর জোয়ানরা ১২ জুন সন্ধ্যার দিকে এক যুবতীকে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের এক পর্যায়ে যুবতীটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ সময় অবস্থা বেগতিক দেখে তার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে জোয়ানরা সটকে পরে। ধর্ষিতার পক্ষ থেকে দৌলতপুর থানায় মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ফুলপুরে পৃথক ঘটনায় ৫ বছরের একশিশু ও একজন স্কুল ছাত্রী ধর্ষিত হয়েছে। ৯ জুন দুপুরে ময়মনসিংহের বড় বাঘাই গ্রামের ৫ বছরের শিশু নুরজাহানকে এক সন্তানের জনক জুয়েল (৩০) আম পাড়ার কথা বলে নিয়ে ধর্ষণ করে। অপরদিকে পশ্চিম বাসাই গ্রামে ৭ জুন রাতে প্রাকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের বাইরে আসলে একদল দুর্বৃত্ত এক স্কুল ছাত্রীকে রাতভর ধর্ষণ করে।

জুলাইঃ

৫২ টি ধর্ষণের ঘটনায় শিকার হয়েছে ৫৪ জন নারী ও শিশু। এদের মধ্যে নারী ২১ জন এবং শিশু ৩৩ জন। ধর্ষণ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে ২৮ টি এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ১৪ জনকে। দাখিল পরীক্ষার্থী এক ষোড়শী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও পুলিশ আসামিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তিন ধর্ষক পাল্টা ধর্ষিতা ও তার দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ঘরবাড়ি জ্বালানোর মামলা করে হত্যার হুমকি দিয়েছে।

কক্সবাজারের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চার দুর্বৃত্ত কর্তৃক এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় জরিমানা ধরা হয়েছে মাত্র চার হাজার টাকা। আর সেই জরিমানার টাকাও দুর্বৃত্তরা দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। জরিমানার রায় দিয়েছে এক গ্রাম্য সালিশী বোর্ড।

আগস্টঃ

৪০টি ঘটনায় এ মাসে শিকার হয়েছে ১৩ জন নারী ও ২৭ টি শিশু। উক্ত ঘটনায় এ মাসে মামলা হয়েছে ২২টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ১৫ জন। কক্সবাজারের ভাদিতলা গ্রামে এক শিশুকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছে দুই পাষন্ড যুবক। পুলিশ খোরশেদ আলম নামে এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে। বাংলাদেশে বেড়াতে এসে ভারতীয় তরুণী বেনাপোল সীমান্তের কাছে অবৈধ আদম ব্যাপারীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বরঃ

১৭টি ধর্ষণের ঘটনায় শিকার হয়েছে ১৭ জন নারী ও শিশু। এর মধ্যে নারী ৬ জন এবং শিশু ১১ জন। মামলা হয়েছে ৬টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ১০ জন। বরিশালের মুলাদীতে দু'সন্তানের জননীকে হক্কর আলী হাওলাদার নামে এক লম্পট পাশবিক নির্যাতন করেছে। অপর একটি ঘটনায় সাতক্ষীরার কলারোয়া পল্লীতে দুই তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। একজন ইউপি চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা ধর্ষকের পক্ষ নিয়ে থানায় মামলা না করার জন্য হুমকি প্রদান করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অক্টোবরঃ

সারাদেশে ৭৯ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় শিকার হয়েছে ১৪৩ জন। এর মাঝে নারী ৮৩ ও ৬০ জন শিশু। উক্ত ঘটনায় মামলা হয়েছে ২৫ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৩৬ জন ঘাতক। বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার এক কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৬ অক্টোবর ঘটনার দিন গভীর রাতে এই কিশোরী তার বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেলে একই গ্রামের শহীদ, সিদ্দিক ও বায়েজিদ বেড়া কেটে ঘরে প্রবেশ করে। তারা মুখে কাপড় পেঁচিয়ে কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। নির্বাচন-পরবর্তী অবাঞ্ছিত ঘটনার জের ধরে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

নভেম্বরঃ

৫২ টি ঘটনায় এমাসে শিকার হয়েছে ৫৮ জন নারী ও শিশু। ৪২ জন নারী ও ১৬ জন শিশু। এ মাসে ২৫ টি ঘটনার মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ১০ জন। মহাখালী এলাকায় এক কিশোরী কাজের মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। লক্ষীপুর জেলার রায়পুরের চর বংশী ইউনিয়নের আব্দুল মতিন সর্দারের ছেলে শামসুদ্দিন (৩০) পাশের বাড়ির যুবতীকে বাড়ি থেকে তুলে একটি বাগানে নিয়ে ধর্ষণ করে। এ সময় যুবতীর চিৎকারে লোকজন ঘটনাস্থলে এসে পড়লে শামসুদ্দিন পালিয়ে যায়।

ডিসেম্বরঃ

৪৩ টি ঘটনায় এ মাসে শিকার হয় ৪৪ জন। এর মধ্যে নারী ৩৪ জন এবং শিশু ১০ জন। এ মাসে উক্ত ঘটনায় মামলা হয়েছে ১২ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ১৭ জন আসামি। পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলা সদরের গ্রামে ৪ বছরের এক শিশু ধর্ষিত এবং একই বয়সী অপর শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টায় এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত এক ধর্ষকের পিতাকে পুলিশ ঘটনার রাতেই গ্রেফতার করেছে। রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় ২৬ ডিসেম্বর রাতে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা এক কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। স্থানীয় লোকজন ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

এক নজরে ২০০২ সালে ধর্ষণের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ধর্ষণ	৬৫	৪৭	১২৪	১১৬	৯৮	১০৬	৯২	১০৩	৮১	৯৭	৬১	৭০	১০৬০

১০৬০ টি ধর্ষণের ঘটনায় ২০০২ সালে শিকার হয় ১০২৪ জন নারী ও শিশু। এর মাঝে নারী ৮০৩ জন এবং শিশু ২২১ জন। ৪০৯ জনের বিরুদ্ধে এ সময়ে মামলা করা হয় এবং গ্রেফতার করা হয় ৩৯১ জন আসামিকে। উক্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে ঘটনার চেয়ে শিকার কম হওয়ার কারণ হচ্ছে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে অনেক নারী শিশু আক্রমণের শিকার হয় কিন্তু অনেক সময় শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হবার আগে তাদের চিৎকারে এলাকাবাসি তাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের ঘটনাগুলো গণনায় ধরা হল। ১২৪ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে মার্চ মাসে যা ছিল বছরের সর্বাধিক চিত্র। সর্বনিম্ন ধর্ষণের ঘটনা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসে ৪৭ টি।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ২০০৩ সালে ধর্ষণের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ধর্ষণ	২২	৩৭	৮১	১০০	১৪৪	১০১	১২০	৮৬	১০৩	৭৯	৫৩	৫৬	৯৮২

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৩ সালে ৯৮২টি ধর্ষণের ঘটনায় শিকার হন ১০১০ জন নারী ও শিশু; এর মধ্যে নারী ৭৬৫ এবং শিশু ২৪৫ জন। ধর্ষণ ঘটনায় এ সময় মামলা করা হয় ৩৫৪টি এবং গ্রেফতার করা হয় ২৭৬ জন ঘাতককে।

এ বছর সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে মে মাসে, ১৫৫ টি সবচেয়ে কম জানুয়ারিতে, ২২টি। জুন মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারদলীয় সশস্ত্র ক্যাডাররা জেলা পরিষদের একটি অফিসে আটকে রেখে ফুলবাড়িয়া এলাকার এক সংখ্যালঘু গৃহবধূকে ধর্ষণের পর বিবস্ত্র ছবি তুলে বিতরণ করে। মার্চ মাসে আরেকটি ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের বাগবাড়ী মসজিদের ইমাম আব্দুল বারেক কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয় ৬ বছরের এক শিশু; অভিযুক্ত ইমামের হুজরাখানায় এই ঘটনাটি ঘটে।

৩. সংবাদ পত্রে এসিড নিক্ষেপের ভয়াবহ চিত্র

সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নৃশংস সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ। এসিড নিক্ষেপের দ্বারা ঝলসে দেয়া হচ্ছে একজন মানুষের মুখমন্ডল, বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে তার সুন্দর চেহারাটা। পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সারা দেহটি। ধুকে ধুকে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হচ্ছে একজন মানুষকে। এই ধরনের করুণ পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে। এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়ে থাকে প্রধানত কিশোরী, যুবতী ও গৃহবধুরা। ক্ষেত্রবিশেষ পুরুষরাও এ নির্মমতার শিকার হচ্ছে। শিকার যেই হোক না কেন স্থান-কাল ভেদে দেশের সর্বত্রই এ জঘন্য অপরাধটি বেড়েই চলেছে।

শ্রেণীভেদে এসিড নিক্ষেপের শিকার যেমন নানা বয়সের নারী-পুরুষ তেমনি এর পেছনে কারণও বহুবিধ। কখনো বা প্রেম নিবেদনে সাড়া না পেয়ে আবার কখনো প্রত্যাখান হয়ে, কখনো বা বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে। যৌতুকের জন্যে কখনো স্বামী স্ত্রীকে আবার ক্ষেত্র বিশেষ স্ত্রী স্বামীকেও এসিড মারছে। আমাদের সমাজে পুরুষরা স্ত্রীর কাছ হতে তালাক আদায় করার বিভিন্ন ফন্দী ফিকির এঁটে থাকে। জোর করে আদায় করা হয় তালাক। বিপত্তি ঘটে স্ত্রী যখন স্বামীকে তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন হয়তো স্বামী এসিডে ঝলসে দেয় স্ত্রীকে। তেমনি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে অনুমতি না দেয়া বা মেনে না নেয়ার কারণেও স্ত্রীর শরীর বা মুখমন্ডল ঝলসে দেয় পাষন্ড স্বামী। পারিবারিক কলহ, দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া, গোষ্ঠীগত বিবাদ, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ প্রভৃতি কারণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিকার হচ্ছে এসিড নিক্ষেপের।

এক নজরে ১৯৯৯ সালে এসিড নিক্ষেপের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
এসিড নিক্ষেপ	১৯	৭	৭	২২	২৪	২১	২০	২৬	২৫	১৮	১২	২২	২২৩

জানুয়ারিঃ

৬টি ঘটনায় মোট ১৯ জন এসিডদগ্ধ হয়। এরমধ্যে ফেনীর এক গ্রামে দুই পরিবারের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদে এক মর্মান্তিক এসিড যুদ্ধে উভয়পক্ষের ছয়জন নারী ও আটজন শিশুসহ ১৪ জন আহত হয়। মাগুরার এক পল্লীতে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে এক গৃহবধু ও তার ভাগনে। ঝালকাঠিতে বিয়ের ১১ দিন পর এক নববধুর মুখমন্ডর ঝলসে দেয় দুর্বৃত্তরা। পিরোজপুরে এক দিনমজুরের মেয়েকে প্রথমে ধর্ষণ ও পরে এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়া হয়। ৬টি ঘটনার মধ্যে ১টির মামলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারিঃ

মোট সাতজন নারী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। ৬টি ঘটনায় এই সাতজনের এসিডদগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটে। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া থানায় ফুফাতো ভাই-এর দেয়া বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এসিড নিক্ষেপের শিকার হয় দুবোন। পিরোজপুরে এক গৃহবধুকে এসিড নিক্ষেপ করেছে তার স্বামী। এসিড নিক্ষেপের অন্যান্য ঘটনাগুলো ঘটেছে যশোর, সাতক্ষীরা, মাগুরা ও ভোলায়। এরমধ্যে ৪টি ঘটনার মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে পাঁচজন।

মার্চঃ

মোট ৫টি ঘটনায় ৭টি মেয়ে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। এদের সবার বয়স ৯-১৭ বছরের মধ্যে এবং প্রায় সকলেই স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার ছাত্রী। ৯ বছরের সুমী এসিডদগ্ধ হয় রুবিনার সাথে একত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়। এসিড নিক্ষেপের মূল লক্ষ্য ছিল রুবিনা। সাতক্ষীরায় দুই সহোদর ভাই কর্তৃক দুই স্কুলছাত্রী বোনও এসিডদগ্ধ হয়।

এপ্রিলঃ

মোট ১৭টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ২২ জন এর শিকার হয়। এসব ঘটনার মধ্যে কুমিল্লার লাকসামে ফজিলাতুন্নেছা, নাটোরের স্কুল-ছাত্রী, খুলনায় দুই সহদরা, সাতক্ষীরার শিল্পী মারাত্মকভাবে এসিডদগ্ধ হয়। ১৭টি ঘটনার মধ্যে মোট ১০টিতে মামলা হয়।

মেঃ

১৯ জন নারী ও পাঁচজন পুরুষসহ ২০টি ঘটনায় মোট ২৪ জন এসিডদগ্ধ হয়। ঘটনাসমূহের মধ্যে ৭টির মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলেও পরবর্তীতে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

জুনঃ

১৩টি ঘটনায় মোট ২১ জনকে এসিড ছুঁড়ে ঝলসে দেয়া হয়েছে। কুমিল্লায় একটি ঘটনায় তিনমাসের শিশুসহ মোট চারজন নারী এসিডদগ্ধ হয়। মানিকগঞ্জে ধর্ষণ মামলা দায়ের করায় ধর্ষিতার মাকে এসিডদগ্ধ করে দুর্বৃত্তরা। উল্লেখ্য, এসিডদগ্ধ ২১ জনের মধ্যে ১৯ জন নারী ও দুজন পুরুষ। ১৩টি ঘটনার মধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে ছয়টির এবং গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজন অভিযুক্তকে।

জুলাইঃ

মোট ১৮টি ঘটনায় ২০ জন নারী-পুরুষ এসিডদগ্ধ হয়। ৯টি ঘটনার মামলা হলেও কোনো আসামী গ্রেফতার হয়নি। কুমিল্লার কাদোয়া গ্রামের পারুল বেগম ও তার শিশুকন্যা ফাতেমা এসিডদগ্ধ হয় দুর্বৃত্তদের হাতে। বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গাইবান্ধার আব্দুল গফুরকে এসিড মেরেছে জোহরা বেগম। মানিকগঞ্জের হাফেজনগর গ্রামের ষষ্ঠ শেণীর ছাত্রী হাসিনা এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়।

আগষ্টঃ

মোট ১৩টি ঘটনায় ২৬ জন এসিডদগ্ধ হয়। ৭টি ঘটনার মামলায় আসামী গ্রেফতার হয়েছে মাত্র একজন। দুর্বৃত্তদের ছোড়া এসিডে ১০ জন পাহাড়ি মেয়ে দগ্ধ হয় বান্দরবনে। এছাড়া নরসিংদিতে কবুতর আটক করাকে কেন্দ্র করে এক পরিবারের ৪ জন এসিডদগ্ধ হয়। স্ত্রীর ছোড়া এসিডে মুখমন্ডল ঝলসে যায় লক্ষীপুরের শাকচর গ্রামের শাহ্ আলমের।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বরঃ

মোট ২০টি ঘটনায় ২৫ জন নারী ও পুরুষ এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। মোট ৬টি ঘটনার মামলা হয় এবং ৬টি ঘটনার মোট ৮জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্বামীকে তালাক দেয়ার কারণে রূপগঞ্জে গার্মেন্টস কর্মী হেনা বেগমকে এসিডে ঝলসে দেয় প্রাক্তন স্বামী। সিরাজগঞ্জে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের পর মাথায় এসিড ঢেলে দেয় দুর্বৃত্তরা।

অক্টোবরঃ

সারাদেশে ১৬ টি ঘটনায় মোট ১৮ জন নারী-পুরুষ এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। ৭টি ঘটনার মামলা হয়েছে। এবং ২টি ঘটনার মোট ৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। লক্ষীপুরে স্ত্রীর অসামাজিক কাজে বাঁধা দেয়ায় স্ত্রী স্বামীর শরীর এসিডে ঝলসে দেয়। সাভারে এক ইমামের হাত-পা বেঁধে এসিড নিক্ষেপ করে তারই এক আত্মীয় এবং সন্দ্বীপে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী খুন হয় ও অপর দুই জনকে অপহরণ করে মুখে এসিড ঢেলে দেয়া হয়।

নভেম্বরঃ

৮টি ঘটনায় ১২ জন এসিডদগ্ধ হয়। ৩টি ঘটনার মামলা হলেও অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ১জন। মহাখালীতে কতিপয় ছিনতাইকারী এসিড নিক্ষেপ করে রিক্সাযাত্রী তরুণীকে। ভোলায় একই পরিবারের দুজনকে এসিডদগ্ধ করে। ঝিনেদাহ জেলার মহেশপুরের কালীবাড়িতে একই বিছানায় ঘুমিয়া থাকা অবস্থায় এসিডদগ্ধ হয় ৩ নারী।

ডিসেম্বরঃ

১৭টি ঘটনায় ২২ জন নারী-পুরুষ, শিশু এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। এসব ঘটনার ৮টির মামলা হওয়ার খবর পাওয়া যায়। শেরপুরে দুটি শিশুর গায়ে এসিড নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসীরা। ধর্ষণ মামলা প্রত্যাহার না করায় ধর্ষিতার শরীরে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ধর্ষণ করার পর এসিডে ঝলসে দেয় এক বিধবার শরীর।

এক নজরে ২০০০ সালে এসিড নিক্ষেপের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগাস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
এসিড নিক্ষেপ	০৯	০৩	১৩	২০	৩১	২৯	২৫	২০	১৬	২৬	১৭	০৬	২১৫

জানুয়ারিঃ

৮টি ঘটনায় ৯ জন (১ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী) এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। পাবনার চাটমোহরে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় এক স্কুলছাত্রী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। রাজধানীর রায়ের বাজারে সতীনের নিক্ষিপ্ত এসিডে ঝলসে গেছে এক গৃহবধুর মুখমন্ডল। ঝিনাইদহে ঘুমন্ত দুই সহোদরার মুখমন্ডল এসিডে ঝলসে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। হরিণাকুন্ডু থানায় সিংগাইর গ্রামের স্কুল পড়ুয়া দুই বোনকে রুবিনা (১৫) ও রোজিনা (১০) ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় জানালা দিয়ে এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

ফেব্রুয়ারিঃ

মোট ৩ জন নারী ও পুরুষ এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। ঘটনার মধ্যে ২টির মামলা হয়েছে। ১টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বরিশালে এক জনকে এসিড নিক্ষেপ করে তার চাচাত ভাই। মাদারীপুরে ইঁরি ক্ষেত্রের ড্রেন কাটতে না দেয়ায় এক বিধবাকে এসিড নিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

মার্চঃ

৮টি ঘটনায় মোট ১৩ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। ৩টি ঘটনার মামলা হলেও ১টি ঘটনায় ১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজধানীর মগবাজারে এক নার্সকে ওয়ার্ডবয় প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে এসিড নিক্ষেপ করে। পরে সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। মুক্তাগাছায় পিতার নিক্ষিপ্ত এসিডে নিজ কন্যাসহ ৪ জন ঝলসে যায়। সিলেটে দুর্বৃত্তদের নিক্ষিপ্ত এসিডে ঝলসে গেছে ডাক্তার ও নার্সের চোখ-মুখ।

এপ্রিলঃ

১৭টি ঘটনায় ২০ জন এসিডদগ্ধ হয়। ৫টি ঘটনার মামলা হয় ও ৩টি ঘটনার সাথে জড়িত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। দোহারে সীমা নামে এক তরুণীকে এক দুর্বৃত্ত এসিড ছুঁড়ে মারে। দাম্পত্য কলহের জের ধরে এক পাষন্ড স্বামী এসিড মেরে স্ত্রীর শরীর ঝলসে দিয়েছে। পটুয়াখালীতে সংঘটিত এ ঘটনায় স্ত্রী নয়ন ওরফে জয়নবের (১৮) সঙ্গে দাদী হালিমা বিবি (৬০) এসিড দগ্ধ হয়। স্থানীয় লোকজন এসিড নিক্ষেপকারী হুমায়ুন কবীরকে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

মেঃ

২৬টি ঘটনায় ৩১ জন নর-নারী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। ৭টি ঘটনার মামলা হয় এবং ৫টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করে। ১৩ বছরের কিশোরী ঝুমা দাসকে এসিড নিক্ষেপের সাতদিন পরও তার পরিবার মামলা করতে পারেনি। প্রভাবশালী মহলের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের নিক্ষিপ্ত এসিডে পুড়ে গেছে টাঙ্গাইলের ধনপুর গ্রামের স্কুলছাত্র হেলাল রহমানের শরীর থেকে পা পর্যন্ত।

জুনঃ

২৪টি ঘটনায় ২৯ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। এর মধ্যে ১৯ জন নারী, পুরুষ ৫ জন ও শিশু ৫ জন। ১১টি ঘটনায় মামলা হয় এবং ৫টি ঘটনায় ৫ জন গ্রেফতার হয়। রাজশাহী জেলার বাগমারা থানায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে যৌতুকলোভী পাষন্ড স্বামী জোর করে এসিড খাইয়ে দিয়েছে। মাকে এসিড মেরে ১২ বছরের মেয়ে রোমেলাকে অপহরণ করে শেরপুর জেলায়।

জুলাইঃ

২১টি ঘটনায় ৬ জন শিশু, ৫ জন পুরুষ এবং ১৪ জন নারী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। ১১টি ঘটনার মামলা হয় এবং ২টি ঘটনায় ৩ জন গ্রেফতার হয়।

আগস্টঃ

সরাদেশে ১৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় শিকার হয়েছে ২০ জন। এর মধ্যে ১২ জন নারী, ৭ জন শিশু ও ১ জন পুরুষ। ৬টি মামলায় ১১ জন গ্রেফতার হয়। চাঁদপুরে ভূঁইয়া বাড়িতে এক এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় একই ঘরের তিনজনের দেহ ঝলসে গেছে। রেহানা আক্তার (১৮), সুলতানা রাজিয়া (১৬) ও শাহাদাত হোসেন (১২)। প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয় এবং রেহানার অন্যত্র বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যর্থ প্রেমিক এই ঘটনা ঘটায়। ময়মনসিংহে যৌতুকলোভী স্বামীর নিক্ষিপ্ত এসিডে ঝলসে গেছে ঘুমন্ত মা ও শিশু কন্যা।

সেপ্টেম্বরঃ

১৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ১৬ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৭ জন নারী, ৩ জন পুরুষ ও ৪ জন শিশু। ৬টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবরঃ

সারাদেশে ২০টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এর শিকার হয় ২৬ জন। এদের মধ্যে ১৬ জন নারী, ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন শিশু। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা হয় ৯ টি ও গ্রেফতার হয় ৪ জন।

নভেম্বরঃ

সারাদেশে ১৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ১৭ জন শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৮ জননারী, ৫ জন পুরুষ ও ৪ জন শিশু। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ৭টি মামলা হয়েছে এবং ৭ জন গ্রেফতার হয়েছে। বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে রংপুরের নবম শ্রেণীর ছাত্রী মালাকে পাশের বাড়ীর মুন্নী নামের একজন মহিলার সহযোগিতায় সমস্ত শরীর এসিড দিয়ে ঝলসে দিয়েছে এলাকার হারুন নামের এক যুবক।

ডিসেম্বরঃ

এসিড নিক্ষেপের ৫টি ঘটনায় ৬ জন শিকার হয়। এর মধ্যে ৩ জন নারী, ২ জন পুরুষ ও ১টি শিশু। উক্ত ঘটনায় ২টি মামলা হয় ও একজন গ্রেফতার হয়। গাজীপুরে এক কলেজ ছাত্রী সম্ভ্রমহানির মামলা করায় এবং তা প্রত্যাহার না করায় দুর্বৃত্ত জহিরুল ও তার তিনসঙ্গী উক্ত ছাত্রীকে এসিড নিক্ষেপ করে।

এক নজরে ২০০১ সালে এসিড নিক্ষেপের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
এসিড নিক্ষেপ	১৩	১৪	০৯	২৬	২৭	১৮	৫০	৪৪	১৫	২৪	২০	১৮	২৭৮

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে এসিড নিক্ষেপের ১৩টি ঘটনায় ১৩ জন শিকার হয়। এ মাসে ৬টি মামলা হয়। গভীর রাতে বগুড়ার কাহালু উপজেলার পল্লিতে ফাহিমা আক্তার বুলবুলি (৩০) নামের এক গৃহবধু এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিঃ

এসিড নিক্ষেপের ১২টি ঘটনায় শিকার হয়েছে ১৪ জন। এর মধ্যে ৯ জন নারী, ৩ জন পুরুষ ও ২টি শিশু। এ ব্যাপারে ৩টি মামলা হয়েছে এবং ৫টি ঘটনায় ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার এক পাষন্ড স্বামী এসিড মেরে মুখমন্ডল ঝলসে দিয়েছে স্ত্রী সাজেদা বেগম (২৫) কে।

মার্চঃ

এসিড নিক্ষেপের ৯টি ঘটনায় শিকার হয়েছে ৯ জন। এর মধ্যে ৭ নারী ও ২ জন পুরুষ। মামলা হয়েছে ৫টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৪ জন। যশোরে স্ত্রীর ওপর এসিড নিক্ষেপকারী স্বামীকে পুলিশ আলামতসহ ধরার পরও ছেড়ে দিয়েছে। বিষয়টি পুলিশ সুপারকে অবহিত করা হলে তিনি তদন্তের নির্দেশ দেন।

এপ্রিলঃ

দেশে ২০টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে এতে শিকার হয় মোট ২৬ জন। এর মধ্যে ১৪ জন নারী, ২ জন পুরুষ ও ৭টি শিশু এসিডদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে এবং ৩ জন এসিডদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এদের মধ্যে নারী ১ জন এবং পুরুষ ২ জন। এ ব্যাপারে ৭টি মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ৮ জন। নান্দাইলে স্কুল পড়ুয়া দুই বোন লাকী (১৬) ও বেলী (১৩)-কে এসিডে ঝলসে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পারিবারিক সূত্রে জানায়, চাচাতো ভাই কামরুজ্জামান ৩/৪ বছর আগে লাকীর পিছু নেয়। দাখিল পরীক্ষায় সময় প্রতিবেশী যুবক আনোয়ারের সাথে লাকীকে রাস্তায় দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে এ ঘটনা ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

মেঃ

সারাদেশে ২৫টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে, এতে শিকার হয় ২৭ জন। এর মধ্যে ১৫ জন নারী, ৩ জন পুরুষ ও ৯ জন শিশু। এই ১৫ জন নারীর মধ্যে ১ জন নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে ১১টি মামলা হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে ৩জন। হবিগঞ্জের ভরতপুর গ্রামের রুনা বেগম (১৭)-কে শওকত নামের এক যুবক এসিড নিক্ষেপ করে মুখ ও শরীর ঝলসে দিয়েছে। শওকত রুনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে এসিড নিক্ষেপ করে। তাকে হবিগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার নবাবপুর গ্রামে এক গৃহবধুকে পাষন্ড স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন যৌতুকের দাবিতে প্রচন্ড শারীরিক নির্যাতনের পর এসিডে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তার শ্বাশুড়িকে গ্রেফতার করে।

জুনঃ

৯টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় শিকার হয়েছে ১৮ জন। এর মধ্যে ১৩ জন নারী, ৪ জন পুরুষ ও ১টি শিশু। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৩টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৩ জন।

যৌতুকলোভী স্বামী কর্তৃক এসিডদগ্ধ হয়েছে গৃহবধু সালমা খাতুন (২০)। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যৌতুকের ৫ হাজার টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার স্বামী ঘুমের মধ্যে তার গায়ে এসিড ঢেলে দেয়। এসিডে ঝলসে গেছে ভান্ডারিয়ার স্কুল ছাত্রী শাহনাজ আক্তারের (১৫) শরীর।

জুলাইঃ

২৯ টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় শিকার হয়েছে ৫০ জন। এর মধ্যে নারী ৩৬ জন, পুরুষ ১০ জন এবং শিশু ৪ জন। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৩টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৪ জন। ময়মনসিংহে শাহনাজ (৭) নামে এক শিশুকে এসিড মেরে ঝলসে দেয়া হয়েছে।

আগস্টঃ

৩২টি ঘটনায় শিকার হয়েছে ৪৪ জন। এর মধ্যে নারী ৩০ জন, পুরুষ ১১ জন এবং শিশু ৩ জন। এ মাসে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৯ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ২ জন। চাঁদপুর শাহরাস্তি উপজেলায নুনিয়া গ্রামের নুরুল হুদা ২০ হাজার টাকা যৌতুক চেয়ে না পেয়ে স্ত্রী হালিমার (২০) গায়ে এসিড ঢেলে দেয়। ঝলসানো অবস্থায় তাকে প্রথমে শাহরাস্তি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। কিন্তু পাঁচ দিন পর অবস্থার অবনতি দেখে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

সেপ্টেম্বরঃ

সারা দেশে এসিড নিক্ষেপের ১২ টি ঘটনায় শিকার হয়েছে ১৫ জন। এই ১৫ জনের মধ্যে নারী ১০ জন, পুরুষ ৪ জন এবং শিশু ১ জন। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৭টি এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ২ জনকে। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধে বড়ভাই এসিডে ঝলসে দিয়েছে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর মুখ। ছোট ভাই স্ত্রীকে সম্মত্তি লিখে দেয়ায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বড় ভাই এ কান্ড ঘটায়।

অক্টোবরঃ

এসিড নিক্ষেপের ১৩টি ঘটনায় শিকার হয়েছে ২৪ জন। মামলা হয়েছে ২টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ২ জন। গোবিন্দগঞ্জে দুর্বৃত্তের এসিড নিক্ষেপে মা ও মেয়ের মুখ ঝলসে গেছে। জানা গেছে, ঘুমন্ত অবস্থায় দুর্বৃত্তেরা ঘরের জানলা দিয়ে এসিড নিক্ষেপ করলে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী মৌসুমী (২০) এবং তার মা জাহানারার (৪০) মুখ ও শরীর ঝলসে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বরঃ

মোট ১১টি ঘটনায় ২০ জন নারী-পুরুষ এসিড দগ্ধ হয়। ৩টি ঘটনায় মামলা হয় এবং এ মাসে ৫ জনকে গ্রেফতার করে। দুর্বৃত্তের ছুড়ে মারা এসিডে এক কিশোরসহ ২ জনের শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে গেছে। নগরীর মিরপুর ২ নং এলাকায় ১১ নভেম্বর এ ঘটনা ঘটে। মাগুরা সদর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের আতোয়ার রহমানের মেয়ে সেলিনা আক্তারকে (২২) তার প্রাক্তন স্বামী আনোয়ারুলসহ ৭/৮ অপহরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এসিড নিক্ষেপ করে মুখ ও শরীর ঝলসে দেয়। অপর একটি ঘটনায় ঘুমন্ত স্বামী-স্ত্রীর মুখে এসিড ছুড়ে মেরেছে বখাটে যুবকেরা।

ডিসেম্বরঃ

সারা দেশে ১২টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় শিকার হয়েছে ১৮ জন। এর মধ্যে ১২ জন নারী, ৩ জন পুরুষ ও ৩ জন শিশু। এ মাসে মামলা হয়েছে ৩টি। সাতক্ষীরায় এক দুর্বৃত্ত প্রেমের প্রস্তাবে ব্যর্থ হয়ে নাজমা নামে এক তরুণীকে এসিড ছুড়ে মারে। এতে নাজমা ও তার ছোট ভাইয়ের শরীর ঝলসে যায়। অপর একটি ঘটনায় ত্রিশালে গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা কলেজ ছাত্রী আনোয়ারা বেগমের মুখমন্ডল এসিডে ঝলসে দিয়েছে। এ মাসে আরো একটি ঘটনায় এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ৭০ বছরের বৃদ্ধা নূরজাহান বেগম এবং তার নাতি ইব্রাহীম (২৭)। একই ঘটনায় সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেছে ইব্রাহীমের বড় ভাই সারোয়ার হোসেনকে।

এক নজরে ২০০২ সালে এসিড নিক্ষেপের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
এসিড নিক্ষেপ	২৪	১২	১৪	২১	১৭	৩০	২৪	২৫	২৭	৩৪	২২	৯	২৫৯

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০২ সালে মোট এসিড নিক্ষেপের ঘটনা গটেছে ২৫৯টি, এর শিকার হন ৩৭৯ জন। এর মধ্যে নারী ২৩৭ জন, পুরুষ ১০৯ জন এবং শিশু ৩৩ জন। উক্ত ঘটনায় এ সময় মামলা করা হয় ৭৬ টি এবং গ্রেফতার করা হয় ৯৪ জন আসামি। ২০০২ সালে অক্টোবর মাসে ৩৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ সংখ্যাটি বছরের অন্যান্য মাসের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক। উক্ত ৩৪টি ঘটনায় এ মাসে শিকার হন ৪০ জন নারী, পুরুষ ও শিশু। সর্বনিম্ন এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে ৯টি। ডিসেম্বর মাসে ৯টি ঘটনায় শিকার হন ২৮ জন।

এক নজরে ২০০৩ সালে এসিড নিক্ষেপের চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
এসিড নিক্ষেপ	১১	৯	১৪	১৪	১৯	২৬	২০	৩১	৩২	২১	২৯	১৫	২৪১

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৩ সালে ২৪১টি ঘটনায় ৩৪১ জন নারী, পুরুষ ও শিশু এসিড নিক্ষেরপর শিকার হন; এর মধ্যে নারী ২০৫ জন, পুরুষ ১১১ জন এবং শিশু ২৫ জন। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় এ সময় মামলা করা হয় ৮৩টি এবং গ্রেফতার হয় ৪৯ জন সন্ত্রাসীকে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে, ৩২ টি সবচেয়ে কম ঘটেছে ফেব্রুয়ারিতে ৯টি। ২০০৩ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় ৩৬ জনকে যাবজ্জীবন, ১৩ জনকে ফাঁসি এবং ৩১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেয়া হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বৃদ্ধির মূল কারণ এসিডের সহজলভ্যতা। দেশের অলিতে-গলিতে তেলের মতোই সস্তা এসিড। ১০ থেকে ১৫ টাকায় পাওয়া যায় এক পাউন্ড সালফিউরিক এসিড।

Dhaka University Institutional Repository

সেনসাস অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ (সিএমআই)-এর হিসাব অনুযায়ী দেশে ক্ষতিকারক সালফিউরিক এসিডের বার্ষিক ব্যবহার প্রায় এক লাখ মেট্রিক টন। আর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ব্যবহার প্রায় আট হাজার মেট্রিক টন। অথচ এই বিপুল পরিমাণ এসিড কোথায়, কিভাবে ব্যবহৃত হয় তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এসিড বিক্রি নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্প্রতি একটি আইন তৈরি করেছে; কিন্তু সেই আইনের কার্যকারিতা এখনো প্রমাণিত হয়নি। এসব কারণেই দিন দিন বাড়ছে এসিড হামলার ঘটনা বা এসিড সন্ত্রাস।

তাছাড়া এসিড হামলা বৃদ্ধির পিছনে অন্য যে বড় কারণটি কাজ করছে তা হলো-এ সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তি না হওয়া বা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা। অপরাধীর সাজা হচ্ছে না। নানা জটিলতায় পড়ে ঝিমিয়ে যাচ্ছে মামলাগুলো। অপরাধী গ্রেফতার না হবার কারণে মামলার বাদীপক্ষ বা এসিডদগ্ধরা বাড়িতে থাকতে পারছেন না। আর অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা না হবার কারণে এসিড নিক্ষেপের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। ফলে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও অপরাধীদের কোন শ্রদ্ধা আসছে না।

৪. সংবাদ পত্রে ডাকাতির ভয়াবহ চিত্র

প্রায় প্রতিদিনই প্রত্রিকার পাতা উল্টালে ডাকাতির খবর চোখে পড়ে। ডাকাতি সংঘঠিত হচ্ছে দেশের সর্বত্রই। মহানগরীর অভিজাত এলাকায় ভিক্ষুক ছদ্মবেশে বা কখনো কলিংবেল টিপে গৃহে প্রবেশ করে বাড়ির সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বা কখনো কখনো হাত-পা বেঁধে সর্বস্ব লুট করার খবর পত্রিকায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গৃহ ডাকাতির মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন বিশেষ করে লঞ্চ, ট্রেন, বাস ডাকাতির খবরও যাত্রীদের সার্বক্ষণিক ভীতির মধ্যে রাখে। নীচের চিত্র বর্তমান সময়কার দেশে ডাকাতির ভয়াবহতা নির্দেশ করে।

এক নজরে ১৯৯৯ সালে ডাকাতির চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ডাকাতি	২৭	২৯	৪২	৬০	৬৬	৫৫	৭৩	৭২	৬১	৬৭	৭০	৩৪	৬৫৬

জানুয়ারিঃ

এ-দেশে মোট ২৭টি ডাকাতি সংঘঠিত হয়। মেঘনায় লঞ্চ ডাকাতিকালে ৬টি রাইফেল লুট, বি-বাড়িয়ায় স্বর্ণের দোকান হতে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ও নোয়াপাড়াস্থ আকিজ জুট মিলে ১২টি রাইফেল ডাকাতির ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লায় ডাকাতদের হামলায় একজন নিহত হয়।

ফেব্রুয়ারিঃ

দেশে ডাকাতির ঘটনা ঘটে ২৯টি। চট্রগ্রাম বরযাত্রীবাহী গাড়ির বহরে হামলা করে ডাকাতরা ছয় লাখ টাকার মালামাল লুট করে। ঢাকায় সূত্রাপুরের এক বাসা হতে ডাকাতরা দিনে দুপুরে ৬ লক্ষাধিক টাকার মালামার নিয়ে যায়। চট্রগ্রামের মিরশরাই-এ পুলিশ পরিচয় দিয়ে ডাকাতি করেছে একদল ডাকাত। মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর থানার কেয়টখালীতে ডাকাতি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতের গুলিতে একজন নিহত হয়।

মার্চঃ

৪২টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি ডাকাতি সংঘঠিত হয়েছে রাজধানী ঢাকাতে ১৪টি। এছাড়া ফেনীতে ৪টি, কুষ্টিয়ায় ৩টি, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, মুন্সিগঞ্জ, চট্রগ্রামে ২টি করে ডাকাতি সংঘঠিত হয়। এসব ডাকাতিকালে মোট সাতজন নিহত হয়। ঢাকার কাফরুলে গণপিটুনিতে ১ ডাকাত নিহত হয়। ঢাকার কাঠালবাগান ও লালবাগে যথাক্রমে পাঁচলক্ষ টাকা মুল্যের মোবাইল ফোনসেট ডাকাতি। ঝিনাইদহে ডাকাতির সাথে পুলিশের সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে পাঁচ পুলিশকে আটক করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিলঃ

এ সারাদেশে মোট ৬০টি ডাকাতি সংঘঠিত হয়। সবেচেয়ে বেশি পরিমাণ ডাকাতি সংঘঠিত হয় রাজধানী শহর ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রামে। এ মাসে কলিংবেল টিপে কয়েকটি বাসায় ডাকাতি সংঘঠিত হয়। এছাড়া পটুয়াখালী, বরিশাল ও চাঁদপুরের নদীপথে ডাকাতি সংঘঠিত হয়।

মেঃ

দেশে ডাকাতি সংঘঠিত হয়েছে মোট ৬৬টি। এ মাসে কাঁপুরে দিনে দুপুরে বাস ডাকাতি ও পাবনায় নাইটকোচ ডাকাতি ছিল উল্লেখযোগ্য। মানিকগঞ্জে বাসা ভাড়া করার নাম করে বাসা দেখতে গিয়ে ডাকাতি ও একটি লঞ্চ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

জুনঃ

৫০টি ডাকাতির ঘটনার ঘটে। সবোর্চ্চসংখ্যক ১২টি ডাকাতি সংঘঠিত হয় রাজধানী ঢাকাতে। এ মাসে সিলেট ও নরসিংদিতে দুটি ট্রেন ডাকাতির ঘটনা ঘটে। গাজীপুরে ডাকাতিকালে গুলিতে একজন নিহত হয়েছে। সিলেটে পুলিশ পরিচয় দিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ মাসে ঢাকা-ভোলা রুটে লঞ্চ ডাকাতির ঘটনায় পুলিশের সংশ্লিষ্টতার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জুলাইঃ

সারাদেশে মোট ৭৩ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ২৬ টি ঘটনার মামলা হয়েছে। ৬ জন ডাকাত ও সাধারণ মানুষ এ সব ঘটনায় খুন হয়। লক্ষীপুরে ও বগুড়াতে যথাক্রমে ২ ও ১ জন ডাকাত গণপিটুনীতে নিহত হয়। শনিরআখড়ায় কুমিল্লাগামী যাত্রীবাহী বাস ডাকাতিকালে বাসের হেলপার ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। বগুড়ার নাইটকোচ ডাকাতিকালে ডাকাতের ছুরিকাঘাতে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীনের বাসা হতে ৬ লাখ টাকার মালামাল ডাকাতি হয়।

আগষ্টঃ

মোট ৭২টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ২৬টি ঘটনার মামলা দায়ের করার খবর পাওয়া যায়। চারজন ডাকাত গ্রেফতার হয় দুটি ঘটনায়। একজন ডাকাত ও ডাকাতের হাতে এক অন্তসত্ত্বা গৃহবধুসহ তিনজন খুন হয়। শান্তিনগরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তোফাজ্জল ইসলামের বাসভবনে ডাকাতি সংঘটিত হয়। রামগতিতে ১দিনে মেঘনা নদীতে ৭টি নৌডাকাতি সংঘটিত হয়। উখিয়ায় পুলিশ-রোহিঙ্গ বন্দুকযুদ্ধে ১ ডাকাত নিহত হয়। জয়পুরহাটে রেল স্টেশনে ডাকাতিকালে ডাকাতদল দুযাত্রীকে কুপিয়ে ৮০ হাজার টাকা লুট করে। মিরসরাই পল্লী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডাকাতরা তিন লাখ টাকার মালামাল লুট করে। ঝিনেদাহের কালিগঞ্জে ৬দিনে ৫ বাড়িতে ডাকাতি সংঘটিত হয়।

সেপ্টেম্বরঃ

৬১টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ২১টি ঘটনার মামলা হয়। ৪টি ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার সময় ৪ জন হত্যাকান্ডের শিকার হয়। পান্থপথে পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়কালে ১ ডাকাত নিহত হয়। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরা ট্রলারে ডাকাতি কালে ডাকাতরা ৩ জনকে হত্যা করে। নরসিংদীতে ডাকাতরা চালের গুদামের নৈশ প্রহরীকে খুন করে ৩৫০ বস্তা চাল লুট করে।

অক্টোবরঃ

মোট ৬৭টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার ২০টির তাৎক্ষণিক মামলা হয়েছে। ৬টি ঘটনার সাথে জড়িত ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাভারে ইলেকট্রনিক্স কারখানায় ডাকাতিকালে ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়। সাতকানিয়ায় ১০টি বাড়িতে গণডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাতরা ৮ লাখ টাকার মালামাল লুট করে। দৌলতপুরে ডাকাতিকালে গণপিটুনিতে ১ ডাকাত নিহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বরঃ

মোট ৭০ টি ডাকাতি সংঘটিত হয়। ৮টি ঘটনায় মোট ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বি বাড়িয়ায় বাস ডাকাতি হয় এবং গণপিটুনিতে ২ ডাকাতের মৃত্যু ঘটে। নয়াপল্টনে দিনেদুপুরে ডাকাতি সংঘটিত হয়। দৌলতদিয়াগামী যাত্রীবাহি লঞ্চ এম ভি সুজন ডাকাতি হয়। আরিচা সংলগ্ন পদ্মা-যমুনায় নৌ-ডাকাতি বৃদ্ধি পায় এবং ১৭ ঘন্টার ব্যবধানে ২টি ডাকাতি সংঘটিত হয়।

ডিসেম্বরঃ

সারাদেশে ৩৪ টি ডাকাতি সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার মাত্র ১১টির মামলা হয়েছে। পাঁচটি ঘটনার ১৭ জন ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়। ভালুকায় এক রাতে ২ বাড়িতে ডাকাতি, গোপালগঞ্জে বস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ হতে অর্ধ কোটি টাকা লুটে নেয় ডাকাতরা। চিমতমারীর সোনালী ব্যাংক হতে ডাকাতরা ৬ লাখ টাকা লুট করে।

এক নজরে ২০০০ সালে ডাকাতির ভয়াবহ চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ডাকাতি	১১২	৯৩	১৪০	১১৪	১০৩	৫০	৯৯	৭৩	৬২	৭৫	৫৬	৮৪	১০৬১

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে মোট ১১২টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনায় ৩৫টি মামলা হয় এবং ৫২ জন গ্রেফতার হয়। ভোলার মেঘনা নদীতে একই জায়গায় তিনটি মালবাহী জাহাজে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতরা মোট পাঁচ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। রাজধানীর নিউ এলিফ্যান্ট রোডের একটি বাড়ির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় একই সঙ্গে ডাকাতি হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ডাকাতরা ২৫০ ভরি স্বর্ণলঙ্কার ও নগদ টাকাসহ প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। নারায়নগঞ্জের আড়াই হাজারে ডাকাতের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে একজন। ১০ জানুয়ারি রাতে আড়াই হাজার থানার একটি বাড়িতে ডাকাতরা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ছয় জনকে আহত করে। এর মধ্যে একজনকে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়। ডাকাতরা নগদ টাকা সহ প্রায় ৮০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারিঃ

মোট ৯৩টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ৩৮টি ঘটনার মামলা হয়েছে। ডাকাতিকালে মোট ৮ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। ঝালকাঠিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ১ জন শ্রমিককে খুন করে ডাকাতি করা হয়। অন্যদিকে কটিয়াদীতে দৈনিক সংবাদের সংবাদদাতা প্রিয়লাল রায়ের সারের দোকানের বেড়া কেটে কর্মচারীকে খুন করে লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে ডাকাতরা।

মার্চঃ

বছরের সর্বাধিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে মার্চ মাসে। এমাসে ১৪০টি ডাকাতি সংঘটিত হয়। ৩৫টি ডাকাতি মামলা হয় ও ১৬টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৮৯ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। রূপগঞ্জ থানার ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির কাছে এক ব্যক্তিকে খুন করে ২ লাখ টাকার মালামাল লুট করে ডাকাতরা। বাঁশখালীতে ১১ দিনে ১৪টি ডাকাতি হয়, প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে কেউ কেউ ঘরে এসিড রাখছেন।

এপ্রিলঃ

সারাদেশে ১১৪টি ডাকাতি সংঘঠিত হয়। উক্ত ঘটনায় ৭ জন সাধারণ লোকসহ একজন ডাকাত মারা যায়। ২১টি ঘটনার মামলা হয়। ৮টি ঘটনায় ১৩ জন ডাকাত গ্রেফতার হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে চর খরিচা বাজারে গণ ডাকাতি হয়। মুখোশপরা ও হাফপ্যান্ট পরা সশস্ত্র ডাকাতরা বাজারের ৩০/৩৫টি দোকান লুট করে নগদ ৫ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে যায়। অতুল্লা থানার পাগলা মুন্সীখোলায় সরকার ও দলীয় সংসদ সদস্য হাজী মোহাম্মদ সেলিমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মদিনা ট্রেডিং কর্পোরেশনে ১৫ লাখ টাকা লুট হয়। দক্ষিণ সেলিমাবাদ এলাকায় মোঃ মতিনের বাসায় একদল ডাকাত মাইক্রোবাসযোগে এসে ঘরে ঢুকে একটি শিশুকে জিম্মি করে অস্ত্রের মুখে ঘরের লোকজনকে ভয় দেখিয়ে ৪০ ভরি স্বর্ণ ও ৯৭ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মেঃ

এ মাসে সারাদেশে ১০৩টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতিকালে ৫ জন হত্যার শিকার হয়। ৪৬টি ডাকাতির মামলা হয়। ৯টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

জুনঃ

এ মাসে ৫০টি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ১৪টি মামলা হয়। ৪টি ঘটনায় ১০ জন গ্রেফতার হয় এবং ১টি ঘটনায় ১ জন সাধারণ লোক হত্যার শিকার হয়। এ মাসে ১৭টি ডাকাতির ঘটনায় ১৫৪জন আহত হয়। জগন্নাথপুর উপজেলার ইছকন্দর আলীর বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতরা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ২ লাখ টাকার মালামাল লুট করে। পালানোর সময় গৃহকর্তা চিৎকার দিলে ডাকাতরা তাকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলেই ইছকন্দর আলী (৮৫) মারা যায়। এমাসে যমুনায় একটি বড় নৌ-ডাকাতি হয়। ডাকাতরা ৫ লক্ষাধিক টাকা লুট করে এবং দু'জন ব্যবসায়ীকে নদীতে নিক্ষেপ করে। আব্দুস সামাদ (৫৫) নামে এক ব্যবসায়ী জানান, মুখোশপরা ডাকাতদের হাতে রামদা, কিরিচ ও বন্দুক ছিল।

জুলাইঃ

জুলাই মাসে ৯৯টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনায় ৫ জন সাধারণ লোক প্রাণ হারায়। ২৫টি ঘটনার মামলা হয় এবং ৭টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ২৩ জনকে গ্রেফতার করে।

আগস্টঃ

৭৩টি ডাকাতির ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়। ১০৩ জন সাধারণ মানুষ ও ৫ জন ডাকাত আহত হয়। এই ৫ জন ডাকাতসহ ২৮টি মামলায় গ্রেফতার হয় ৪৪ জন। মাদারীপুর রাজৈরের পল্লীতে ডাকাতি শেষে ডাকাতরা এক কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। ৪ আগষ্ট শুক্রবার রূপগঞ্জ থানার কর্ণগোপ এলাকায় গভীর রাতে রাস্তায় গাছ ফেলে ব্যারিকেট দিয়ে ৮/৯টি যানবাহনে গণডাকাতি হয়। এ সময় ডাকাতদের ছুরিকাঘাতে ২০ জন আহত হয়। এমাসে রাজধানীতে বেশ কিছু কলিং বেল টিপে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

সেপ্টেম্বরঃ

সেপ্টেম্বর মাসে ৬২ টি ডাকাতির ঘটনায় ৪৬ জন শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১ জন ডাকাতসহ ৫ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। উক্ত ঘটনায় আহত ৪১ জন। এসব ঘটনার ২৫টির মামলা হয়। ১৬টি ডাকাতির ঘটনায় ৭২ জন ডাকাত গ্রেফতার হয়।

অক্টোবরঃ

সারাদেশে ৭৫টি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এমাসে ২৯টি মামলা হয়েছে এবং ১১টি ঘটনায় ৩৬ জন ডাকাত গ্রেফতার হয়েছে। কাঁচপুর ও নরসিংদী রুটে। প্রায় প্রতিরাতে দেশী-বিদেশী অস্ত্র নিয়ে কোন না কোন পরিবহনে ডাকাত দল হানা দিচ্ছে। রাজধানীতে কলাপসিবল গেট ভেঙ্গে অথবা জানালার গ্রিল কেটে, দরজা ভেঙ্গে বাড়ির সদস্যদের দড়ি দিয়ে বেঁধে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র এবং টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে ফাঁকা গুলি করতে করতে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। রাজধানীর খিলগাঁও থানায় মাদারটেকে একই রাতে পর পর ৪টি বাড়িতে ডাকাতি করে।

নভেম্বরঃ

সারাদেশে ৫৬টি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতদের অস্ত্রের আঘাতে ৩৬ জন আহত ও ৪ জন নিহত হয়েছে। উক্ত ঘটনায় ১২টি মামলা হয়েছে ও ১৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। সাতক্ষীরার গাজিরহাটে ডাকাতের বোমার আঘাতে গৃহকর্তা ও তার স্ত্রীসহ ৫ জন আহত হয়েছে। ডাকাতদল নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে। এ মাসে চট্রগ্রামের চন্দনাইশের বৈলতলা ইউনিয়নের ইউনুছ মার্কেটে গণডাকাতি সংঘটিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বরঃ

৮৪টি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতদের হাতে ১২০ জন মানুষ আহত ও ৫জন নিহত হয়েছে। এমাসে ২২টি ডাকাতির মামলা হয়েছে। ১২টি ঘটনায় ২৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। কিশোরগঞ্জের নিকলী সড়কে প্রায় প্রতিরাতেই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি চলছে। ডাকাতদের ভয়ে উক্ত সড়ক সন্ধ্যার পর জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। এক সপ্তাহে মেঘনা নদী ও সাগর মোহনায় ৫০টির বেশি ট্রলার ডাকাতি হয়েছে। এতে করে জেলেরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। গোটা মেঘনা নদী ও সাগর মোহনা এখন কার্যত জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে।

এক নজরে ২০০১ সালে ডাকাতির ভয়াবহ চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ডাকাতি	২৩৩	১৩৮	১২৯	২২১	১৩১	৬০	৯২	১৫৮	১০৪	৪২৬	২২১	২৬৫	২১৭৮

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে ১০০টি ডাকাতি সংঘটিত হয়। উক্ত ঘটনায় ৪ জন সাধারণ মানুষ মৃত্যু বরণ করে এবং ২৩৩ জন আহত হয়। ৩৫টি মামলা হয় এবং ৭ জন গ্রেফতার হয়। গাজীপুরে মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমিতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। ডাকাতদের অস্ত্রের আঘাতে মহিলাসহ সাতজন আহত হয়। ডাকাতরা প্রায় ২ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারিঃ

৯৮ টি ডাকাতি সংঘটিত হয় এমাসে। এতে শিকার হয় ১৩৮ জন। তার মধ্যে ১৩৪ জন সাধারণ মানুষ ডাকাতের হাতে আক্রমণের শিকার হয়ে আহত হয় এবং ৪ জন নিহত হয়। ১ জন ডাকাতের গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়। ২৬টি মামলা হয় এবং ৩১ জন ডাকাত গ্রেফতার হয়। বরিশালে এক রাতে তিন বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা গৃহকর্তাসহ ৩ জনকে কুপিয়ে জখম করেছে। এমাসে ফেনীতে পূবালী ব্যাংকের স্ট্রং রুম ভেঙ্গে ২৪ লাখ টাকা ডাকাতি হয়েছে।

মার্চঃ

সারাদেশে ৮৫টি ডাকাতি সংঘটিত হয়। এতে ডাকাতদের অস্ত্রের আঘাতে ১২০ জন সাধারণ মানুষ আহত হয় এবং ৯ জন নিহত হয়। ১ জন ডাকাত প্রতিপক্ষের শিকার হয়ে মারা যায়। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে ২৪টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ১০০ জন। রাজধানীর খিলগাঁও-এ শামসুল ইসলাম ভুঁইয়া নামে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘঠিত হয়। ডাকাতদল বাড়ির সবাইকে হাত পা বেঁধে প্রায় দু'শ ভরি সোনার অলংকার ও নগদ দেড় লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

এপ্রিলঃ

১২৩ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতিকালে ২০১ জন সাধারণ মানুষ আহত এবং ২০ জন নিহত হয়। এছাড়া ৫ জন ডাকাত আহত ও ১২ জন নিহত হয়েছে। এ ব্যাপারে ৩১ টি মামলা হয়েছে এবং ৭১ জন গ্রেফতার হয়েছে। চট্টগ্রাম নগরীর মেহেদীবাগ গোলপাহাড়ে একটি ভবনের দুটি ফ্ল্যাটে একযোগে ডাকাতি হয়েছে। একটি ফ্ল্যাটে ডাকাতরা নির্মমভাবে এক চিকিৎসককে খুন করে। পুরনো ঢাকার নবাব কাটরা এলাকার একটি বাসায় ডাকাতিকালে বাড়ির সবাইকে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় সাড়ে ৬ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মেঃ

১৭৬ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে শিকার হয়েছে ১৩১ জন। এব্যাপারে ৪৩ টি মামলা হয়েছে এবং ১৭৯ জন গ্রেফতার হয়েছে। ঢাকা বেনাপোলগামী সোহাগ পরিবহনের একটি এসি কোচে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, বাসটির চালকের সহায়তায় ডাকাতি হয়েছে। ২২ জন যাত্রীকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করেছে এই পরিবহন প্রতিষ্ঠানটি। পাঁচজন ডাকাত যাত্রীদের মারধর করে এবং তাদের ১০ লাখ টাকা কেড়ে নিয়ে যায়।

জুনঃ

সারাদেশে ৬৩টি ডাকাতির ঘটনায় শিকার হয় ৬০ জন। উক্ত ঘটনায় ১ জন ডাকাতসহ নিহত হয়েছে মোট ১১ জন। এমাসে ডাকাতির ঘটনায় মামলা হয়েছে ১২টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৪৯ জন। ৩ জুন রোববার রাত সাড়ে ৯ টায় ৬ জন সশস্ত্র ডাকাত শ্যামলীর পিসিকালচার সড়কে এক বাড়িতে ঢুকে ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ আড়াই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ২৪ জুন রাজধানীর কাফরুলে সহকারী সচিবের বাসায় ডাকাতি হয়। ডাকাতরা দরজার ছিটকিনি ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে তারা নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কারসহ দুই লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে মামলা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

জুলাইঃ

সারাদেশে ১০৮ টি ডাকাতির ঘটনায় শিকার হয়েছে ৯২ জন। উক্ত ঘটনায় মামলা হয়েছে ২৩ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৯৯ জন। চাঁদপুর-কুমিল্লা মহাসড়কে ৩ জুলাই রাতে চাঁদপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। এ সময় ডাকাতদের হামলায় চালকসহ ৫ জন আহত হয় এবং ডাকাতরা নগদ অর্থসহ প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নেয়। ফরিদপুর শহরে হাজী শরীয়তুল্লা বাজারে ১০ জুলাই মঙ্গলবার রাত পৌনে আটটায় এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়। সশস্ত্র ডাকাতরা একটি হলুদ-মরিচের আড়ত ও দুটি ডিমের আড়তে হামলা চালিয়ে নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

আগস্টঃ

৭৪ টি ডাকাতির ঘটনায় সারাদেশে শিকার হয়েছে ১৫৮ জন। উক্ত ঘটনায় মামলা হয়েছে ২৪ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৫০ জন। ডাকাতদের হাতে আহত হয়েছে ৭১ জন এবং নিহত হয়েছে ৫ জন। যমুনা নদীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুমুয়ার চরে ১৩ আগস্ট নৌ-ডাকাতদের গুলিতে ভূঞাপুর নৌ-ফাঁড়ির এক কনস্টেবল নিহত ও পুলিশের গুলিতে দুই নৌ-ডাকাত আহত হয়েছে। পুলিশ জানায়, যমুনায় নিয়মিত টহলের অংশ হিসেবে এক হাবিলদারের নেতৃত্ব ৫ সদস্যের ভূঞাপুর নৌ-ফাঁড়ির একটি টহল দলের সঙ্গে নৌ-ডাকাত ও পুলিশের গুলি বিনিময় হয়। এ সময় পুলিশের গুলিতে দু'ডাকাত আহত হয়। ডাকাতদের গুলিতে স্পিড বোটের ড্রাইভার কনস্টেবল শাহ আলম (২৭) গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়।

সেপ্টেম্বরঃ

সারা দেশে ৩৫ টি ডাকাতির ঘটনায় শিকার হয়েছে ১০৪ জন। উক্ত ঘটনায় মামলা করা হয়েছে ১১ টি এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ১৮ জন। ১ সেপ্টেম্বর রাত তিনটায় ঢাকা থেকে চাঁপাই নবাবগঞ্জগামী নৈশ কোচ মডার্ন এক্সপ্রেসে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাতরা যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করার সময় ছুরিকাঘাত করে এক যাত্রীতে হত্যা করে। ডাকাতদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মহিলাসহ ১০ জন আহত হয়।

নির্বাচনী প্রচারণার নামে পুরনো ঢাকার কোতয়ালী এলাকায় ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে ২ জন মহিলাসহ ৭ জন সশস্ত্র ডাকাত ঢুকে পড়ে। ডাকাতরা পরিবারের সবাইকে জিম্মি করে নগদ টাকা ও সোনাসহ প্রায় তিন লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবরঃ

সারাদেশে ১১১ টি ডাকাতির ঘটনায় শিকার হয়েছে ৪২৬ জন। ডাকাতদের হাতে এ মাসে নিহত হয়েছে ৮ জন সাধারণ ব্যক্তি। এ মাসে উক্ত ঘটনায় মামলা হয়েছে ৩১ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৯৯ জন। রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনে ৫ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদীপ জুয়েলার্স নামে এক সোনার দোকানে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা ১৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, রূপা, নগদ টাকা নিয়ে নির্বিঘ্নে মাইক্রোবাসে করে চলে যায়।

নভেম্বরঃ

১০০ টি ডাকাতির ঘটনায় শিকার হয়েছে ২২১ জন সাধারণ মানুষ। উক্ত ঘটনায় ডাকাতদের হাতে ৮৭ জন আহত এবং ৭ জন নিহত হয়েছে। ডাকাতি ঘটনায় মামলা করা হয় ৩০ টি এবং গ্রেফতার করা হয় ৮৮ জন আসামিকে। সেহরি খেতে লোক জাগানোর নামে ডাকাত আসে রাজধানীর একটি বাড়িতে। অস্ত্রের মুখে তারা লুট করে নেয় ৫ লাখ টাকার মালামাল। পরে পুলিশ এসে সন্দেহভাজন এক ডাকাতকে পাকড়াও করে। ১৯ নভেম্বর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে রায়পুরা থানার পুলিশ বক্সের সামনে যাত্রীবাহী বাসে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। যাত্রীবেশী ডাকাতের চাইনিজ কুড়াল ও কিরিচের আঘাতে চালক, সুপারভাইজারসহ ৭ যাত্রী আহত হয়। ডাকাতরাযাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ও মালামাল নিয়ে চম্পট দেয়।

ডিসেম্বরঃ

১২০ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, এতে শিকার হয়েছে ২৬৫ জন। ডাকাতদের হাতে এ মাসে আহত হয়েছে ১৭২ জন এবং নিহত হয়েছে ২ জন। এ ব্যাপারে ৩৩ টি মামলা হয়েছে এবং ১০৮ জন ডাকাত গ্রেফতার হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর রাতে ফতুল্লা থানার দুটি বাড়ির পাঁচটি ফ্ল্যাটে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। এর মধ্যে দু'জন পুলিশ সদস্যের ফ্ল্যাটও রয়েছে। ডাকাতরা লুটে নিয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল। যশোরের বানিজ্যিক শহর নওয়াপাড়ায় ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ একটি সারের গোডাউনের নাইট গার্ডকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তালা ভেঙ্গে ১২ লাখ টাকার সার লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাতরা। লুট করার পর তারা নতুন তালা লাগিয়ে দেয় এবং যাওয়ার সময় নাইট গার্ডকে ব্যাপারটি গোপন রাখার জন্য ১ হাজার টাকা দেয়। ঘটনা ফাঁস করলে ডাকাতরা তাকে জীবন নাশের ও হুমকি দেয়।

এক নজরে ২০০২ সালে ডাকাতির চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ডাকাতি	১১৮	১০৯	১০৬	৮৪	১৩৪	১২৭	১০৫	৮৮	১২৭	১১৪	১৫৩	৮৬	১৩৫১

১৩৫১টি ডাকাতির ঘটনায় ২০০২ সালে শিকার হন মোট ৪৫১৫ জন। ডাকাতদের হাতে এ সময়ে নিহত হন ১১৮ জন সাধারণ মানুষ এবং গণপিটুনিতে নিহত হন ৩১ জন ডাকাত। ডাকাতিকালে সংঘর্ষে আহত হন ২১৮৮ জন। উক্ত সময় ডাকাতদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় ৩০৩ টি এবং গ্রেফতার করা হয় ১১০১ জন ডাকাতকে।

২০০২ সালে সর্বাধিক ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয় ১৩৪টি মে মাসে। উক্ত ১৩৪টি ঘটনায় শিকার হন ২৭৬ জন সাধারণ মানুষ। গত বছর ডাকাতির সর্বনিম্ন ঘটনা ছিল ৮৪ টি। এই ৮৪ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে এপ্রিল মাসে।

এক নজরে ২০০৩ সালে ডাকাতির চিত্র

বিষয়ঃ	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ডাকাতি	১৪৪	১২৯	১৫৩	১১৯	১৫৯	১৪৮	১৩৮	১৪১	১৭১	৬৫	৯৩	১১৬	১৫৭৬

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৩ সালে ১৫৭৬টি ডাকাতি ঘটনায় শিকার হন ৫২৮৪ জন। এসময় মামলা করা হয় ৩৩৬টি এবং গ্রেফতার করা হয় ১০০৩ জন ডাকাতকে। ডাকাতি ঘটনায় এ সময় আহত হন ২৬২৩ জন এবং নিহত হন ১৫৪ জন সাধারণ মানুষ। গণপিটুনিতে নিহত হয় ৬১ জন। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয় সেপ্টেম্বর মাসে, ১৭১টি। সবচেয়ে কম ডাকাতির ঘটনা ঘটে অক্টোবর মাসে, ৬৫টি। জুন মাসে ঢাকার রামপুরার পূবালী ব্যাংকে একটি সশস্ত্র ডাকাত দল অস্ত্রের মুখে ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের জিম্মি করে প্রায় ৭ লক্ষাধিক নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

বগুড়ার শেরপুরের জামালপুর গ্রামে একরাতে গ্রাম ঘেরাও করে ৭ বাড়িতে ডাকাতি হয়; এক সাথে একাধিক বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ২০০৩ সালে আর কোথাও ঘটেনি। জানুয়ারি মাসে সাভারে একই রাতে ১৬টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ঢাকার শান্তিবাগে এক বাসার সবাইকে জিম্মি করে ডাকাতরা ৮ লাখ টাকার মালামাল লুট করে; তেজগাঁও এলাকার একটি জুয়েলারী দোকানে এবং ধানমন্ডি এলাকায় একটি ঘড়ির দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ২০০৩ সালে ডাকাতির ঘটনায় ৪৫ জনকে যাবতজীবন, ১ জনকে ফাঁসি এবং ২৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের জেল দেয়া হয়।

৫. সংবাদ পত্রে ছিনতাই-এর ভয়াবহ চিত্র

ছিনতাই শব্দটা শুনলেই আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হই, ভীত থাকি সবসময়। রাজধানী ঢাকাতে প্রায়শই বড় ধরনের ছিনতাই সংঘঠিত হয়। ঢাকার বাইরে চট্রগ্রাম ও খুলনা মহানগরীর কিছু ছিনতাই-এর খবর পত্রিকায় পাওয়া যায়। তবে সংঘঠিত ঘটনার খুব কম সংখ্যক খবরই পত্রিকায় আসে। ছিনতাই-এর প্রধানতম শিকার হন নারীরা। ব্যবসায়ীরাও অনেক সময় ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন। ছিনতাইকারীরা ব্যবসায়ীদের বা ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনকারী বা ব্যাংকে টাকা জমাদানকারীদের টার্গেট নিয়ে তাদের কাছ হতে পরিকল্পিতভাবে ছিনতাই করে থাকে।

এক নজরে ১৯৯৯ সালে ছিনতাই'র চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ছিনতাই	১০	১৩	৯	২৩	২৫	২৫	২৪	৪৮	২৫	৬১	৫৩	৫৭	৩৭৩

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে ১০টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর মতিঝিলে এক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ছয় লাখ টাকা ছিনতাই এবং চট্রগ্রামে অন্য এক গার্মেন্টস-এর লাখ টাকা ছিনতাই-এর ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য। বেনাপোল বাজারে পাঁচলাখ টাকা ছিনতাই এবং কুষ্টিয়ায় এক ভিক্ষুকের কম্বল ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে।

ফেব্রুয়ারিঃ

সারাদেশে ১৩টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। সোনালী ব্যাংকে মতিঝিল শাখার কাউন্টার হতে জিএমজি এয়ারলাইন্সের সোয়া লাখ টাকা ছিনতাই হয়। চট্রগ্রামে পুলিশ সদর দপ্তরের কাছ হতে এক ভেন্ডারকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চার লাখ টাকা ছিনতাই করা হয়। চাঁদপুরে এক জাপানী গবেষকের কাছ হতে ৪৫ হাজার টাকার সমমূল্যের বিদেশী মুদ্রা ছিনতাই হয়।

মার্চঃ

মোট ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে ৯টি। সবচেয়ে বেশি ৫টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে ঢাকাতে। ঢাকায় ১দিনে চারটি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে। এরমধ্যে ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউ-এ পুলিশ কর্তৃক ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। ফেনীতে সংঘঠিত দুটি ছিনতাই-এর খবর পত্রিকায় আসে।

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিলঃ

সারাদেশে ২৩টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ ছিনতাই সংঘঠিত হয় রাজধানী ঢাকাতে এবং মহানগরী খুলনাতে।

মেঃ

ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে ২৫টি। এরমধ্যে কুষ্টিয়া ও খুলনায় দুই ব্যবসায়ীর নিকট হতে যথাক্রমে পাঁচ লাখ ও সাড়ে তিন লাখ টাকা এবং ময়মনসিংহে সিটি ব্যাংকের এক ট্রাঙ্ক টাকা ও রাইফেল লুটের ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য। তেজগাঁও-এ ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাতে করে ৪ লাখ টাকা ছিনতাই হয়।

জুনঃ

২৫টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। রাজধানী ঢাকাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক নয়টি ছিনতাই এবং চট্রগ্রামে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচটি ছিনতাই সংঘঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় দিনে-দুপুরে এক ব্যবসায়ীর কাছ হতে এক লাখ ৬৬ হাজার টাকা ছিনতাই হয়। রাজধানীর বংশালে প্রকাশ্য দিবালোকে ছিনতাইকারীরা এক মহিলার কাছ হতে তিন লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। চট্রগ্রামের মুরাদপুরে পুলিশের সামনে হতে সাত লাখ টাকা ছিনতাই করে অস্ত্রধারীরা।

জুলাইঃ

২৪টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। ১২টি ঘটনার মামলা হয়েছে। এবং সংশ্লিষ্ট ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে। এ মাসে ছিনতাইকারীদের হাতে ৩ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। পুরান ঢাকার বাবুবাজারের এক ব্যবসায়ীর কাছ হতে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই হয়। খুলনায় ব্যবসায়ীকে গুলি করে দশ লাখ টাকা ছিনতাই হয়। রাজশাহীগামী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনের দু'জন মহিলা যাত্রীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাইকালে ছিনতাইকারীর ধাক্কায় চলন্ত ট্রেন হতে পড়ে দু'জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। যশোরে মালিককে খুন করে মোটরসাইকেল ছিনতাই হয়।

আগস্টঃ

মোট ৪৮টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে। ১৭টি ঘটনার মামলা হলেও অভিযুক্তি গ্রেফতার হয়েছে ৪টি ঘটনার ৮ জন। বাগেরহাটে ছিনতাইকারীরা গ্রামীণ ব্যাংকের এক কর্মচারীকে হত্যা করে। শালিখায় ওসি পরিচয় দিয়ে মোটর সাইকেল ছিনতাই হয়। বেগমগঞ্জে অগ্রণী ব্যাংকের ছয় লাখ টাকা ছিনতাইকালে ম্যানেজারসহ তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়। খুলনায় ২৪ ঘন্টায় ৫টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটে।

সেপ্টেম্বরঃ

মোট ২৫টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ৪টি ঘটনার মামলা হয় এবং ৩টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৪ জন কথিত ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয়। বাগেরহাটে ড্রাইভার ও হেলপারকে ছুরিকাঘাত করে মাইক্রোবাস ছিনতাই, ইনডিপেন্ডেন্টের সাংবাদিকের টাকা ও কাগজপত্র ছিনতাই এবং চট্রগ্রামে পুলিশ সার্জেন্টকে পিটিয়ে মোটর সাইকেল ও পিস্তল ছিনতাই। এছাড়া সাবেক সেনা প্রধান মাহবুবুর রহমানের হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ ছিনতাই-এর মতো ঘটনা ঘটে।

অক্টোবরঃ

সর্বমোট ৬১ টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাসমূহের ৭টির মামলা হওয়ার খবর পাওয়া যায় এবং ৮ টি ঘটনার সাথে জড়িত ১৮ জনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। চট্রগ্রামে গাড়ি ছিনতাইকালে ছিনতাইকারী হাতে নাতে গ্রেফতার হয়। কাপাসিয়ায় ব্যবসায়ীর দেড় লাখ টাকা ছিনতাই হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বরঃ

৫৩ টি ছিনতাই সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে ১২টির তাৎক্ষণিক মামলা হওয়ায় খবর পাওয়া যায়। ছিনতাই-এ জড়িত থাকার দায়ে ১১টি ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকায় সাংবাদিকদের উপর হামলা ও ক্যামেরা ছিনতাই। চট্টগ্রামের ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজারের কাছ হতে প্রায় ২ লাখ টাকা ছিনতাই হয়। এছাড়া ঢাকায় ছিনতাইকারীদের হাতে মারা যায় ডা. মোশারেফ হোসেন।

ডিসেম্বরঃ

৫৭ টি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার ৪টির মামলা হয়েছে। চট্টগ্রামে ছিনতাইকারীর গুলিতে এক পুলিশ সার্জেন্ট আহত হয়। রাজধানীর টিকাটুলি এলাকায় ব্যবসায়ীর কাছ হতে ৪ লাখ টাকা ছিনতাই হয়। মুন্সিগঞ্জে অস্ত্র ও লুণ্ঠিত অস্ত্রসহ ৫ ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়।

এক নজরে ২০০০ সালে ছিনতাই'র চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ছিনতাই	৪২	৩০	৪৬	৪৪	৩২	২৪	২৫	২৬	৪৯	২৬	৩৬	৫৪	৪৩৪

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে ৪২টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ১৪টি মামলা হয়েছে এবং ৩০ জন গ্রেফতার হয়েছে। এমাসে ছিনতাই এর ঘটনার মধ্যে পত্র-পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি কভারেজ পায় ছিনতাইকারীদের হাতে যুগ্মসচিব নিকুঞ্জ বিহারী নাথের খুন হওয়ার ঘটনা। ১১ জানুয়ারি মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঐ ঘটনা ঘটে। এমাসে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় দুই ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলে এক গৃহবধু। ১৩ জানুয়ারি মালিবাগ ডিআইটি রোডে শিরিন আক্তার নামে ঐ মহিলার কাছ থেকে ছিনতাইকারীরা ৫০ হাজার টাকা ও সোনার চেন নিয়ে পালানোর সময় তিনি ছিনতাইকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আশেপাশে লোকজনের সহায়তায় তাদের ধরে ফেলেন।

ফেব্রুয়ারিঃ

৩০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ৮টি ঘটনার মামলা হয়েছে এবং ১১ জন ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়েছে। ৭ ব্যক্তি খুন হয় ছিনতাইকারীদের হাতে। কেরানীগঞ্জে ২ জন, চট্টগ্রামে ৩ জন ছিনতাইকারী গণপিটুনিতে মারা গেছে। এমাসে যশোরে অর্ধশতাধিক গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনায় ৭ জন গাড়িচালক খুন হয়েছে।

মার্চঃ

৪৬ টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ১৬টি ঘটনার মামলা হয়েছে এবং ১০টি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার দায়ে ২৭ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। শেরপুরে একদল দুর্বৃত্ত গরু বোঝাই ট্রাক ছিনতাই করে। রাজধানীর তেজগাঁও থানায় ফজলুর রহমানের দুপায়ের হাটুতে গুলি করে ৪০ হাজার টাকা ছিনতাই করে। ভোলার দৌলতখানে ৬ সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করে ক্যামেরা ছিনতাই করে ছিনতাইকারীরা। চট্টগ্রামের রাউজানে বিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে নববধুর অলংকার ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা।

এপ্রিলঃ

সারাদেশে ৪৪ টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ১৩টি মামলা হয় এবং ২টি ঘটনায় ২ জন গ্রেফতার হয়। মিরপুর মাজার এলাকা থেকে তিন পুলিশ এক পরিবহন ব্যবসায়ীর কাছে থেকে সাড়ে ১১ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। ব্যবসায়ী এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করলেও থানা তা মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে আপোষের চেষ্টা চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

মেঃ

মোট ৩২টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ১১টি ঘটনার মামলা হয় এবং ৩টি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার দায়ে ৮ জনকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়। বর্তমানে অধিকাংশ ছিনতাইয়ের ঘটনা পুলিশের সহায়তায় ঘটে থাকে। পুলিশের সামনে ছিনতাই'র ঘটনা ঘটলেও পুলিশ কোনো সাহায্য করে না।

জুনঃ

মোট ২৪টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ৮টি ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং দুটি ঘটনায় জড়িত থাকায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটি ঘটনায় দু'জন ছিনতাইকারী হত্যার শিকার হয়েছে। মৌলভীবাজারে ছালককে খুন করে গাড়ী ছিনতাইয়ের ঘটনা এবং এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

জুলাইঃ

২৫টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৯টি। ৩টি ঘটনায় ৬ জন ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়েছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ১৫টি গ্রুপ ২২ পয়েন্ট টার্গেট করে প্রতিদিন একের পর এক ছিনতাই করে যাচ্ছে।

আগস্টঃ

সারাদেশে ২৬টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকালে দু'জন সাধারণ লোকের মৃত্যু হয় এবং ৮টি ঘটনার মামলা হয়। এই মামলার প্রেক্ষিতে ১২ জন গ্রেফতার হয়। উক্ত ঘটনায় ৫ জন ছিনতাইকারী ও ৪ জন সাধারণ মানুষ আহত হয়। জামালপুর জেলার ইসলামপুরে ২২ আগষ্ট উপজেলা সদরে আজাদ মার্কেটের মুক্তি জুয়েলারি দোকানে এক ব্যক্তি এসে স্বর্ণের চেইন কিনতে চাইলে মালিক গোপাল সেন তাকে তিনটি চেইন দেখায়। চোখের পলকে ঐ ব্যক্তি চেইন তিনটি নিয়ে দৌড়ে জনতার ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মতিঝিল ইসলামী ব্যাংক শাখা থেকে গার্মেন্টস ফেক্টরীর কর্মচারীদের বেতনের ২৮ লাখ টাকা তুলে মোহাম্মদপুরের বাবর রোড যাবার পথে ছিনতাই হয়।

সেপ্টেম্বরঃ

৪৯টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২০ জন মানুষ শিকার হয়। উল্লেখিত ছিনতাইগুলোর মধ্যে ১৩টির মামলা হয়। ৭টি ঘটনায় ১০ ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়। গণপিটুনীতে একজন প্রাণ হারায়।

অক্টোবরঃ

সারাদেশে ২৬টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাইকারীদের আঘাত সাধারণ মানুষ নিহত ১ জন এবং আহত হয়েছে ১৩ জন। ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৬টি এবং ৪টি ঘটনায় ১২ জন ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়েছে।

নভেম্বরঃ

সারাদেশে ৩৬টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতদের অস্ত্রের আঘাতে ২ জন আহত ও ৫ জন নিহত হয়েছে। ১২টি ছিনতাই মামলা হয়েছে এবং ৫টি ঘটনায় ৭ জন গ্রেফতার হয়েছে। চট্টগ্রামে জনবহুল রাস্তা অবরোধ করে একমি ল্যাবরেটরিজের সাড়ে আট লাখ টাকা ছিনতাই করেছে সন্ত্রাসীরা। চট্টগ্রাম ও আর নিজাম রোডে একমির কর্মকর্তার গাড়ীর গতি রোধ করে ৭/৮ জনের সন্ত্রাসী দল মাইকক্রোবাস লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে দ্রুত গাড়ীতে রক্ষিত আট লক্ষ টাকা নিয়ে স্থান ত্যাগ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বরঃ

৫৪টি ছিনতাই সংঘটিত হয়েছে। এতে ১৭ জন সাধারণ মানুষ ছিনতাইকারীর হাতে আহত হয় এবং ২ জন নিহত হয়েছে। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত ছিনতাইকারীদের মধ্যে ৪ জন নিহত হয়েছে। রাজশাহী জেলার চারঘাচ উপজেলার মীরগঞ্জ সীমান্তে এবং বিডিআর সদস্য কর্তৃক কথিত গরু ব্যবসায়ীর ৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত বিডিআর সদস্য (নং ৫৫৬১৬) রফিককে রাজশাহী ব্যাটেলিয়ন সদরে ক্লোজড করা হয়েছে।

এক নজরে ২০০১ সালে ছিনতাই'র চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ছিনতাই	৩৮	১৭	৩২	৩৯	৪১	৪০	১৪৪	১৪৫	৪৪	৯১	৩৪	১০১	৭৬৬

জানুয়ারিঃ

সারাদেশে ৩৮টি ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘঠিত হয়। ছিনতাইকালে ১ জন সাধারণ মানুষ নিহত ও ১২ জন আহত হয়। ৯টি ঘটনায় মামলা হয় এবং ১৭ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ধামরাই থানা গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তাকে দিনে দুপুরে ছুরিকাঘাত করে এক দল ছিনতাইকারী ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। অপর একটি ঘটনায় রামপুরায় ছুরিকাঘাত করে এক ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে ছিনতাইকারী।

ফেব্রুয়ারিঃ

ছিনতাইয়ের ৩৭টি ঘটনায় ১২ জন শিকার হয়। এদের মধ্যে ৫ জন নিহত হয় ছিনতাইকারীর অস্ত্রের আঘাতে। ছিনতাইকালে ২ জন ছিনতাইকারী আহত ও ১ জন নিহত হয় গণপিটুনিতে। ৮টি মামলা হয় এবং ৫টি ঘটনায় ২০ জন গ্রেফতার হয়। গোয়েন্দা পুলিশ ফতুল্লা নতুন জেলখানা এলাকা থেকে দুটি বড় আকারের ছুরিসহ ৮ ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে। পকেটে গার্মেন্টেসের কার্ড রেখে গার্মেন্টেসকর্মী পরিচয় দিয়ে এরা পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে আসছিল।

মার্চঃ

সারাদেশে ৮২ টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এতে ছিনতাইকারীদের অস্ত্রের আঘাতে ৩০ জন সাধারণ মানুষ আহত হয় এবং ২ জন নিহত হয়। এ ব্যাপারে ১২টি মামলা হয়েছে। ১৪টি ঘটনায় ৪১ জন ছিনতাইকারী গ্রেফতার হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক রাতে ৩২টি ছিনতাই ঘটনায় শহর জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানীর হাতিরপুলে ছিনতাইকারীদের চাপাতির কোপে ইকবাল হোসেন (২৫) নামে এক গার্মেন্টস কর্মী নিহত হয়।

এপ্রিলঃ

সারাদেশে ৫৩টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এতে সাধারণ মানুষ শিকার হয় ৩৯ জন। এ ব্যাপারে ১৪টি মামলা হয়েছে এবং ২৯ জন গ্রেফতার হয়েছে। চট্টগ্রামে হাতেনাতে ধরতে গিয়ে সশস্ত্র ছিনতাইকারীদের গুলিতে সিআইডি পুলিশের দুই কর্মকর্তা ও একজন পথচারী আহত হয়েছে। এব্যাপারে জিআরপি থানায় একটি মামলা হয়েছে। আটক দুই ছিনতাইকারীও পালিয়ে যায়। ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় রাত সাড়ে আটটায় রফিক (২৫) নামে একজন ফল ব্যবসায়ী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মেঃ

এ মাসে ৭৩ টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় সাধারণ মানুষ শিকার হয়েছে ৪১ জন। এর মধ্যে ৩৫ জন আহত এবং ৬ জন নিহত হয়েছে। ১১টি মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ৩৫ জন। নারায়ণগঞ্জ ডেমরা সড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ বটতলা এলাকায় ৪/৫ জন সশস্ত্র ছিনতাইকারী হাবিবুর রহমান নামে এক কনস্টেবলকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে নগদ ৪ হাজার ২'শ টাকা ও একটি হাতঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। পুলিশ ছিনতাইয়ে সহযোগিতা করার জন্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

জুনঃ

সারাদেশে ৩৩টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় শিকার হয় ৫৩ জন এবং ছিনতাইকারীর অস্ত্রের আঘাতে একজন সাধারণ মানুষ নিহত হয়। এ মাসে ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা হয় ৭টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ২৮ জন ছিনতাইকারী। বগুড়া শহরে ২ জুন রাতে বাদুরতলা চকসূত্রাপুর ও নামাজগর এলাকায় গণছিনতাই হয়েছে। রাত ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ৭/৮ জনের ছিনতাইকারী দল পথচারী ও বাইরে থেকে নৈশ কোচে আসা যাত্রীদের কাছে থেকে অস্ত্রের মুখে টাকা, ঘড়ি ও স্বর্ণালঙ্কার ছিনতাই করে। এই এলাকার ছিনতাইকারীরা পুলিশ দেখলেই বোমা মেরে পালিয়ে যায়।

জুলাইঃ

৮৩ টি ছিনতাই ঘটনায় শিকার হয়েছে ১৪৪ জন এবং ছিনতাইকারীদের হাতে নিহত হয়েছে ১০ জন। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে ১৭ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৫১ জন ছিনতাইকারী। ৩ জুলাই নগরীর পল্লবী এলাকায় এমপ্লয়মেন্ট এন্ড টেকনলজি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী নামে একটি সংস্থার দু'জন কর্মকর্তার কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা সন্ত্রাসীরা অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে। নগরীর তেজগাঁও শাহীনবাগ এলাকায় ২৯ জুলাই রোববার মালেক (৩০) নামে এক চাল ব্যবসায়ীকে গুলি করে সন্ত্রাসীরা ৯ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আগস্টঃ

সারাদেশে ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৬৫টি। এর শিকার হয়েছে ১৪৫ জন। ছিনতাই ঘটনায় এ মাসে মামলা হয়েছে ১০ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৪৯ জন ছিনতাইকারী। ছিনতাইকারীর হাতে নিহত হয়েছে ৩ জন এবং আহত হয়েছে ২১ জন সাধারণ মানুষ। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার সময় ছিনতাইকারীরা আনোয়ার হোসেন (৪০) নামের এক ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করে ৩০ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর বনানীতে ২ আগস্ট দুপুরে। আহত আনোয়ারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রবাসী ফয়জুর রহমান পরিবার নিয়ে দেশের মাটিতে পা রেখেই ছিনতাইকারীদের হামলার শিকার হয়। ছিনতাইকারীরা ফয়জুর রহমানকে আহত করে মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্বনাথ উপজেলার নতুন বাজার এলাকার ফয়জুর রহমান ২ আগস্ট স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে লন্ডন থেকে সিলেট বিমান বন্দরে আসেন। বিকেলে মাইক্রোবাসে বাড়ি ফেরার পথে শহরের কুমারপাড়া এলাকায় ৪ মোটর সাইকেলে ১২ জন সন্ত্রাসী তাদের গাড়ির গতিরোধ করে। এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে তারা ত্রাসের সৃষ্টি করে। প্রবাসী ফয়জুর রহমান স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে পালিয়ে একটি ক্লিনিকে আশ্রয় নেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা তার মালামাল লুট করে পালিয়ে যায়।

সেপ্টেম্বরঃ

সারাদেশে ৩১ টি ছিনতাই ঘটনায় শিকার হয়েছে ৪৪ জন। এ মাসে ছিনতাইকারীর হাতে নিহত হয়েছে ৭ জন সাধারণ মানুষ। ১১ টি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এ মাসে ১৮ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। ছিনতাইকারীরার অস্ত্র ঠেকিয়ে এক ব্যক্তির প্রায় ২৪ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নগরীর সূত্রাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেফতার হয়েছে। মিরপুর দারুস সালাম রোডে ছিনতাইকারীরা রেজাউল হক (৩৫) নামের গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে তার কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে।

অক্টোবরঃ

৭৭ টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় শিকার হয়েছে ৯১ জন নারী-পুরুষ। ছিনতাইকারীর হাতে এ মাসে নিহত হয়েছে ১৭ জন সাধারণ মানুষ। উক্ত ঘটনায় এ মাসে মামলা হয়েছে ১১টি এবং ২৭ জন অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে। ২১ অক্টোবর রাতে সিলেট জেলার শাহজালাল উপশহর থেকে একটি হুন্ডি ব্যবসায়ীর নগদ ১৬ লাখ টাকা ও একটি মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

নভেম্বরঃ

সারাদেশে ৩৪ টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় শিকার হয় ৩৪ জন। ছিনতাইকারীর হাতে এ মাসে আহত হয়েছে ১০ জন এবং নিহত হয়েছে ১ জন সাধারণ মানুষ। উক্ত ঘটনায় এ মাসে মামলা করা হয়েছে ১০ টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ২৭ জন ছিনতাইকারীকে। ২১নভেম্বর রাজধানীতে পৃথক তিনটি ঘটনায় দু'জন ব্যবসায়ী ও একজন গৃহবধুকে মারধর করে ছিনতাইকারীরা রিভলবার ও আড়াই লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

ডিসেম্বরঃ

সারাদেশে ৮৮ টি ছিনতাই ঘটনায় শিকার হয়েছে ১০১ জন। এমাসে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছে ২০ জন এবং উক্ত ঘটনায় এ মাসে ৪ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ছিনতাই ঘটনায় এ মাসে মামলা করা হয়েছে ১৬টি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৫০জন ছিনতাইকারী। ঈদকে সামনে রেখে এ মাসে সারাদেশে ছিনতাইয়ের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেশি ছিল। ১১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার একদিনেই রাজধানীতে অর্ধশতাধিক ছিনতাই হয়েছে। দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা জ্বালিয়ে দিয়েছে দুটি বেবিট্যাক্সি।

এক নজরে ২০০২ সালে ছিনতাই'র চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ছিনতাই	৬৭	৬৮	৬৫	৭৬	৮০	৬৬	৯০	৫৫	৭১	৬৩	৬৪	৫৬	৮২১

২০০২ সালে সারাদেশ ছিনতাইকারীদের যেন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। ছিনতাইকারীরা এতো বেশি তৎপর ছিল যে তারা প্রকাশ্য দিবালোকে বীরদর্পে যত্রতত্র নির্বিঘ্নে ছিনতাই করে। গত এক বছরের পরিসংখ্যান দেখলে মনে হয় দেশে ছিনতাইয়ের মহোৎসব চলছিল। ২০০২ সালে ছিনতাইয়ের ৮২১ টি ঘটনায় শিকার হন ৯৭৫ জন। ছিনতাই ঘটনায় উক্ত সময়ে নিহত হন ৫৩ জন এবং গণপিটুনিতে নিহত হন ১৮ জন এবং ছিনতাইকারীর সন্ত্রাসীর নির্যাতনের শিকার হয়ে আহত হন ২৯৩ জন।

গত একবছরে এ ঘটনার মামলা করা হয় ১৪০টি এবং গ্রেফতার করা হয় ৪৯৬ জন ছিনতাইকারীকে। ২০০২ সালে শুধুমাত্র জুলাই মাসেই ৯০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। যার পরিসংখ্যান বছরের অন্যান্য মাসের মধ্যে ছিল সর্বাধিক। এ সময় ঢাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিল ২৮টি। অপেক্ষাকৃত কম ছিনতাই হয় আগস্ট মাসে। এ মাসে ৫৫টি ঘটনায় ৬৬ জন মানুষ শিকার হন।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ২০০৩ সালে ছিনতাই'র চিত্র

বিষয়	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ছিনতাই	৫১	৪২	৬৯	৮৭	৮১	৮৫	৬৬	৭৪	৯১	৯৫	৭৭	৮১	৮৯৯

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৩ সালে ৮৯৯টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে, যার শিকার হন ১২৪৪ জন সাধারণ মানুষ। ছিনতাই ঘটনায় এ সময় মামলা করা হন ১৭০টি এবং গ্রেফতার করা হয় ৫৫২ জন ছিনতাইকারীকে। ছিনতাইকারীদের হাতে এ সময় নিহত হয় ৪৬ জন এবং আহত সাধারন মানুষের সংখ্যা ৪২৯। জনতার হাতে গণটিচুনিতে নিহত হয় ১৮ জন ছিনতাইকারী। এ সময় সবচেয়ে বেশি ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে অক্টোবর মাসে, ৯৫টি সবচেয়ে কম ফেব্রুয়ারিতে, ৪২টি।

এ বছর ছিনতাই সংক্রান্ত যে মামলার রায়গুলো হয়েছিল তাতে দেখা গেছে এ সময় ১৪২ জনের যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদি সাজা হয়। এপ্রিল মাসে ঢাকার লালমাটিয়ায় সন্ত্রাসীরা কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা ছিনতাই করে। এ ঘটনায় সিটি ব্যাংকের কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন (৩৫) এবং গাড়িচালক আহত হন; বিদ্যুৎ বিল বাবদ সংগৃহীত উল্লেখিত টাকা লালমাটিয়া শাখা থেকে নিউ মার্কেট শাখায় নেওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে।

জানুয়ারি মাসে গাজীপুর সদর উপজেলার শিশিরচালা এলাকায় কয়েকজন সন্ত্রাসী 'উপবন ফিলিং স্টেশন' এ হামলা চালিয়ে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা ছিনতাই করে। পুলিশের ভাষ্যমতে, আব্দুল মতিন ও আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা দাবিকৃত চাঁদা না পেয়ে এ হামলা চালায়।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. দৈনিক জনকণ্ঠ, (১৯৯৯-২০০৩) এর সকল সংখ্যা।
২. দৈনিক সংবাদ, (১৯৯৯-২০০৩) এর সকল সংখ্যা।
৩. প্রথম আলো, (১৯৯৯-২০০৩) এর সকল সংখ্যা।
৪. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, (১৯৯৯-২০০৩) এর সকল সংখ্যা।
৫. The daily Independent all issues of (1999-2003).
৬. ভোরের কাগজ, (১৯৯৯-২০০৩) এর সকল সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস; প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বাংলাদেশে অনেকগুলো বিনোদনের মধ্যে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমানে মানুষের ঘরে ঘরে টেলিভিশন ও ডিস এন্টেনার মাধ্যমে আকাশ সংস্কৃতি পৌঁছে গেলেও এদেশের গ্রাম-শহর সব জায়গায় সাধারণ মানুষের কাছে, সব শ্রেণীর দর্শকের কাছে চলচ্চিত্র এখনও ব্যাপক গ্রহণযোগ্য একটি গণমাধ্যম।

কিন্তু বর্তমানকালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা এ শিল্পের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে বাণিজ্যিক দিকটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন বেশি। ফলে দর্শকের চাহিদার প্রেক্ষিতেই তারা চলচ্চিত্রগুলোতে যুক্ত করছেন সস্তা বিনোদন, অশ্লীল দৃশ্য অপ্রয়োজনীয় সংলাপ, অবিশ্বাস্য সব সংঘাত, সন্ত্রাসের দৃশ্য। চলচ্চিএগুলোতে দেখানো হচ্ছে সন্ত্রাস সৃষ্টির নতুন নতুন সব পদ্ধতি, যেগুলো দেখে যুবক দর্শকরা সহজেই সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলোর অনুশীলনও তারা করছে। ফলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সন্ত্রাস এ দেশে নব দিগন্তের সূচনা করছে।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস প্রদর্শনের মাত্রা নিয়ে ব্যাপকভাবে আলাদা করে কাজ বা লেখালেখির পরিমাণ খুব কম। তাই একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারায় কী পরিমাণে কী ধরনের সন্ত্রাস প্রদর্শিত হচ্ছে এবং প্রদর্শিত সন্ত্রাসগুলো বাংলাদেশের যুব সমাজের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা জানা আবশ্যক।

403585

বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে যে সমস্ত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে তার ধারাবাহিকতা পরবর্তিতে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে চলচ্চিত্রের ফ্রেম থেকে বিদায় নিতে থাকে দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা, জীবন ও মৌলিকত্ব। গ্রাস করে উদ্ভট, কালপনিক সংস্কৃতি, অশ্লীলতা, সন্ত্রাস ও হিংস্রতা। বর্তমান কালে বাংলাদেশী চলচ্চিত্রে এগুলোর দাপট আরো ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র -১

মফস্বল শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, হঠাৎ আপনার কানে ভেসে এলো বীভৎস কিছু গালি-গালাজ, খিস্তি। থমকে পেছনে তাকালেন, দেখলেন না, কোন ঝগড়া বিবাদ নয়, রিকশায় বা ভ্যানে বাংলাদেশী সিনেমার পোষ্টার লাগিয়ে তার প্রচারণা চলছে। অবাক হবার কিছুই নেই, বাংলাদেশী চলচ্চিত্রে এখন এ ধরনের নোংরা, বীভৎস, কুরুচিপূর্ণ ও শ্রবণ অযোগ্য গালিগালাজপুর্ণ সংলাপগুলোই ব্যবহৃত হচ্ছে।[১]

চিত্র -২

বাসায় দেরি করে ফিরেছেন, তাও আবার আপনার ছোট্ট ছেলেটির জন্যে চকলেট না নিয়েই, ব্যস আপনার আদরের সন্তানের মুখ থেকে শুনতে পারলেন নতুন নতুন সব শব্দ চকলেট আননি কেন, জবাই করে ফেলবো, ভুড়ি নামিয়ে দেবো ইত্যাদি। না এটি সিনেমার মতো কাল্পনিক কোন কাহিনী নায়। গবেষণার অংশ হিসেবে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পিরোজপুরের একজন ছবির দর্শকের কাহিনী এটা, যিনি একদিন তার ছোট্ট ভাইপোকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেই সিনেমায় মানুষের শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেবার একটি দৃশ্য ছিল, সিনেমা দেখার পরে বেশ কিছুদিন শিশুটি কিছু হলেই শুধু বলেছে কল্লা নামাইয়া দিমু (মাথা কেটে ফেলবো)।[২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৩

আপনার ছোট বোনকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন, হঠাৎ রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে ৬-৭জন আড্ডারত যুবক মন্তব্য করে বসলো। ঐ দেখ----। আপনাকে বাক্যগুলো হজম করে ধরে নিতে হবে এটি পাশের প্রেক্ষাগৃহে যে সিনেমাটি চলছে তার ভিলেনের উক্তি, যা উঠতি বয়সের যুবকরা ঐ সিনেমা দেখে রপ্ত করেছে। পত্রিকার পাতায় প্রায়ই যে খবরগুলো দেখা যায়, যেমন ফিল্মি কায়দায় ডাকাতি, সিনেমা স্টাইলে খুন, ছিনতাই ইত্যাদি এসব মূলত আমাদের দেশীয় সিনেমার বর্তমান ধারা থেকেই প্রভাবিত হয়েছে। [৩]

চিত্র -৪

এমন একটা সময় ছিল যখন সিনেমার পোষ্টার দেখেই দর্শকরা উদ্বুদ্ধ হতেন হলে গিয়ে সিমোটি দেখতে। কিন্তু বর্তমানকালের সিনেমার পোষ্টার দেখেই সচেতন ও রুচিশীল দর্শকরা সিনেমা বিমুখ হতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে প্রতিটি সিনেমার পোস্টারেই দেখা যায় নায়িকার অর্ধনগ্ন বৃষ্টিভেজা শরীর, খলনায়ক ও নায়কের ক্ষতবিক্ষত শরীর, বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি। বর্তমান কালে কেবল মাত্র লোককাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্রগুলো ছাড়া এমন একটি সিনেমার পোস্টার খুঁজে পাওয়া যাবে না যেগুলোতে ব্যবহৃত হয়নি নায়ক খলনায়কের রক্ত মাখা শরীর, চাকু, তলোয়ার, আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন সহিংসতার চিত্র। আর এগুলো দেখে সিনেমার ভেতরের সহিংসতাগুলো সহজেই অনুমান করা যায়। [৪]

বর্তমানকালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উদ্ভট, অবাস্তব ও অলৌকিক কাহিনীর সিনেমা, স্থূলতা, রুচিহীনতা, অশ্লীলতা, ভাঁড়ামো, দাপটের সাথে বিরাজ করছে। নির্মাতারা বন্ধী হয়ে আছেন প্রায় একই বৃত্তে। তথাকথিত বিনোদনের রাসায়নিক ফর্মূলা অনুযায়ী নির্মাতারা হন্যে হয়ে ছুটেছেন মোক্ষম বিষয়ের পেছনে। এজন্যে তারা নির্লজ্জভাবে হুবহু নকল করেছেন বিদেশী ছবির নাচ, গান, সুর, অভিনয় এমনকি সাজ পোশাকও। তারা দর্শক মনোরঞ্জনের নামে জুড়ে দিচ্ছেন অশ্লীল যৌন উত্তেজক নাচ, গান। সংযোজন করছেন সাপ, ব্যাঙ, দৈত্য-দানব, জ্বীন-পরী, তন্ত্র-মন্ত্র, অস্ত্রবাজি-বোমাবাজি-মারপিট। ছবির নামটি বাদ দিয়ে মনে হয় ঘুরে ফিরে সেই একই কাহিনী, একই দৃশ্য। দর্শকেরাও জানেন খলনায়করা সিনেমায় ভন্ডামি, ষড়যন্ত্র করবেন এবং শেষ পর্যন্ত নায়কের কাছে পরাজিত হবেন। [৫]

দেখা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

"চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস; প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ " শীর্ষক গবেষনার তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি হিসেবে সাম্প্রতিককালের ২০টি বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের উপাত্ত বা তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে চলচ্চিত্রের মোট সময়ের কতটুকু নাচ-গানের পেছনে ব্যয় করা হয়েছে, কতটুকু সন্ত্রাসের পেছনে ব্যয় করা হয়েছে এবং সন্ত্রাস ও নাচ-গান বাদে শুধু সংলাপ কতক্ষণ রয়েছে এই দিকগুলো দেখা হয়েছে। উল্লেখ্য ভিডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত সিনেমাগুলোর দৈর্ঘ্য কম-বেশি হতে পারে। কারণ ভিডিওতে অনেক সময় কিছু কিছু অংশ কাট- ছাট করা হয়। নিচে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণি-১

২০ টি সিনামায় সন্ত্রাস প্রদর্শনের মোট সময়

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	নাচ-গান সন্ত্রাস বাদে শুধু সংলাপ
২৮৪৭ মিনিট (প্রায়)	৪২১: ৩০ মিনিট (১৫%) (প্রায়)	৫৯৫:৩০ মিনিট (২১%) (প্রায়)	১৮৩০ মিনিট (৬৪%) (প্রায়)

Dhaka University Institutional Repository

২০টি সিনেমার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সিনেমাগুলো মোট দৈর্ঘ্য (সময়) ছিল ২৮৪৭ মিনিট প্রায়। এই সময়ের মধ্যে ৫৯৫ মিনিটই (২১%) ছিল মারামারি ও সন্ত্রাস-সহিংসতার। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রতিটি সিনেমার গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৩ মিনিট। এগুলোর মধ্যে সংলাপ থাকে গড়ে ৯১ মিনিট (ভিলেনের কটুক্তি ও কুরুচিপূর্ণ সংলাপগুলোসহ)। নাচ-গান থাকে প্রায় ২২ মিনিট এবং প্রতিটি সিনেমায় গড়ে প্রায় ৩০ মিনিট করে থাকে সন্ত্রাস-সহিংসতা। প্রত্যেকটি সিনেমাতেই প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে যুক্ত করা হয়েছে এসব সন্ত্রাস। সন্ত্রাস গুলোতে হাতাহাতি থেকে শুরু করে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বোমার ব্যবহার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। সিনেমাগুলোতে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে সেটি হলো খল চরিত্র ভিলেনরা নায়িকাকে আক্রমণ করার পর নায়ক মারামারি করে তাকে উদ্ধার করে আনছে, এই দৃশ্যটা ছাড়া যেন সিনেমা পূর্ণতা পায় না। প্রায় সিনেমাতেই মারামারির শুরুতে মারামারি কেনো হচ্ছে তা বুঝতে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও গানের পরেই হঠাৎ করে মারামারি কিংবা মারামারির পরেই গান দেখানো হচ্ছে, যা বুঝে ওঠা সাধারণ দর্শকের জন্যে কষ্টকর।

বর্তমানে যেসব সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে, সেগুলোর কাহিনী মোটামুটি একই রকম। নায়ক হয় পুলিশ অফিসার হবেন নয়তো নায়িকাকে অন্তত একবার খলনায়ক উঠিয়ে নিয়ে যাবে বা ধর্ষণের চেষ্ট করবেন এবং নায়ক নায়িকাকে উদ্ধার করবে। এ ঘটনা নায়কের বোন, মার সাথেও হয়। নায়ক প্রথম দিকে খলনায়কের অত্যাচারে অতিষ্ট হলেও শেষে গিয়ে নায়কের জয় হবেই। আর এই জয় দেখানোর জন্যে সারা সিনেমা সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকে। পাশাপাশি থাকে নায়িকার অশালীন অঙ্গভঙ্গি সমৃদ্ধ নাচ-গান যা অনেকাংশেই অশ্লীল।

সন্ত্রাস গুলোতে প্রচুর গোলাগুলি ও বোমাবাজি দেখানো হয়েছে। এছাড়া সিনেমাগুলোতে গলা পাড়িয়ে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে, জবাই করে, শরীরে বিষ প্রয়োগ করে, ধর্ষণ করে হত্যা করার মতো বীভৎস সন্ত্রাস গুলো দেখানো হয়েছে। তাছাড়া সিনেমা গুলোতে অবাস্তব ও কাল্পনিক অনেক দিকও দেখা গেছে। যেমন সব সময় দেখা যায় নায়ক একাই একাধিক খলনায়কের সাথে মারামারি করে জিতে যায়। নায়কের একটি গুলিই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অথচ খলনায়কদের বৃষ্টির মতো গুলিও নায়কের গায়ে লাগে না। হাতেগুলি বা চাকুবিদ্ধ অবস্থাতেও নায়ক মারামারি করে জিতে যায় ইত্যাদি। সমাজের জন্যে ক্ষতিকর এসব অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় সন্ত্রাস সহিংসতা আদৌ চলচ্চিত্রে রাখবার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

তথ্য বিশ্লেষণকৃত ২০ টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ২০০১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলোর ফলাফলে দেখা যায়, তিনটি চলচ্চিত্র যথাক্রমে বিচ্ছু বাহিনী, সুলতান এবং মায়ের জন্য যুদ্ধ ছিল সুপারহিটের তালিকায়। যেগুলো ছিল সন্ত্রাস-সহিংসতায় ভরপুর, অন্যদিকে আধেয় বিশ্লেষণে যেসব চলচ্চিত্রে তুলনামুলক ভাবে সন্ত্রাস সহিংসতা কম ছিল বা একদম ছিল না সেগুলো এভারেজেও জায়গা না পেয়ে ফ্লপ বা অন্যান্যের তালিকায় একেবারে শেষের দিকে ছিল। যেমন- "বাপবেটির যুদ্ধ", "আমার বউ", "বাংলার সৈনিক" ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায় দর্শকও ধীরে ধীরে সন্ত্রাস সহিংসতাপূর্ণ চলচ্চিত্র দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশী চলচ্চিত্রগুলোর কাহিনী, সংলাপ থেকে শুরু করে নির্মাণের প্রতিটি পর্যায় প্রায় একই রকম, যেন একই স্ক্রিপ্ট থেকে সবগুলোর জন্ম। তথ্য বিশ্লেষণে যে ২০ টি ছবি বাছাই করা হয়েছে সেই ছবিগুলোর বিশ্লেষণ করলে নতুন বোতলে পুরনো মদই পাওয়া যায়, তেমন কোনো মৌলিকত্ব নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২

ক্রঃ	চলচ্চিত্র	পরিচালক	নায়ক-নায়িকা	খলনায়ক
১.	আমি গুন্ডা আমি মাস্তান	মোঃ শরিফ উদ্দিন খান দিপু	আমিন খান/একা মেহেদী/মৃণ্ময়ী	ডিপজল, সাদেক বাচ্চু
২.	ঠেকাও মাস্তান	পবন কুমার আগারওয়াল মালেক আফসারি	আমিন খান/মুনমুন সাকিব খান/শিমলা	ডিপজল, মাফিয়া
৩.	সুলতান	এফ আই মানিক	মান্না/পুর্ণিমা	সাদেক বাচ্চু/রাজীব
৪.	কাটালাশ	বাদশা ভাই	রুবেল/শাবনাজ	ডিপজল, মিজু আহমেদ
৫.	আজকের ক্যাডার	বাদশা ভাই	আমিন খান/কুমকুম সাকিব খান/ময়ুরী	ডিপজল, মিজু আহমেদ
৬.	বাংলার সৈনিক	জহুরুল ইসলাম সজল	আমিন খান/মুনমুন আলেকজান্ডার/একা	রাজিব, মিজু আহমেদ
৭.	নানা ভাই	বাদশা ভাই	আমিন খান/মুনমুন শাহিন আলম/ময়ুরী	ডিপজল, মিজু আহমেদ
৮.	চুরমার	ইফতেখার জাহান	রুবেল/পপি	হুমায়ুন ফরিদী, গাংগুয়া
৯.	মায়ের জন্য যুদ্ধ	মাসুম পারভেজ রুবেল	রুবেল/পপি	হুমায়ুন ফরিদী
১০.	রংবাজ বাদশা		মান্না/কেয়া অমিত হাসান/ময়ুরী	আহমেদ শরীফ
১১.	পুলিশ অফিসার	শরীফ উদ্দিন খান দিপু	আমিনখান/একা মেহেদী /ময়ুরী	মিজু আহমেদ, রাজীব
১২.	দানব	বদিউল আলম খোকন	মান্না/মুনমুন মেহেদী/মৌ	সাদেক বাচ্চু, মিশা সওদাগর
১৩.	ঢাকাইয়া মাস্তান	মনতাজুর রহমান আকবর	মান্না/মৌসুমী শাহিন খান/ময়ুরী	ডিপজল
১৪.	ক্ষ্যাপাবাসু	কমল সরকার	রিয়াজ/পপি	ডিপজল
১৫.	গুন্ডার প্রেম	বাদশা ভাই	রিয়াজ/পপি	মিজু আহমেদ, রাজীব
১৬.	আমার বউ	ইস্পাহানী আরিফ জাহান	ওমর সানি, শাকিল/পপি	সাদেক বাচ্চু
১৭.	গণ দুশমন	মনোয়ারা হোসেন ডিপজল	মান্না/মুনমুন	মিজু আহমেদ, ডিপজল
১৮.	বিচ্ছু বাহিনী	মাসুম পারভেজ রুবেল	রুবেল/মিনা,সিবানী	হুমায়ুন ফরিদী
১৯.	বাপ-বেটির যুদ্ধ	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু	শাকিব খান/পপি	নাসির খান
২০.	মুখোমুখি	আজিজ আহমেদ বাবুল	আমিন খান/পুর্ণিমা শাহিন খান/ময়ুরী	ডিপজল, মিজু আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

২০টি চলচ্চিত্রের তথ্য বিশ্লেষণের বিস্তারিত প্রতিবেদন

১.	চলচ্চিত্র	ঃ আমি গুন্ডা আমি মাস্তান
	পরিচালক	ঃ মোঃ শরীফ উদ্দিন খান দিপু
	নায়ক-নায়িকা	ঃ আমিন খান/একা, মেহেদী/ময়ুরী
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল, সাদেক বাচ্চু

সারণি-৩

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৭০ মিনিট	৬টি, ২১ মিনিট (১২%)	৫ বার, ২৭ মিনিট (১৬%)	১২২ মিনিট (৭২%)

সারণিতে দেখা যাচ্ছে ১৭০ মিনিটের এই সিনেমাটিতে নাচগান চিল ২১ মিনিট যা মোট সময়ের ১২% এবং মারামারি ছিল ২৭ মিনিট যা মোট সময়ের ১৬%, এসব বাদে চলচ্চিত্রে সংলাপ ছিল ১২৩ মিনিট যা মোট সময়ের ৭২%। অবশ্য এখান থেকে খলনায়কের অশালীন ও সংঘাতমুলক সংলাপগুলো বাদ দিলে এই সময়ের পরিমাণটা অনেক কমে যাবে।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

খলনায়করা নায়িকাদের ধরে নিয়ে যায়, এ খবর পেয়ে নায়ক একাই দুটি পিস্তল হাতে নিয়ে খলনায়কের আড্ডায় আক্রমণ করে। খলনায়কের লোকেরা অত্যাধুনিক ভারি অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে নয়াককে হাজার হাজার গুলি করলেও তার একটিও গায়ে লাগে না অথচ তার একগুলিতেই একাধিক লোক কুপোকাত, কারণ সে নায়ক। পরবর্তীতে অপর নায়ক এবং দুই নায়িকাও এ মারামারিতে যোগ দেয়। দীর্ঘক্ষণ গোলাগুলি চললেও চার নায়ক নায়িকাকেই অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখা যায় এবং খলনায়কের মৃত্যুর সাথে সাথেই সিনেমা শেষ হয়ে যায়।

সিনামাটিতে মোট ৭টি খুনের দৃশ্য দেখানো হয়। এগুলোর পদ্ধতি ছিল বিভিন্নরকম, যেমন-পেটে চাকু ঢুকিয়ে, জিভ টেনে, গুলি করে, গায়ে পেট্রোল ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে ইত্যাদি। এছাড়া নায়ক জেলখানায় একজন অসৎ মন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা করে। জেলখানার ভেতরে নায়ক ও অন্যান্য কয়েদীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন দেখানো হয়। জাহাজের নোঙরের সাথে ঝুলিয়ে একজনকে মারা হয়, দড়িতে হুক লাগিয়ে বড় বড় প্রাচীর পার হবার কৌশল দেখানো হয়। পোশাক ছিল অশালীন এবং প্রায় একজন জেলার প্রকৃত অর্থে কেউই গুন্ডা বা মস্তান নয়, পুরো সিনেমা দেখেও সিনেমার নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২.	চলচ্চিত্র	ঃ ঠেকাও মাস্তান
	পরিচালক	ঃ পবন কুমার আগারওয়াল, মালেক আফসারী
	নায়ক-নায়িকা	ঃ আমিন খান, মুনমুন
		ঃ সাকিব খান/সিমলা
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল, মাফিয়া

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪৬ মিনিট	৫টি, ২২ মিনিট (১৫%)	৮ বার, ২৯:৩০ মি (২০%)	৯৪:৩০ মিনিট (৬৫%)

সারণিতে দেখা যায় ১৪৬ মিনিটের সিনেমাটিতে নাচ-গান ২২ মিনিট যা মোট সময়ের ১৫%। মারামারি, সন্ত্রাস ৮ বার (২৯:৩০মি) যা মোট সময়ের ২০% এবং সংলাপ ৯৪ মিনিট যা মোট সময়ের ৬৫%।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমার শুরুতে যে খুনটি করা হয় তা খলনায়ককে সহযোগিতা না করার জন্য। একজন পুলিশ অফিসার গুন্ডাদের কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্যে তাদেরকে থানায় না নিয়ে একটি অজ্ঞাত স্থানে নির্যাতন চালায়। নায়ক একাই খলনায়কের আড্ডায় আক্রমন চালিয়ে তাকে হত্যা করে ম্যানহোলে ফেলে দেয়। নায়ক একজন সাধারণ ঘরের ছেলে হয়েও টাইম বোমা দিয়ে খলনায়কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দেয়। এই বোমা সে কোথা থেকে পেল তা জানা যায়নি। নায়িকা মুখোশ পরে থানায় এসে অনেক বন্দুকধারী পুলিশকে পরাজিত করে কাস্টডি থেকে নায়ককে বের করে নিয়ে যায়, এমন আজগুবি ঘটনা বোধহয় শুধু বাংলাদেশি সিনামাতেই সম্ভব। মাস্তান ঠেকাতে গিয়ে নায়ক নিজেই মাস্তান বনে যায়।

৩.	চলচ্চিত্র	ঃ সুলতান
	পরিচালক	ঃ এফ আই মানিক
	নায়ক-নায়িকা	ঃ মান্না/পূর্ণিমা
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল, রাজিব

সারণি-৫

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪৩ মিনিট	৬টি, ২৪ মিনিট (১৭%)	৪বার, ৩৪ মিনিট (২৪%)	৮৫ মিনিট (৫৯%)

এ সিনেমাটিতে নাচগান ২৪ মিনিট যা মোট সময়ের ১৭%। সন্ত্রাস সহিংসতা ৩৪ মিনিট যা মোট সময়ের ২৪% এবং সংলাপ মাত্র ৮৫ মিনিট যা মোট সময়ের ৫৯%। তাহলে দেখা যায়া সিনেমাটিতে প্রায় অর্ধেক সময় ব্যয় হয়েছে নাচগান ও সন্ত্রাস সহিংসতকার পেছনে।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

এ সিনেমায় অর্ধেক পর্যন্ত দেখা যায় নায়ক একজন সাধাসিধা স্কুটার চালক। সিনেমা অর্ধেক না দেখা পর্যন্ত সিনেমার পটভূমি কিছুই বোঝা যায় না। বিরতির পরবর্তী অংশে গিয়ে শুরু হয় সন্ত্রাস সহিংসতা এবং জানা যায় নাম ভূমিকায় অভিনয়কারী নায়ক এক সময় ছিল একটি শহরের টপটেরর, অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়েই সে সন্ত্রাসী হয়। এবং পরবর্তীতে অন্য শহরে এসে স্কুটার চালানো দিয়ে নতুন জীবন শুরু করে। কিন্তু এখানেও তার পুরনো শত্রুরা তাকে চিনে ফেলে এবং বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে সে আবার সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে।

এ সিনেমাটিতে মারামারি খুব বেশি না থাকলেও প্রচুর পরিমাণে বিধ্বংসী কর্মকান্ড দেখানো হয়। বলতে গেলে দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাই ছিল নায়কের অতীত এবং বর্তমান সন্ত্রাসী কর্মকান্ডগুলো দিয়ে ভরা। সিনেমাটিতে মোট ১৬টি খুনের দৃশ্য দেখানো হয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে। সংঘাতের জন্যে এখানে চাকু থেকে শুরু করে টাইম বোমার ব্যবহার পর্যন্ত দেখানো হয়। সিনেমায় নায়ক খলনায়ক উভয় পক্ষ থেকেই উভয়ের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন দেখানো হয়। দেখানো হয় বোমা মেরে বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের পদ্ধতি। এত কিছুর পরেও ব্যবসার দিক দিয়ে ২০০১ সালের সুপারহিট ছবি। এ থেকে বোঝা যায় দর্শকরা এখন এ ধরনের সংঘাতময় সিনেমাগুলো দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.	চলচ্চিত্রঃ কাটালাশ	
	পরিচালক	ঃ বাদশা ভাই
	নায়ক-নায়িকা	ঃ রুবেল শাবনাজ
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল, মিজু আহমেদ

সারণি-৬

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪০ মিনিট	৬টি, ২৫ মিনিট (১৮%)	৯বার, ৪০ মিনিট (২৯%)	৭৫ মিনিট (৫৩%)

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটি শুরুই হয় একটি চাঁদাবাজি দিয়ে, খলনায়করা চাঁদাবাজি করতে এলে একজন যুবক প্রতিবাদ করায় প্রথমেই মারামারি হয়। এখানে কিছুক্ষণ মারামারির পর যুবকটিকে হত্যা করা হয়। সিনেমাটিতে ৪০ মিনিট জুড়ে শুধু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দেখানো হয়। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে এ সিনেমার কাহিনী গড়ে উঠেছে। ছবির খলনায়ক একজন সন্ত্রাসী। তার অত্যাচারে এলাকাবাসী অতিষ্ট। একের পর এক খুনকরে সে। সিনেমায় মোট ১৩ টি খুনের দৃশ্য দেখানো হয়। নায়ক রুবেল এর প্রতিবাদ করলে তাকেও খুন চেষ্টা করে খলনায়ক। সিনেমার যেসব সহিংসতা ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ল্যাম্প পোস্টের সাথে ঝুলিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা, বোতল ভেঙ্গে পেটে ঢুকিয়ে হত্যা করা, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা, চাঁদা না দেয়ায় খুন করা, পুলিশ অফিসারকে খুন করা। সিনেমাটিতে গোলাগুলি ও বোমাবাজি রয়েছে প্রচুর। এবং সবশেষে নায়ক যখন বারবার ভিলেনকে ছুরিকাঘাত করছিল এবং রক্ত ফিনকি মেরে তার শরীরে পড়ছিল সেই দৃশ্যটি ছিল সবচেয়ে লোমহর্ষক।

৫.	চলচ্চিত্র	ঃ আজকের ক্যাডার
	পরিচালক	ঃ বাদশা ভাই
	নায়ক-নায়িকা	ঃ আমিনখান/কুমকুম
		ঃ সাকিব/ময়ূরী
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল, মিজু আহমেদ

সারণি-৭

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪৪ মিনিট	৫টি, ১৯:৩০ মিনিট (১৩%)	৩৪:৩০ মিনিট (২৪%)	৯০ মিনিট (৬৩%)

সারণিতে দেখা যায় এ সিনেমাটিতে মোট সময়ের ১৩% ছিল নাচগান, ২৪% সন্ত্রাস সহিংসতা এবং ৬৩% শুধু সংলাপের জন্য বরাদ্ধ। অবশ্য খলনায়কের কুরুচি ও উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপগুলো বাদ দিলে এই হার ৫০% এর অনেক নিচে এসে দাঁড়াবে।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

প্রথমেই একজন সৎ কুলিকে নির্যাতন করা দেখানো হয়। পুলিশ একজন অপরাধীকে ধরতে বস্তি তে গুলি চালায়, এতে অনেক নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু দেখানো হয়। দেখানো হয় ব্যাংক ডাকাতির কৌশল এবং বোমা মেরে বিভিন্ন স্থাপনা ধবংসের পদ্ধতি। থানায় হাজতির উপরে নির্যাতন, নায়ক থানায় ঢুকে পুলিশের সাথে গোলা গুলি করে হাজত থেকে তার বাবাকে বের করে নিয়ে আসে। এছাড়া সিনেমাটিতে বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজি তো ছিলই। সিনেমাটি দেখে যা বোঝা গেছে তা হলো, দুই নায়ক পরিস্থিতির কারণে সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িয়ে বড় ক্যাডার হয়ে যায়। যদিও এত তাড়াতাড়ি বড় ক্যাডার হওয়া শুধুমাত্র সিনেমাতেই সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

৬.	চলচ্চিত্র	ঃ বাংলার সৈনিক
	পরিচালক	ঃ জহুরুল ইসলাম সজল
	নায়ক-নায়িকা	ঃ আমিনখান/ ময়ূরী
		ঃ আলেকজেন্ডার বো/একা
	খলনায়ক	ঃ রাজিব, মিজু আহমেদ

সারণি-৮

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪২ মিনিট	৫টি, ১৮ মিনিট (১৩%)	১০ বার, ৪৪ মিনিট (৩১%)	৮০ মিনিট (৫৬%)

বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৪২ মিনিটের এই সিনেমাটিতে নাচগান ছিল ১৮ মিনিট (১৩%), সন্ত্রাস সহিংসতা ৪৪ মিনিট (৩১%) এবং সংলাপ ছিল ৮০ মিনিট (৫৬%)। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরো সিনেমার অর্ধেক জুড়েই নাচগান ও সন্ত্রাসএবং মাত্র অর্ধেক সময় সংলাপ।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

খলনায়কদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে একজনকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। খলনায়করা নায়ককে খুঁজতে এসে তার বাড়ি তছনছ করে এবং বোনকে তুলে নিয়ে যায়। থানায় হাজতির উপর নির্যাতন দেখানো হয়। খলনায়ক নায়ক উভয়েই বিভিন্ন পদ্ধতিতে একের পর এক খুন করে যান। হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চাকু, তলোয়ার, রড ইত্যাদি। সিনেমার শেষের দিকে নায়ককে মেরে আধমরা করে তার বাবার লাশসহ একটি ঠেলাগাড়ি টানতে দেয়া হয়। এসময় নায়িকার উৎসাহে নায়ক শক্তিপায় এবং খলনায়ককে পরাজিত করে যা কেবল সিনেমাতেই বোধ হয় সম্ভব।

৭.	চলচ্চিত্র	ঃ নানাভাই
	পরিচালক	ঃ বাদশা ভাই
	নায়ক-নায়িকা	ঃ আমিন খান/ মুনমুন
		ঃ শাহীন আলম/ময়ুরী
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল, মিজু আহমেদ

সারণি-৯

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৫১ মিনিট	৬টি, ২৩ মিনিট (১৫%)	৮ বার, ৫৪ মিনিট (৩৬%)	৭৪ মিনিট (৪৯%)

১৫১ মিনিটের এই সিনেমাটিতে নাচগান আছে ২৩ মিনিট (১৫%), সন্ত্রাস ৪৫ মিনিট (৩৬%), শুধু সংলাপ ৭৪ মিনিট (৪৯%)। সিনেমাটিতে খলনায়কদের অশালীন সংলাপগুলোকে সন্ত্রাসের সাথে যোগ করলে সময়ের দিক থেকে সন্ত্রাস সহিংসতা ও সংলাপের পাল্লাটি একই সমান হয়ে যাবে।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমার শুরুই হয় একটি গরুর হাটে চাঁদাবাজি দিয়ে। পুরো সিনেমায় মোট ১৪টি খুনের দৃশ্য দেখানো হয়। খলনায়কের খুনের পদ্ধতি ছিল খুবই বীভৎস, (গলা পাড়িয়ে ধরে খুন করা)। নায়িকার দলবল গোলাগুলি করে পুলিশের গুলির বাক্স ডাকাতি করে নেয়। নায়িকা, খলনায়ক উভয়েই পেটে তলোয়ার ও চাকু ঢুকিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে খুন করে। খলনায়ক নায়িকার মা ও ভাইদেরকে নৃশংশভাবে খুন করে। এসময় তাদের শরীর থেকে মাথা ও হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ সিনেমাটিতে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে দুই নায়িকার ভূমিকাই ছিল বেশি কারণ তারা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া অঘটনের প্রতিশোধ নিতে ডাকাত দলে যোগ দেয় এবং খলনায়কের অপকর্মের প্রতিশোধ নেয়। তুলনামূলকভাবে এ সিনেমাটিতে অপ্রয়োজনীয় সন্ত্রাসের পরিমাণ অনেক বেশি।

৮.	চলচ্চিত্র	ঃ চুরমার
	পরিচালক	ঃ ইকতেখার জামান
	নায়ক-নায়িকা	ঃ রুবেল/ পপি
		ঃ আলেকজান্ডার বো/একা
	খলনায়ক	ঃ হুমায়ুন ফরিদী, গাংগুয়া

সারণি-১০

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচ-গান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪৭ মিনিট	৫টি, ২৩.৩০ মিনিট (১৬%)	৭ বার, ৩০ মিনিট (২১%)	৯৩.৩০ মিনিট (৬৩%)

সারণিতে দেখা যাচ্ছে ১৪৭ মিনিটের এই সিনেমাটিতে নাচ গান আছে ২৩: ৩০ মিনিট (১৬%)। সন্ত্রাস সহিংসতা ৩০ মিনিট (২১%)। এবং শুধু সংলাপ ৯৩:৩০ মিনিট(৬৩%)। উল্লেখ্য, এ সিনেমাটিতে ১৫ মিনিট কমেডি ছিল যা বাদ দিলে সংলাপের পরিমাণ আরো কমে যায়।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

এ সিনেমার শুরুই হয় দুটি খুনের দৃশ্য দিয়ে। খলনায়কের নির্দেশে গুন্ডারা একটি বস্তির সকল ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। নারী পাচারের মতো ঘৃণ্য বিষয়টি এ সিনেমায় দেখানো হয়। খলনায়ক নৃংশসভাবে নায়কের পুরো পরিবারকে খুন করে। একজনের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার দৃশ্য দেখানো হয়। একেবারে শেষ দৃশ্যে দেখানো হয় নায়ক তার পরিবাররের সদস্যদের হত্যাকারীকে গলা কেটে হত্যা করে এবং নায়িকা তার বাবার হত্যাকারীকে বিমানে গুলি করে বিমান বিধ্বস্ত করে হত্যা করে।

৯.	চলচ্চিত্র	ঃ মায়ের জন্য যুদ্ধ
	পরিচালক	ঃ মাসুম পারভেজ রুবেল
	নায়ক-নায়িকা	ঃ রুবেল/ পপি
		ঃ আলেকজান্ডার বো/একা
	খলনায়ক	ঃ হুমায়ুন ফরিদী

সারণি-১১

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৫০মিনিট	৫টি, ২০মিনিট (১৩%)	৩০মিনিট(২০%)	১০১মিনিট (৬৭%)

সারণিতে দেখা যায়, ১৫১ মিনিটের এই সিনেমাটিতে ২০মিনিট জুড়ে নাচগান এবং ৩০ মিনিট সন্ত্রাস সহিংসতা রয়েছে। সংলাপ রয়েছে ১০১ মিনিটের।

Dhaka University Institutional Repository

সিনেমায় ব্যাবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমা শুরু হয় নায়কের বাবাকে খুন করা দেখানো দিয়ে। সিনেমার নামটি সুন্দর হলেও এখানে সন্ত্রাসের কোন কমতি ছিলনা। নায়কের বাবাকে খুন করে ভিলেনরা নায়কের মাকে দোষী করে মামলা করে এবং তাকে দোষী প্রমাণিত করে। এতে নায়কের মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। নায়ক বড় হয়ে এক এক করে তার বাবার খুনের সাথে জড়িতদের খুন করে এবং তাদের রক্ত তার পায়ে এনে দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত তার বাবার পরিবারে তার মায়ের অধিকার ফিরিয়ে দেয়। এজন্যেই বোধ হয় সিনেমার নাম মায়ের জন্য যুদ্ধ।

সিনেমাটিত প্রচুর পরিমাণে গোলাগুলি ও বোমাবাজি ছিল। নায়ক পেটে চাকু ঢুকিয়ে একের পর এক ব্যাক্তিকে খুন করে গেছে। সিনেমার এক পর্যায়ে দেখা যায় নায়ক স্টেজে গান করে তার মার চিকিৎসার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করছে। মা শিরোনমের এইগানটি দেখেই কেবল মনে হয়েছে যে, নায়ক তার মায়ের জন্যে কিছু করছে। যে নায়ক স্টেজে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, যে বিরাট ক্ষমতাবান হয়ে এক এক করে তার বাবার খুনিদের (যারা সকলেই প্রভাবশালী) হত্যা করা বোধ হয় কেবল সিনেমাতেই সম্ভব।

১০.	চলচ্চিত্র	ঃ রংবাজ বাদশা
	পরিচালক	ঃ অসংগৃহীত
	নায়ক-নায়িকা	ঃ মান্না/কেয়া
		ঃ অমিত হাসান/ময়ুরী
	খলনায়ক	ঃ আহমেদ শরীফ

সারণি-১২

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪০মিনিট	৬টি, ২২মিনিট (১৬%)	২৬ মিনিট (১৮%)	৯২ মিনিট (৬৬%)

১৪০ মিনিটের এই সিনেমাটিতে নাচগান রয়েছে ২২ মিনিট, সন্ত্রাস ১৮ মিনিট এবং সংলাপ ৯২ মিনিট।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটিতে মোট ৮টি খুনের দৃশ্য দেখানো হয়। ভিলেন ধর্ষণ করার পর মেয়েদের খুন করে ফেলে। বীভৎস ভাবে পুড়িয়ে মারার কয়েকটি দৃশ্য রয়েছে এই সিনেমায়। আরেক দৃশ্যে আসামির খোঁজে নির্যাতন করে পুলিশ একজনকে মেরে ফেলে। আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়েই দম্ভিত খলনায়ক স্বাক্ষীদের খুন করার হুমকি দেয় যা আদালত অবমাননার সামিল। সিনেমাটিতে নায়ক একজন প্রতিবাদী যুবক কিন্তু খলনায়কের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেই অনেক অন্যায় করে এবং একের পর এক খুন করে যায়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে কোনো যুবক উদ্বুদ্ধ হয়ে এই নায়ককে অনুসরণ করতে পারে।

১১.	চলচ্চিত্র	ঃ পুলিশ অফিসার
	পরিচালক	ঃ মোঃ শরীফ উদ্দিন খান দিপু
	নায়ক-নায়িকা	ঃ আমিনখান/একা
		ঃ মেহেদী/ময়ুরী
	খলনায়ক	ঃ মিজু আহমেদ, রাজীব

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৩

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৫০মিনিট	৪টি, ১৬ মিনিট (১১%)	৩২ মিনিট (২১%)	১০২ মিনিট (৬৮%)

১৫০ মিনিটের এই সিনেমাটিতে সন্ত্রাস ৩২ মিনিট (২১%), নাচ-গান ১৬ মিনিট (১১%) এবং শুধু সংলাপ ১০২ মিনিট (৬৮%)। এর মধ্যে খলনায়কের " শালীর ছাও" জাতীয় অশালীন সংলাপই ছিল অধিকাংশ সময় জুড়ে।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটিতে খুন ধর্ষণের ঘটনাতো ছিল-ই, এর পাশাপাশি আর ও কিছু সন্ত্রাস দেখানো হয় যেমন পুলিশ কাস্টডিতে নির্যাতন, গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন, হাসপাতালে ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে হত্যা করা, গর্ভবতী নায়িকাকে ধাওয়া করে গর্ভপাত ঘটানো, ভারী অস্ত্র-সস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি। সিনেমার নায়ক একজন সৎ পুলিশ অফিসার,তার সততার জন্যে সে বার বার সাসপেন্ড হয়, এবং চারিদিকে তৈরি হয় অনেক শত্রু। সৎ হয়েও বরখাস্তকৃত অবস্থায় তার বাসায় যেসব আসবাবপত্র দেখানো হয় তা ছিল রীতিমতো আশ্চর্যজনক। তবে বাংলাদেশের সব পুলিশ অফিসার যদি নায়কের মতো সৎ ও মারামারিতে পারদর্শী হতো তাহলে হয়তো বাংলাদেশে কোনো দুর্নীতিই থাকতো না।

১২.	চলচ্চিত্র	ঃ দানব
	পরিচালক	ঃ বদিউল আলম খোকোন
	নায়ক-নায়িকা	ঃ মান্না/মুনমুন
		ঃ মেহেদী/মৌ
	খলনায়ক	ঃ সাদেক বচ্চু, মিশা সওদাগর

সারণি-১৪

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪৫ মিনিট	৬টি,২৭মিনিট(১৯%)	২২:৩০মিনিট (১৫%)	৯৫:৩০মিনিট (৬৬%)

সারণিতে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটিতে মারামারির চেয়ে গানের সময়ই বেশি ২৭মিনিট, যা মোট সময়ের (১৯%), সন্ত্রাস ২১ মিনিট (১৫%)। এবং সংলাপ ৯৫:৩০ মিনিট (৬৬%)। সিনেমাটিতে মোট ৮ বার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আছে।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমা শুরুই হয় সন্ত্রাস দিয়ে। শুরুতেই খলনায়ক একজন সৎ পুলিশ অফিসার ও তার স্ত্রীকে খুন করে। চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় একজন রাজনৈতিক নেতাকে খুন করা হয়। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নায়কের মা ও বোনকে বোমা মেরে হত্যা করা হয়। থানায় আসামি নির্যাতন দেখানো হয়। এছাড়া সিনেমায় ব্যবহৃত খলনায়কের সংলাপ গুলো ছিল বীভৎস এবং কুরুচিপূর্ণ। সিনেমার পোস্টারটিও

Dhaka University Institutional Repository

ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। এ সিনেমাতেই একজন সাধারণ বেবিট্যাক্সি চালক নায়কের পক্ষেই সম্ভব হয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য হওয়া। এছাড়া যে খলনায়কের ভয়ে একদিন সারা শহর কাঁপতো তাকে ও তার দলবলকে ভারি অস্ত্র-শস্ত্রের বিরুদ্ধে খালি হাতে নায়ক একাই পরাস্ত করে। এমন আজগুবি ঘটনাও দেখা যায় এ সিনেমাটিতে।

১৩.	চলচ্চিত্র	ঃ ঢাকাইয়া মাস্তান
	পরিচালক	ঃ মমতাজুল রহমান
	নায়ক-নায়িকা	ঃ শাহিন খান/ময়ূরী
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল

সারণি-১৫

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৩০ মিনিট	২টি, ১০মিনিট (৮%)	৩৫মিনিট (২৭%)	৮৫ মিনিট (৬৫%)

সিনেমাটিতে গান রয়েছে মোট সময়ের ৮%। সন্ত্রাস সহিংসতা ২৭%। এবং সংলাপ ৬৫%। অবশ্য খলনায়কের সংলাপগুলো বাদ দিলে এই সময়ের পরিমাণ অনেক কমে যাবে।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

গোলাগুলি খুন খারাপি ছাড়াও এ সিনেমাটিতে বেশ কিছু নতুন সন্ত্রাস দেখানো হয়েছে। যেমন- একজন মন্ত্রীকে খুন করার জন্যে খলনায়ক সভা স্থলে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বোমা স্থাপন করে। গলায় ইনজেকশন পুশ করে এক মেয়েকে হত্যা করে। সিনেমার সবচেয়ে লোকহর্ষক দৃশ্য দেখানো হয়েছে নায়কের ছোট ভাইকে হত্যার দৃশ্য। হাসপাতালে গিয়ে তরবারি দিয়ে ছোট ছেলেটিকে জবাই করে। চলচ্চিত্রের মতো মাধ্যমে এ রকম দৃশ্যের আদতে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

১৪.	চলচ্চিত্র	ঃ ক্ষ্যাপা বাসু
	পরিচালক	ঃ কমল সরকার
	নায়ক-নায়িকা	ঃ রিয়াজ/পপি
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল

সারণি-১৬

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৫০ মিনিট	৫টি,২৪মিনিট (১৬%)	২৪ মিনিট (১৬%)	১০২ মিনিট (৬৮%)

সারণিতে দেখা যায় মোট সময়ের ৩২% জুড়ে রয়েছে সন্ত্রাস সহিংসতা এবং নাচগান। বাকি ৬৮% সংলাপ।

Dhaka University Institutional Repository

সিনেমায় প্রদর্শিত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

এ সিনেমাটিতে মারামারির পরিমাণ কম থাকলেও খুন ও সহিংসতা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নায়কের মায়ের সামনে তার বোনকে ধর্ষণ করে। মারধর, গলায় পা দিয়ে চেপে ধরে ও জবাই করে খুন করার মতো বীভৎস দৃশ্যগুলোও দেখানো হয়েছে এই সিনেমায়।

১৫.	চলচ্চিত্র	ঃ গুন্ডার প্রেম
	পরিচালক	ঃ বাদশাভাই
	নায়ক-নায়িকা	ঃ রিয়াজ/ডিপজল/শাবনুর
	খলনায়ক	ঃ মিজু আহমেদ রাজিব

সারণি-১৭

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪২ মিনিট	৫টি, ২১মিনিট (১৫%)	২৬মিনিট (১৮%)	৯৫ মিনিট (৬৭%)

১৪২ মিনিটের এই সিনেমাটিতে নাচগান ছিল ২১ মিনিট, সন্ত্রাস ২৬ মিনিট এবং সংলাপ ৯৫ মিনিট।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটিতে কয়েকটি খুনের দৃশ্য রয়েছে। রাস্তা থেকে একটি ছেলেকে তুলে এনে কিভাবে গুন্ডা বানানো হয় তা দেখানো হয়। বেশির ভাগ সহিংসতাগুলোই ছোরা, চাকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সিনেমাটিতে একজন গুন্ডার ভেতরের মনটি দেখানো হয়েছে, পাশাপাশি এটিও দেখানো হয়েছে গুন্ডামি, সন্ত্রাসীর শেষ পরিণতি মৃত্যু। ইচ্ছে করলেও এখান থেকে ফিরে আসা যায় না।

১৬.	চলচ্চিত্র	ঃ আমার বউ
	পরিচালক	ঃ ইস্পাহানি আরিফ জাহান
	নায়ক-নায়িকা	ঃ ওমর সানি, শাকিল/পপি
	খলনায়ক	ঃ সাদেক বাচ্চু

সারণি-১৮

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪০ মিনিট	৬টি,২৪মনিট (১৭%)	১৪মিনিট (১০%)	১০২ মিনিট (৭৩%)

এ সিনেমাটিতে মারামারি সন্ত্রাসের পরিমাণ কম। মাত্র ১০% নাচগান রয়েছে মোট সময়ের ১৭% এবং ৭৩% সংলাপ।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটিতে নারী পাচারকারীরা নায়ককে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। সিনেমার কাহিনীটি ছিল মোটামুটি এরকম, নায়ককে আঘাত করে নায়িকাকে গুন্ডারা ধাওয়া করলে সে একজন মানসিক ডাক্তারের গাড়ির নিচে পড়ে। সে ভাবে নায়ক মারা গেছে। পরে ডাক্তার তাকে তার হাসপাতালে সেবিকার

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব দেন। একই হাসপাতালে ছিল মানসিক রোগী নায়ক যার মৃত স্ত্রী দেখতে অবিকল নায়িকার মতো ছিল। নায়ক তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে, ফলে তাকে সুস্থ করার দায়িত্ব পড়ে নায়িকার ওপরে, নায়িকা তার স্ত্রী সেজে তাকে সুস্থ্য করে তোলে, পাশাপাশি দেখা যায় নায়ক বেঁচে আছে, শুরু হয় দুই নায়কের দ্বন্দ্ব।

শেষ পর্যন্ত নায়ক তার ভুল বুঝতে পারে এবং নায়ক-নায়িকার পথ থেকে সরে আসে। সিনেমাটির সাথে ভারতীয় হারানো সুর বা দ্বীপ জ্বেলে যাই সিনেমাগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও, এ সিনেমাটি ঐ সিনেমাগুলোর মতো শৈল্পিক মান সম্পন্ন নয়, কারণ এ সিনেমাটির সাথে অপ্রয়োজনেই যুক্ত করা হয়েছে সন্ত্রাস ও যৌন উত্তেজক দৃশ্য।

১৭.	চলচ্চিত্র	ঃ গণ দুশমন
	পরিচালক	ঃ মনোয়ার হোসেন ডিপজল
	নায়ক-নায়িকা	ঃ মান্না/মুনমুন
		ঃ শাকিব খান/পপি
	খলনায়ক	ঃ মিজু আহমেদ, ডিপজল

সারণি-১৯

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১০৪ মিনিট	৩টি,১৩.৩০মনিট(১৩%)	২৮মিনিট(২৭%)	৬২.৩০ মিনিট (৬০%)

এ সিনেমাটিতে নাচগান রয়েছে মোট সময়ের ১৩%, সন্ত্রাস ২৭% এবং বাকি ৬০% সংলাপ। সিনেমাটিতে নায়কের অনেক সংলাপই ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। এছাড়া খলনায়কদের অশ্রাব্য সংলাপগুলো বাদ দিলে সিনেমায় কোনো সংলাপই থাকে না।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটি শুরুই হয় সন্ত্রাস দিয়ে। প্রথমেই দেখা যায় ১ জনকে খুন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরো সিনেমায় রয়েছে প্রচুর খুনখারাবি, বোমাবাজি ও গোলাগুলির দৃশ্য। এখানে স্কুলের বাচ্চাদের বাস ছিনতাই করার একটি দৃশ্য রয়েছে। থানার ভেতরে হাজতির উপর অমানুষিক নির্যাতনের দৃশ্য দেখানো হয়, এ সিনেমাটিতে থানায় খলনায়ক এসে পুলিশের পোশাক পরে এক হাজতিকে নির্যাতন করে, পুলিশের পোশাক পরেই একজন পুলিশ আরেকজন অসৎ পুলিশ অফিসারকে গুলি করেন। এসব দৃশ্য দেখে যুবক শ্রেণীর দর্শকরা যেকোনো সময় বাস্তব ক্ষেত্রে, এগুলো প্রয়োগ করতে পারে।

১৮.	চলচ্চিত্র	ঃ বিচ্ছু বাহিনী
	পরিচালক	ঃ মাসুম পারভেজ রুবেল
	নায়ক-নায়িকা	ঃ রুবেল/মিনা, সিবানী
	খলনায়ক	ঃ হুমায়ুন ফরিদী

সারণি-২০

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১২০ মিনিট	২৫মনিট (১২.৫%)	৩১মিনিট (২৬%)	৭৪ মিনিট (৬১.৫%)

দুই ঘন্টার এই সিনেমাটিতে নাচ গান আছে ১৫ মিনিট, মারামারি সন্ত্রাস ২৬ মিনিট। আর বাকি ৭৪ মিনিট সংলাপ।

Dhaka University Institutional Repository

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

ভারতীয় একটি সিনেমার আড়ালে তৈরি সিনেমাটিকে শিশুদের একটি কমেডি সিনেমা বলা যেতো যদি না এতে মারামারি ও বীভৎসতা কম থাকতো। নায়ক কিছু অনাথ ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলে যারা এলাকার বিভিন্ন অন্যায় প্রতিরোধ করে। সিনেমাটিতে মোট ১১ বার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ছিল। এগুলোতে চাকু, হকিস্টিক, স্টার ব্যবহৃত হয়েছে। পুতুলের ভেতরে বোমা রেখে একটি শিশুকে হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল অসহনীয়। নায়ক নায়িকাকে ধরার জন্যে বিষ মেশানো তীর ব্যবহার করা হয় এবং বিচ্ছু বাহিনীকে হত্যা করার জন্যে একটি করাতের নিচে বেঁধে রাখাটিও ছিল অমানবিক। সিনেমার ব্যানারে পরিচালক সিনেমাটিকে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম বলেছিলেন। কিন্তু নায়িকার আবির্ভাব ও নাচগান সেটি মিথ্যা প্রমাণ করেছে। তাছাড়া সিনেমা দেখে দেশের অন্যান্য শিশুরাও যদি চোরাচালানীদের ধরার জন্যে এমন বাহিনী গড়ে তুলে তাতে অবাক হবার কিছুই থাকবে না।

১৯.	চলচ্চিত্র	ঃ বাপ-বেটির যুদ্ধ
	পরিচালক	ঃ দেলোয়ার জাহান জন্টু
	নায়ক-নায়িকা	ঃ শাকিব খান/পপি
	খলনায়ক	ঃ নাসির খান

সারণি-২১

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৪২ মিনিট	৪টি, ২০মনিট (১৪%)	১৫মিনিট (১১%)	১০৭ মিনিট (৭৫%)

সোয়া দুই ঘন্টার এই সিনেমাটিতে নাচ গান আছে ২০ মিনিট, মারামারি সন্ত্রাস ১৫ মিনিট। আর বাকি ১০৭ মিনিট সংলাপ।

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটিতে সাধারণ যে মারামারি ছিল তা ছিল দুই যুবকের। একই নায়িকার ওপর আসক্তির কারণে তাদের যুদ্ধ হাতাহাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সিনেমায় বন্দুকের ব্যবহার সামান্য থাকলেও সেটি ছিল ভাইয়ের সম্পত্তি দখলের চেষ্টায়। এখানে একটি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দেখানো হয়, সেটি হলো দুধের সাথে বিষ মিশিয়ে তিনটি শিশুকে মেরে ফেলা হয়। এছাড়া সিনেমায় কোনো সন্ত্রাস সহিংসতা ছিল না। কিন্তু এ ধরনের সুস্থ্য চলচ্চিত্র বর্তমান দর্শকদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য সেটাই দেখার বিষয়।

২০.	চলচ্চিত্র	ঃ মুখোমুখি
	পরিচালক	ঃ আজিজ আহমেদ বাবুল
	নায়ক-নায়িকা	ঃ আমিন খান/পুর্নিমা
		ঃ শাহিন খান/ময়ুরী
	খলনায়ক	ঃ ডিপজল, মিজু আহমেদ

সারণি-২২

চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য (সময়)	নাচগান	সন্ত্রাস	সংলাপ
১৫০ মিনিট	৩৩ মনিট (২২%)	১৯ মিনিট (১৩%)	৯৮ মিনিট (৬৫%)

সারণিতে দেখা যায় এ সিনেমাটিতে সহিংসতার চেয়ে নাচগানের পরিমাণই বেশি যা মোট সময়ের ২২% সন্ত্রাস সহিংসতা মোট সময়ের ১৩% এবং সংলাপ রয়েছে ৬৫%

Dhaka University Institutional Repository

সিনেমায় ব্যবহৃত সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

সিনেমাটিতে প্রচুর পরিমাণে গোলাগুলি দেখানো হয়। অনেক খুনের দৃশ্য থাকলেও একটি খুনের দৃশ্য ছিল খুবই বীভৎস। এছাড়া এখানে সিনেমার সুটিং-এর নামে গাড়ি দিয়ে বড় বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলার একটি দৃশ্য আছে। সিনেমাটিতে রাস্তা থেকে একটি ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে শহরের টপটেরর বানানো হয়। পরবর্তীতে দেখানো হয় সে ভালো হয়ে যেতে চাইলেও তাকে সে পথ থেকে ফিরতে দেয়া হয় না।

চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস; প্রেক্ষপট বাংলাদেশ এ গবেষণার আলোকে বলা যায় কিছু কিছু প্রযোজক পরিচালকের ব্যবসায়ী মনোভাব সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাবের কারণে চলচ্চিত্রকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করেছে। এবং তাদের মূল্য লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। মূলতঃ চলচ্চিত্র নির্মাণে নীতিমালা অনুসরণ না করা, সেন্সরবোর্ডের নির্লিপ্তার সুযোগ ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ব্যবসায়িক মানসিকতার কারণে চলচ্চিত্রে সন্ত্রাসের দৃশ্যাবলীর বিস্তৃতি ঘটেছে। পাশাপাশি যুব সমাজে পর্যাপ্ত বিনোদনের অভাব, নৈতিক অধ:পতন, অভিভাবকদের অসচেতনাতা, সমাজের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এ দেশের যুবক শ্রেণীকে সন্ত্রাসধর্মী কাজে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং নতুন নতুন কৌশল শেখাচ্ছে।

বাংলেদেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারার উত্তরণের জন্যে এই গবেষনা থেকে যেসব সুপারিশ উঠে এসেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারকে পৃষ্টপোষকতা করতে হবে। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। চলচ্চিত্রে সব ধরণের সংলাপ শালিন হতে হবে। সরকারকে সেন্সর বোর্ডের এ ধরণের ছবিকে সেন্সর সার্টিফিকেট দেয়ার বিষয়গুলো তদন্ত করতে হবে এবং নিরপেক্ষ ও যোগ্য লোক নিয়ে সেন্সরবোর্ড গঠন করতে হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রযোজক পরিচালক, সংলাপ লেখক সকলের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সবশেষে বলবো, ইরাণ দেশের চলচ্চিত্র বর্তমান বিশ্বে সুস্থ চলচ্চিত্রের জনক। সুস্থ চলচ্চিত্রের দিক থেকে ইরান যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা আমাদের অনুসরণ করা উচিত। মুলতঃ ইসলামিক ভাবধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ইরান যে সুস্থ চলচ্চিত্রের বিরল নজীর সৃষ্টি করেছে, যা অনুস্মরণ যোগ্য।

তথ্যপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকাঃ

১. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০২, প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃষ্ঠা-১০

২. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০২, প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃষ্ঠা-১০

৩. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০২, প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃষ্ঠা-১০-১১

৪. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০২, প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃষ্ঠা-১১

৫. দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার বিনোদন পাতা, ১২ ফেব্রুয়ারী-২০০২।

এছাড়াও সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পত্র পত্রিকা

১. দৈনিক জনকন্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক প্রথম আলো, ও সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার বিনোদন পাতা (জানুয়ারী ২০০০- ফেব্রুয়ারী ২০০২)।

২. হোসেন জাকির, রাজু উদ্ভূত চলচ্চিত্রের চালচিত্র, চলচ্চিত্র ফিল্ম সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯০।

৩. কাদের মির্জা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪. ফাহমিদুল হক, সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্রঃ ব্যর্থ গণমাধ্যমের কাহিণী, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

৫. মোকাম্মেল, তানভীর, সিনেমার শিল্পরূপ, আগামী প্রকাশনী (১৯৯৮), ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস একটি সমীক্ষা

একটি জাতির মেরুদন্ড তার শিক্ষিত সমাজ। যে-জাতি যত শিক্ষিত সে-জাতি তত উন্নত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের আকার এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, এই মুহূর্তে এর চেয়ে বড় সমস্যা জাতীয় জীবনে আর নেই।

শিক্ষাঙ্গণে 'সন্ত্রাস' শব্দটি বর্তমানে যে-অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-সংগঠনগুলির মধ্যে বন্দুক, অন্য কোন অস্ত্র বা লাঠিসোঁটা দিয়ে যুদ্ধ, ছাত্র হত্যা, অবৈধভাবে হল বা হোস্টেলের কক্ষ দখল ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র-সংগঠনের ছাত্রদের জোর করে বের করে দেয়া, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মাণ-কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা, হুমকি ও ভীতি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজে বাধা প্রদান করা ইত্যাদি কর্মকান্ড।

সন্ত্রাসের কারণে জাতি মেধাশূন্যতার দিকে এগুচ্ছে। সন্ত্রাস, হানাহানি, রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্ররা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। আমাদের অর্থনীতি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে অপচয় হচ্ছে মূল্যবান দেশীয় মুদ্রা। সকল ছাত্রের স্লোগান হওয়া উচিত-

অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরি
সবাই এসো
লেখাপড়া করি। [১]

ডঃ আলী নবী বলেন, The violence in the education campus must be stopped for our great success. এজন্য আমাদের সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। [২]

ডঃ আলী আশরাফ বলেন, Violence in the education campus is a great threat to the peaceful educational environment. [৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "মুহূর্তে তুলিয়া শির, একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে, যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমার চেয়ে।" [৪]

কবি সুফিয়া কামাল বলেন, **"দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয় করে জয়**
তাহাদের পরিচয় লিখে রাখে মহাকাল।" [৫]

আশা করা গিয়েছিল ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে জাতি এই সন্ত্রাস নামক দানবের হাত থেকে নিস্তার পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ডাকসু নির্বাচনে ব্যালটবাক্স ছিনতাই ও মোহসীন হলে সাতজন ছাত্রহত্যার মত লোমহর্ষক ঘটনা। এ ছাড়া গুপ্ত খুন ও ছিনতাই নিত্যদিনকার ঘটনায় পর্যবসিত হলো। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস চরম রূপ নেয় হোসাইন মোঃ এরশাদের নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনের আমলে-------- এর শুরুটা যদিও বিএনপি সরকারের অবদান। স্বৈরাচারী এরশাদ নিজ দলীয় ছাত্রসংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বস্তুত প্রতিটি ছাত্রসংগঠনেই নিজস্ব অনুচর বাহিনী গড়ে তোলেন। এরা ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। এক সংগঠনকে অন্য সংগঠনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। লক্ষ্য করা যায়, হলে সিট দখলের মত মামুলি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৪ বছর অতিক্রমের পরও সরকার, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ তথা জাতি যুব-সমাজের জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তারই ফলে দেশে আজ সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেজনজট এবং বেকারত্বের কারণে যুব ও ছাত্র-সমাজে বর্তমানে সন্ত্রাসের আনাগোনা।

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং গবেষণার উদ্দেশ্যঃ দেশে বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণে আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি, পত্রিকার পাতায় লেখা ইত্যাদি অনেক কিছুই হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা না কমে বরং এর পরিধি বেড়েই চলেছে।

মূলতঃ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কালোহাত সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের ভিত্তিতে এই নিবন্ধ রচিত এবং বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সন্ত্রাস নিরসনে দিকনির্দেশনাই এ গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য।

পদ্ধতিঃ বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাকে গবেষণাক্ষেত্রে হিসেবে নির্বাচন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর আশেপাশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলি থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে ১৫০ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও রাজনীতিবিদগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নমুনায়নে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী, ৩০ জন শিক্ষক, ৩০ জন অভিভাবক এবং ৩০ জন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদকে (বিশেষত প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে) নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশেষভাবে তৈরি সাক্ষাৎকার অনুসূচীর সাহায্যে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তথ্য সংগ্রহ করে জরিপ-কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

উত্তরদাতাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ প্রথমেই এটা বলা প্রয়োজন যে, উত্তরদাতাদের নমুনায়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোন আনুপাতিক বন্টন-নীতি অনুসরণ করা হয়নি। সন্ত্রাসী ঘটনায় মুখ্যত পুরুষদেরকে জড়িত থাকতে দেখা যায়, তাই নমুনায়নে পুরুষদের প্রাধান্য বিদ্যমান। তবে মহিলা উত্তরদাতাদের একেবারে বাদ দেয়া হয়নি। উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উত্তরদাতার শতকরা হার হচ্ছে যথাক্রমে ৮৮% এবং ১২%। বয়সের বিবেচনায় দেখা যায় ৩০-৫০ উর্ধ্ব বয়সের উত্তরদাতার হার ৫৬% এবং ২০-৩০ বয়স-সীমার উত্তরদাতা ৪৪%। সুতরাং বয়স-সীমার বিবেচনায় বলা যায় যে, উত্তরদাতাদের সবাই কমবেশি যুক্তিনির্ভর মতামত প্রদানে সমর্থ।

ফলাফল ও আলোচনাঃ শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের যন্ত্রণা কিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে অনিশ্চয়তার পঙ্কিল গর্ভে তলিয়ে দিচ্ছে এবং এতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও এমনকি সমগ্র জাতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কিভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া এবং সন্ত্রাসের সূত্র ও স্বরূপ, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টির পেছনে কি কি কারণ ক্রিয়াশীল এবং এ সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও রাজনীতিবিদদের মতামত যাচাই করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের কারণঃ সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে, সন্ত্রাস নানাবিধ কারণে সংঘটিত হয়। মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি ও অনেক সময় ভ্রান্ত মোহের বলে অনেকে সন্ত্রাসী কর্মে প্ররোচিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত সন্ত্রাসীরা ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা মূলত তাদের কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে নানাবিধ কারণ। তাই উত্তরদাতাদের মতামতে প্রতিফলিত প্রাধান্যের মাত্রায় সন্ত্রাসের কারণ সম্পর্কিত মতামতগুলির একটি তুলনামূলক চিত্র সারণীঃ ১-এ উপস্থাপিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ১

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে রাজনৈতিক কারণ কিভাবে দায়ী সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক অভিমত

অভিমত	উত্তরদাতাদের মতামতের প্রাধান্যের স্কেলে নিরূপিত গড় স্কোর				
	ছাত্র ৬০ জন	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	রাজনীতিবিদ ৩০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক দলীয় স্বার্থে শিক্ষাঙ্গণে ছাত্রসংগঠনের ব্যবহার	৪.২৭	৪.২৭	৪.৫৩	৪.০৬	১৭.১৩
শিক্ষাঙ্গণে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা	৩.৯০	৩.৮৩	৩.৯৭	৩.৯৩	১৫.৬৩
ছাত্র-সংগঠন কর্তৃক ছাত্রাবাস দখলের জন্য পেশী-শক্তির ব্যবহার	৩.৪০	৩.৭৭	৩.৯০	৩.৮৭	১৪.৯৪
বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনগুলির মধ্যে আঞ্চলিক/উপদলীয় কোন্দল	৩.৩৮	৩.৪৭	৩.৯০	৩.৮৩	১৪.৫৮
রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের অংশগ্রহণ	৩.৫৭	৩.৬০	৩.৬৭	৩.৪৭	১৪.৩১

উত্তরদাতাদের মতামতে প্রাধান্য-প্রাপ্ত গড় স্কোর (Mean Score in the Scale of Preference) প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আলাদাভাবে নিরূপণ করা হয়েছে। মতামতের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার জন্যই সকল গ্রুপের মতামতের প্রাধান্য-প্রাপ্ত গড় স্কোর একই সারণীতে সন্নিবেশিত করা হলো।

সারণীঃ ১-এ সন্নিবেশিত তথ্য থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক ও রাজনীতিবিদগণ সবাই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকর্তৃক শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র-সংগঠনগুলি ব্যবহৃত হয় বলেই শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ছাত্র-সংগঠনগুলি ব্যবহৃত হয় বলেই শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ছাত্র-সংগঠনগুলির প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে উত্তরদাতাগণ দলমত নির্বিশেষে তাদের মতামতে দ্বিতীয় প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন্ গড় স্কোরের সমষ্টি (১৭.১৩ এবং ১৫.৬৩) ও উপর্যুক্ত কারণ দুটিকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অনুরূপভাবে গড় স্কোরের সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রাবাস দখল, উপদলীয় বা আঞ্চলিকতার প্রভাব এবং রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় সংসদ নির্বাচনে ছাত্র-সংগঠনগুলির অংশ গ্রহণকে যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের প্রাধান্যপ্রাপ্ত কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তবে শেষের এই তিনটি কারণে অভিভাবক ও রাজনীতিবিদদের মতামতের প্রাধান্যে ক্রমধারা লক্ষনীয় হলেও ছাত্র ও শিক্ষকগণের মতামতের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ছাত্রাবাস দখলে পেশী-শক্তির ব্যবহারের বেলায় যেখানে শিক্ষকগণ ৩য় গুরুত্বের প্রাধান্য দিয়েছেন (গড় স্কোর ৩.৭৭%), ছাত্ররা সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় সংসদ নির্বাচনে ছাত্র-সংগঠনগুলির অংশগ্রহণকে ৩য় স্তরে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মতামতের প্রাধান্য দান করেছে (গড় স্কোর ৩.৫৭, সারণীঃ ১)। তবে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে শুধু রাজনৈতিক প্রভাবই এককভাবে দায়ী নয়। উত্তরদাতাদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক সময় শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণও ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে উত্তরাদাতাদের মতামত সারণীঃ ২-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণীঃ ২- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক কারণ কিভাবে সন্ত্রাসের মদদ যোগায় সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক অভিমত

সন্ত্রাসের অর্থনৈতিক কারণ সম্পর্কে অভিমত	উত্তরদাতাদের মতামতের প্রাধান্যের স্কেলে নিরূপিত গড় স্কোর				
	ছাত্র ৬০ জন	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	রাজনীতিবিদ ৩০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
স্বার্থান্বেষী মহল কালো টাকার লোভ দেখিয়ে পরিকল্পিতভাবে দরিদ্র ও অভাবী ছাত্রদের মাধ্যমে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে	৪.১২	৪.৩০	৪.২০	৪.২১	১৬.৮৩
শিক্ষাঙ্গণে কর্মরত ঠিকাদারদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়	৩.৪২	৩.৫৩	৩.৭০	৩.৯৭	১৪.৬২
চাঁদা আদায়ে সচেষ্ট ছাত্রদের মধ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে	৩.৪৮	৩.৬০	৩.৭৭	৩.১০	১৪.৯৫
সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারলে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তি সহজ হয়	৩.৮৩	৩.৮৭	৩.৪০	৩.৭০	১৪.৮
অবৈধ অর্থ ছাত্রদেরকে উগ্র ও অসহিষ্ণু করে তোলে, ফলে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়	৩.৬০	৩.৫৩	৩.৪৩	৩.৩৩	১৩.৮৯

'অর্থই যে অনর্থের মূল' একথা শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিক্ষাঙ্গণও কালো টাকার থাবা থেকে মোটেই রেহাই পাচ্ছে না। তাই ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং রাজনীতিবিদ সবাই মনে করেন যে, কালো টাকার প্রলোভনই হচ্ছে প্রধান অর্থনৈতিক কারণ, যার মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল গরিব ছাত্রদেরকে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে ব্যবহার করে থাকে।

মতামতের গড় স্কোরের সমষ্টিও এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক (গড় স্কোর ১৬.৮৩; সারণীঃ ২)। উত্তরদাতাদের মতামত বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, চাঁদা আদায়ে সচেষ্ট ছাত্রদের মধ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে (গড় স্কোরের সমষ্টি ১৪.৯৬)। অন্যদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারলে অর্থনৈতিক সুবিধার বিষয়টি তৃতীয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (গড় স্কোরের সমষ্টি ১৪.৮)। কিন্তু উত্তরদাতাদের মতামতের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, উপর্যুক্ত দ্বিতীয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতামতকে রাজনীতিবিদ ও অভিভাবকগণ (গড় স্কোর যথাক্রমে ৩.১০ ও ৩.৭৭) দ্বিতীয় প্রাধান্য দিলেও শিক্ষক ও ছাত্রদের মতামতের বেলায় তা হয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতামত (গড় স্কোর যথাক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬০ ও ৩.৪৮)। এমনিভাবে মতামতের মাত্রাগত অনৈক্য থাকলেও গড় স্কোরের সমষ্টি বিবেচনায় ঠিকাদারদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের প্রবণতা এবং অবৈধ অর্থের ফলে সৃষ্ট অসহিষ্ণু মনোভাব যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে উত্তরদাতাদের নিকট বিবেচিত হয়েছে (সারণীঃ ২)

শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণই শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সহায়ক হয় এমন চিন্তা এখন আর সঠিক বিবেচিত হচ্ছে না। এগুলো অবশ্যই প্রধান কারণগুলোর অন্যতম তাতে কোন সন্দেহ নেই তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসনিক ত্রুটিকেও আজ আর সন্ত্রাসের সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসনিক ত্রুটি সন্ত্রাস সৃষ্টিতে কিভাবে দায়ী সে সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও রাজনীতিবিদদের অভিমত সারণীঃ ৩-এ দেখানো হলো।

সারণীঃ ৩ - শিক্ষাঙ্গণে ব্যবস্থাপনা/প্রশাসনিক ত্রুটি সন্ত্রাস সৃষ্টিতে কিভাবে দায়ী সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক অভিমত

মতামত	উত্তরদাতাদের মতামতের প্রাধান্যের স্কেলে নিরূপিত গড় স্কোর				
	ছাত্র ৬০ জন	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	রাজনীতিবিদ ৩০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট অব্যবস্থা সন্ত্রাসের সহায়ক হয়	৩.৯৭	৪.১০	৪.০০	৩.৮৩	১৫.৯
বিদ্যমান পাঠক্রম ও পরীক্ষা-ব্যবস্থায় সারা বছর না পড়েও পাশ করা যায়	৪.৩৭	৩.৬৭	৩.৬৩	৩.৬০	১৫.২৭
শিক্ষিত যুবকদের সম্ভাব্য বেকার-জীবনের হতাশা	৩.৩৭	৩.৪৭	৩.৪০	৩.৬০	১৩.৮৪
অসহনীয় সেশন-জট	৩.৫২	৩.৭০	৩.৫৩	৩.৯৩	১৪.৬৮
শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত উপস্থিতি অপরিহার্য/ বাধ্যতামূলক না হওয়া	৩.৭২	৩.৪৭	৩.৫৭	৩.৭৩	১৪.৪৯

উত্তরদাতাদের মতামতের সমষ্টি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সন্ত্রাস সৃষ্টিতে প্রশাসনিক অব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি দায়ী (গড় স্কোরের সমষ্টি ১৫.৯)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতামত হচ্ছে বিদ্যমান পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিজনিত কারণ (গড় স্কোরের সমষ্টি ১৫.২৭), তৃতীয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতামত হচ্ছে অসহনীয় সেশনজট (গড় স্কোরের সমষ্টি ১৪.৬৮), উত্তরদাতাগণের সমষ্টিগত মতামতে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রাধান্য পেয়েছে যথাক্রমে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির ক্ষেত্রে শৈথিল্য (স্কোর সমষ্টি ১৪.৪৯) এবং শিক্ষিত যুবকদের সম্ভাব্য বেকারজীবনের হতাশা (গড় স্কোর সমষ্টি ১৩.৮৪, সারণীঃ ৩)

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যবস্থাপনা/প্রশাসনিক ত্রুটিজনিত কারণের উল্লেখ থাকলেও ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদাসীনতা শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে কতটুকু সহায়ক সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের অভিমতের নমুনা সারণীঃ ৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৪- শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদাসীনতা কিভাবে সহায়ক সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক অভিমত

অভিমত	উত্তরদাতাদের মতামতের প্রাধান্যের স্কেলে নিরূপিত গড় স্কোর				
	ছাত্র ৬০ জন	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	রাজনীতিবিদ ৩০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
ছাত্ররা সন্ত্রাস সম্পর্কে সচেতন নয়	৩.৬০	৩.৭৩	৩.৮০	৪.১৩	১৫.২৬
শিক্ষকগণ শিক্ষাঙ্গণের নিয়মকানুন প্রয়োগে উদাসীন	৩.৮০	৩.৬০	৪.০৭	৩.৮০	১৫.২৭
শিক্ষকগণ সন্ত্রাস সম্পর্কে আপোষমূলক মনোভাব পোষণ করেন	৩.৮৭	৩.৫৭	৪.১৩	৩.৯৩	১৫.৫
অভিভাবকগণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নীরব ভূমিকা পালন করেন	৩.৬২	৩.৫৭	৩.৮০	৪.০৩	১৫.০২
পারিবারিক পরিবেশে সন্ত্রাসীরা তিরস্কৃত নয়	৩.৩৭	৩.৪৭	৩.৫৩	৩.৫৭	১৩.৯৪

উত্তরদাতাদের সমষ্টিগত বিবেচনায়ও দেখা যায় যে, শিক্ষকদের ভূমিকাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষকদের আপোষমূলক মনোভাবকে মতামত স্কেলে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (গড় স্কোর সমষ্টি ১৫.৫)। এবং শিক্ষাঙ্গণের নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উদাসীনতাকে সমষ্টিগত মতামত স্কেলে দ্বিতীয় মাত্রার গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে (গড় স্কোর সমষ্টি ১৫.২৭)। সমষ্টিগত মতামতে আরও দেখা যায় যে, ছাত্রদের অসচেতনতা (গড় স্কোর সমষ্টি ১৫.২৬) এবং সন্ত্রাস সম্পর্কে অভিভাবকদের নীরবতা (গড় স্কোর সমষ্টি ১৫.০২) যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রাধান্যের মাত্রায় উত্তরদাতাগন উল্লেখ করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সব ধরনের উত্তরদাতাই পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবকে সর্বনিম্ন মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে সমষ্টিগত মতামতও অনুরূপ, যদিও সাধারণভাবে পারিবারিক প্রভাবকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক বলে গণ্য করা হয় (সারণীঃ ৪)।

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের বিভিন্ন ধরনের কারণ উত্তরদাতাদের মতামত পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়েছে। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কোন কোন রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তি কিংবা নেপথ্য প্রভাব-বলয় ঐ কারণগুলোকে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য সক্রিয় করে তোলে এবং এর ফলেই তারুণ্যের উচ্ছলতায় পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে যুবসমাজের অনেক সদস্য সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস সারণীঃ ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৫- শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের পেছনে ক্রিয়াশীল প্রভাব-বলয় সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক অভিমত

সন্ত্রাসের নেপথ্য শক্তি সম্পর্কে মতামত	উত্তরদাতা				
	রাজনীতিবিদ (৩০ জন)	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	ছাত্র ৬০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
রাজনৈতিক দল	১৪ (৪৬.৬৭)	২৫ (৮৩.৩৩)	২৮ (৯৩.৩৩)	৫১ (৮৫.০০)	১১৮ (৭৮.৬৭)
অর্থনৈতিক প্রভাব	৫ (১৬.৬৭)	১০ (৩৩.৩৩)	০৪ (১৩.৩৩)	১২ (২০.০০)	৩১ (২০.৬৭)
শিক্ষক-রাজনীতি	০৩ (১০.০০)	০১ (৩.৩৩)	০৭ (২৩.৩৩)	০৯ (১৫.০০)	২০ (১৩.৩৩)
কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব	০৫ (১৬.৬৭)	-	০৩ (১০.০০)	১১ (১৮.৩৩)	১৯ (১২.৬৭)
ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব	০৮ (২৬.৬৭)	০৬ (২০.০০)	০১ (৩০.৩৩)	১১ (১৮.৩৩)	২৬ (১৭.৩৩)

(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

সন্ত্রাসের পেছনে চালিকা শক্তি প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত থেকে এটা স্পষ্ট যে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৭৮.৭৬) রাজনৈতিক দলের প্রভাবকেই শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সমষ্টিগতভাবে উত্তরদাতাদের তিন পঞ্চমাংশেরও বেশি (৭৮.৬৭%) রাজনৈতিক দলের প্রভাবকে সন্ত্রাসের নেপথ্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেও রাজনীতিবিদদের অর্ধেকেরও কম (১৬.৬৭%) এ মতের পক্ষে বলেছেন। এতে রাজনীতিবিদদের গা বাঁচিয়ে চলার মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। উত্তরদাতাদের নিকট অর্থনৈতিক প্রভাব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অন্যতম হেতু হিসেবে বিবেচিত হলেও মাত্র এক-পঞ্চামাংশ (২০.৬৭%) উত্তরদাতা এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। বাইরে থেকে অনেকে শিক্ষক-রাজনীতিকে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের নেপথ্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করলেও উত্তরদাতাদের মতামতে তার প্রতিফলন ঘটেনি এবং মাত্র ১৩.৩৩% উত্তরদাতা সন্ত্রাসের সাথে শিক্ষকদেরকে জড়িত করেছেন। কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বও এক্ষেত্রে কোন শক্তিশালী কারণ হিসেবে গণ্য হয়নি। কারণ, এর স্বপক্ষে মাত্র ১২.৬৭% উত্তরদাতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবকে প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ উত্তরদাতা (১৭.৩৩%) সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে অভিভাবকদের মতামতে তাঁদের নেতিবাচক (৩.৩৩%) মনোভাবই ফুটে উঠেছে বলা যায়।

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনঃ সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা

এটা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস যে-কোন জাতির জন্যই এক অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। তাই দেশের সর্বস্তরের জনগণের উচিত উক্ত অনভিপ্রেত সামাজিক সমস্যাটি নিরসনের জন্য যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সন্ত্রাসের যোগসূত্র উত্তরদাতাদের মতামতে অনেকটা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। তাই সন্ত্রাস দমনে সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত যাচাই করা হয়। এ প্রসঙ্গে সারণীঃ ৬-এ উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৬ - শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক অভিমত

অভিমত	উত্তরদাতা				
	ছাত্র ৬০ জন	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	রাজনীতিবিদ ৩০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
সরকার ও বিরোধীদলের ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা	২৫ (৪১.৬৭)	১৩ (৪৩.৩৩)	১৯ (৬৩.৩	১৭ (৫৬.৬৭)	৭৪ (৪৯.৩৪)
সন্ত্রাসীদের স্ব স্ব দল থেকে বহিস্কার	৩৮ (৬৩.৩৩)	১০ (৩৩.৩৩)	১৭ (৫৬.৬৭)	১১ (৩৬.৬৭)	৭৬ (৫০.৬৭)
পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয়া	১২ (২০.০০)	-	-	৪ (১৩.৩৩)	১৬ (১০.৬৭)
ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করা	১৩ (২২.৬৭)	৭ (২৩.৩৩)	১০ (৩৩.৩৩)	৩ (১০.০০)	৩৩ (২২.০০)
ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ করা	-	৫ (১৬.৬৭)	২ (৬.৬৭)	-	৭ (৪.৬৭)

(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের স্বরূপ ও পরিণতি পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, সন্ত্রাসের অশুভ প্রভাব সমাজ-জীবনে কতটা ভয়ংকর ও ক্ষতিকর। সন্ত্রাসের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিক্ষাঙ্গণ তথা দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার প্রয়াসে সরকারী ও বিরোধীদলের ভূমিকা উত্তরদাতাগণ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। উত্তরদাতাদের অর্ধেক অংশ (৫০.৬৭%) মনে করেন যে, সন্ত্রাসীদেরকে সরকার ও বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল তাদের সংগঠন থেকে বহিস্কার করলে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমন সহজতর হবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষক (৩৩.৩৩%) ও রাজনীতিবিদ (৩৬.৬৭%) অপেক্ষা ছাত্র (৬৩.৩৩%) ও অভিভাবকগণ (৫৬.৬৭%) অধিক সংখ্যায় সোচ্চার হয়েছেন। পক্ষান্তরে, সরকার ও বিরোধীদলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে সন্ত্রাস দমনের প্রচেষ্টার কথাও প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন।

সরকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশের নিরপক্ষভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রয়োগকে (১০.৬৭%), রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ভিত্তিক ছাত্র-রাজনীতি বন্ধকরণ (২২.০০%) এবং ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ (৪.৬৭%) উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। তবে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা ছাড়া সকলেই শিক্ষাঙ্গণের সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোকাবিলা ও দমনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন (সারণীঃ ৬)।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ভূমিকাঃ

একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালকমন্ডলী/বৈধ কর্তৃপক্ষের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তার নিজস্ব আইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু আইনানুগ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গণে অবলীলাক্রমে সন্ত্রাস সংঘটিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। তাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন কোনভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনে কর্তৃপক্ষের কিরূপ ভূমিকা পালন করা উচিত সে প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত সারণীঃ ৭-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৭- শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক অভিমত

অভিমত	উত্তরদাতা				
	ছাত্র ৬০ জন	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	রাজনীতিবিদ ৩০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে বহিস্কার করা	৪১ (৬৮.৩৩)	২১ (৭০.০০)	১৭ (৫৬.৬৭)	১৮ (৬০.০০)	৯৭ (৬৪.৬৭)
পরীক্ষা ও পাঠদান যথাসময়ে শেষ করা	২৪ (৪০.০০)	০৪ (১৩.৩৩)	০৮ (২৬.৬৭)	১৩ (৪৩.৩৩)	৪৯ (৩২.৬৭)
হল/হোস্টেলে মেধানুযায়ী সিট বন্টন	৪৫ (৭৫.০০)	০২ (৬.৬৭)	০২ (৬.৬৭)	০৩ (১০.০০)	৫২ (৩৪.৬৭)
শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও আঞ্চলিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা	১৯ (৩১.৬৭)	০১ (৩.৩৩)	০২ (৬.৬৭)	০১ (৩.৩৩)	২৩ (১৫.৩৩)
আইনের যথাযথ প্রয়োগ	২৫ (৪১.৪৭)	০৭ (২৩.৩৩)	০৫ (১৬.৬৭)	১৬ (৫৩.৩৩)	৫৩ (৩৫.৩৩)
শিক্ষাঙ্গণে যথোপযুক্ত আচরণবিধি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা	১০ (১৬.৬৭)	০৩ (১০.০০)	০১ (৩.৩৩)	০২ (৬.৬৭)	১৬ (১০.৬৭)

(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

উত্তরদাতাদের অভিমতের নমুনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা তাদের সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে শিক্ষাঙ্গণ থেকে তাদের বহিস্কার করার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন (৬৪.৬৭%)। এ প্রসঙ্গে প্রদত্ত মতামতের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ (৬০%) ও অভিভাবকদের (৫৬.৬৭%) তুলনায় শিক্ষক ও ছাত্র উত্তরদাতাগণ (যথাক্রমে ৭০% ও ৬৮.৩৩%) বেশি সোচ্চার। মতামতের সমষ্টিগত পরিস্থিতি বিবেচনায় আইনের প্রয়োগ এবং হল/হোস্টেলে মেধানুযায়ী সিট বন্টন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মর্যাদাপ্রাপ্ত মতামত হলেও উভয় ক্ষেত্রেই উত্তরদাতাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয়। শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও আঞ্চলিকতার প্রশ্নেও দেখা যায় একমাত্র ছাত্রদের মতামত (৩১.৬৭%) ছাড়া অন্যান্য উত্তরদাতা এ বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেননি। এ বিষয়ে তাই ছাত্রদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে ধরে নেয়া যায় (সারণীঃ ৭)

পরীক্ষা ও পাঠদান যথাসময়ে শেষ করার বিষয়ে সম্মিলিতভাবে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২.৬৭%) উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করলেও এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ (৪৩.৩৩%) এবং ছাত্র (৪০%) ছাড়া অন্যান্য উত্তরদাতার নিকট এ বিষয়টি তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। পক্ষান্তরে, সন্ত্রাস দমনের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষাঙ্গণে আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সকল শ্রেণীর উত্তরদাতার নিকটই কোন গুরুত্ব বহন করেনি (সারণীঃ ৭)।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামতের একটি তুলনামূলক বিন্যাস সারণী ৬ ও ৭-এ উপস্থাপিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা না করে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনে সার্বিকভাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক মতামত সারণীঃ ৮-এ দেখানো হয়েছে।

সারণীঃ ৮- শিক্ষাঙ্গণ থেকে সন্ত্রাস দূরীকরণে সার্বিকভাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের তুলনামূলক মতামত

মতামত	উত্তরদাতা				
	ছাত্র ৬০ জন	শিক্ষক ৩০ জন	অভিভাবক ৩০ জন	রাজনীতিবিদ ৩০ জন	সর্বমোট ১৫০ জন
সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলির কঠোর মনোভাব গ্রহণ	৩৪ (৫৬.৬৭)	১৬ (৫৩.৩৩)	১৬ (৫৩.৩৩)	১৮ (৬০.০০)	৮৪ (৫৬.০০)
রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ভিত্তিক ছাত্র-রাজনীতি বন্ধকরণ অথবা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছাত্র সংগঠন	৮ (১৩.৩৩)	৫ (১৬.৬৭)	৬ (২০.০০)	৪ (১৩.৩৩)	২৩ (১৫.৩৩)
ছাত্রদেরকে শিক্ষাশেষে চাকরি এবং অর্থোপার্জনের নিশ্চয়তা প্রদান	৭ (১১.৬৭)	৫ (১৬.৬৭)	৩ (১০.০০)	৩ (১০.০০)	১৮ (১২.০০)
সন্ত্রাস দমনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের আন্তরিক হওয়া, শিক্ষকগণ কর্তৃক ছাত্রদের ব্যবহার না করা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ছাত্র ও শিক্ষকগণের আপোষহীন হওয়া	৫ (৮.৩৩)	-	৩ (১০.০০)	২ (৬.৬৭)	১০ (৬.৬৭)
পারিবারিকভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা	-	১ (৩.৩৩)	-	-	১ (০.৬৭)
শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা	৩ (৫.০০)	১ (৩.৩৩)	২ (৬.৬৭)	২ (৬.৬৭)	৮ (৫.৩৩)
আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া	৩ (৫.০০)	২ (৬.৬৭)	-	১ (৩.৩৩)	৬ (৪.০০)
মোট	৬০ (১০০.০০)	৩০ (১০০.০০)	৩০ (১০০.০০)	৩০ (১০০.০০)	১৫০ (১০০.০০)

(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে উত্তরদাতাদের মতামত যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সমষ্টিগতভাবে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৫৬.০০%) শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনের জন্য সন্ত্রাসীদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর কঠোর মনোভাব গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। উত্তরদাতাদের সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করলেও অনুরূপ মতামতেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সকল স্তরের উত্তরদাতারাই অধিকহারে মত ব্যক্ত করেছেন, তরুণ ছাত্র-সমাজকে রাজনৈতিকভাবে নিরুৎসাহিত করা হলে কিংবা তাদের দ্বারা বাধা গ্রস্থ হলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত মতামতের হার হচ্ছে ছাত্র ৫৬.৬৭%, শিক্ষক ৫৩.৩৩%, অভিভাবক ৫৩.৩৩%, রাজনীতিবিদ ৬০.০০%। উত্তরদাতাদের ১৫.৩৩% মতামত দিয়েছেন যে, ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ভিত্তিক ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করলে কিংবা রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত ছাত্র-সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা করলে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমন করা সহজতর হবে। অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় তিন চুতুর্থাংশ (৭১.৩৩) উত্তরদাতা সন্ত্রাসকে কোন-না-কোনভাবে রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গেই জড়িত করেছেন (সারণীঃ ৮)।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনের জন্য উপর্যুক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত অন্যান্য পদক্ষেপের কথা উল্লিখিত হলেও সেগুলি উত্তরদাতাদের নিকট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। বিস্ময়কর হলেও উল্লেখ্য, সাধারণভাবে পারিবারিক প্রভাব সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে একটি কার্যকর পদক্ষেপ বিবেচিত হলেও সংশ্লিষ্ট গবেষণায় শুধুমাত্র একজন শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য উত্তরদাতা এটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তবে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও রাজনীতিবিদগণ অর্থাৎ সকল উত্তরদাতাই শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাবকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন (সারণীঃ ৮)।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ২৮-৩০ জুন, ১৯৯৭ তারিখে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক এ.কে. আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুচ্ছ। উক্ত অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করে বিদ্যার্জন ও জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মানিত সিনেটরবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন।

১. কোনো অছাত্র ছাত্র-সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না এবং ছাত্র-রাজনীতিতে তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

২. অধ্যয়নরত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সর্বশেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর কাউকে আর উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে গণ্য করা চলবে না।

৩. ছাত্রত্ব না থাকলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, হল কিংবা কলেজের ছাত্র-সংসদের কর্মকর্তা হিসেবে কেউ অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

৪. নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে পরবর্তী নির্বাচন হোক বা না হোক বিশ্ববিদ্যালয়, হল কিংবা কলেজের ছাত্র-সংসদ বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

৫. দলীয় আনুগত্য বিবেচনায় না এনে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবেই চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীন যে-কোন নির্মাণকার্য, পরিবহণ, দ্রব্যাদি সরবরাহ কিংবা অন্য কোনো অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ছাত্র সম্পর্কিত থাকতে পারবে না।

৭. সকল ছাত্রনেতার অর্জিত সম্পত্তি ও অর্থের পরিমাণ এবং উপার্জনের উৎস প্রকাশ করতে হবে।

৮. পুলিশ-বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার সম্পূর্ণ রহিত এবং পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৯. পেশাগত সততা এবং নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য পুলিশ-কর্মকর্তাদের যেন কারো রোষানলে পড়তে এবং কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার না হতে হয়-------তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১০. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কিংবা ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত কোনো দলীয় সভা-সমাবেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে হবে।

১১. সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে বহিষ্কৃতদের কোনো ছাত্র-সংগঠনে রাখা কিংবা দলীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।

ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ নয়, বরঞ্চ প্রকৃত শিক্ষার্থীদের রাজনীতি সচেতন করে তাদের মধ্যে রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্যে তাদের প্রস্তুত করে তোলাই উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহের মূল লক্ষ্য। আমাদেরও প্রত্যাশা, বর্তমানে জাতীয় স্বার্থে এ প্রস্তাবগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যথাবিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের ব্যাপক ভয়াবহতা একথাই প্রমাণ করে যে, সন্ত্রাস আজ আর কোন নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা গোটা সমাজদেহে ক্যান্সারের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে জাতীয় মেধার বিরাট অপচয় হচ্ছে এবং এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে 'সিস্টেম লস'-এর ন্যায় যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে অচিরেই জাতীয় জীবনে অপূরণীয় মেধার শূন্যতা দেখা দেবে। এমতাবস্থায় সন্ত্রাস ও তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে শিক্ষাঙ্গণ ও শিক্ষার্থীদের জীবন রক্ষা করে দেশ ও জাতীর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গণগুলিকে মেধা লালনের ক্ষেত্রে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস দমনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর ব্যবস্থা আজ জাতির সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, আমরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দেবে।

তথ্যপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা

১. সাকিল খান, "সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচার" প্রকাশকাল, আগষ্ট ২০০৫। পৃষ্ঠা-৩০

২. ডঃ আলী নবী, উদৃত্ত, সাকিল খান,"সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচার", প্রকাশকাল, আগষ্ট ২০০৫। পৃষ্ঠা-৩০

৩. ডঃ আলী আশরাফ, উদৃত্ত, সাকিল খান,"সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচার", প্রকাশকাল, আগষ্ট ২০০৫। পৃষ্ঠা-৩০-৩১

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উদৃত্ত, সাকিল খান,"সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচার", প্রকাশকাল, আগষ্ট ২০০৫। পৃষ্ঠা-৩০

৫. বেগম সুফিয়া কামাল, উদৃত্ত, সাকিল খান,"সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচার", প্রকাশকাল, আগষ্ট ২০০৫। পৃষ্ঠা-৩০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৭

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ঃ একটি বিশ্লেষণ

দুই বা ততোধিক দেশ নিজস্ব হীনস্বার্থের জন্য যখন নীতিবর্হিভূতভাবে পরস্পরের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও জুলুমের মাধ্যমে ব্যাপক জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হয় তাকে এক কথায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বলে। জাতি সংঘের মাধ্যমে কোন দেশের সমস্যার সমাধান না করে অপর কোন দেশ যদি নিজের হীন স্বার্থ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় তবে তাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বলে অভিহিত করা যায়। এ আলোকে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে সন্ত্রাসের মূল নায়ক হিসেবে আখ্যাহিত করা যায়।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের প্রেক্ষাপটঃ দীর্ঘ দিন ধরে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসকে তেমন গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়নি। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখের ঘটনায় বিশ্ব প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পর এমন ভয়াবহ বিপর্যয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। বিশ্ব বিবেক তখন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী। কোন কিছু অর্জন করার জন্য সন্ত্রাসবাদকে বেছে নেয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা যায় না। ইতিহাসে এ ধরণের সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডের ঘটনা এই প্রথম নয়। রাশিয়ার ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব সেখানে সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড একটি বড় ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৮০ সালে নিহিলিষ্ট মতবাদ ও নিহিলিস্টদের কার্যকলাপের ফলে রুশ সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল ও নিহিলিষ্ট বিপ্লবীদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল (১৮৮১)। নিহিলিষ্টরা ছিলেন উগ্র। তবে এরা শিক্ষিত ছিলেন। একটি আদর্শকে সামনে রেখে এরা বিশ্বব্যাপী তৎপরতা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এ আন্দোলন সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

সত্তর দশকে 'আল ফাতাহ্' গেরিলা গ্রুপের কথা অনেকেরই মনে আছে। ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এরা বিমান ছিনতাই করে বিমানগুলো ধ্বংস করে দিত। ফিলিস্তিনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ছিলেন আল ফাতাহ্ গ্রুপের প্রধান। কালের পরিক্রমায় আল ফাতাহ্ গ্রুপ তাদের সেই সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড পরিত্যাগ করেছেন। একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আল ফাতহ্ তাদের গেরিলা তৎপরতা শুরু করেছিল, তাদের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সৎ ছিল। কিন্তু প্রয়োগটা সঠিক ছিলনা। আরাফাত এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বিশ্বে অন্যতম একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ১৯৯৪ সালে নোবেল শান্তি পুরুস্কারেও ভূষিত হয়েছেন তিনি। তাঁর এই উপলব্ধি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

শ্রীলংকার তামিল টাইগার একটি তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চাচ্ছে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা থাকলেও, তাদের আন্দোলন বাহ্যত একটি সন্ত্রাসবাদী 'তামিল ইলম' বা স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, সন্দেহ।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ধ্বংস এবং ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাতকে সামনে রেখে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল হয়েছে। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাত ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে ইরাক দখলের মতো একই অভিযোগ তোলা হচ্ছে ইরান, সিরিয়ার বিরুদ্ধে।

Dhaka University Institutional Repository

যাতে করে সমগ্র বিশ্ববাসী আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে ইরান সিরিয়া ইস্যু নিয়ে। বিশ্বের দৃষ্টি ও মনোযোগ ইরানের উপর নিবদ্ধ রাখতে পারলে মানুষ ইরাকের অস্ত্র সম্পর্কে চিন্তা ও বিতর্ক করার সময় ও সুযোগ পাবে না। ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুও চাপা পড়ে থাকবে। সোজা কথা পানি যত ঘোলা হবে, মৎস্য শিকার হবে তত নির্বিঘ্ন। ইরানের প্রতি বুশের সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান হুংকার তারই ইংগিতবহ।

সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতায় আরোহণ ছিল আমেরিকার আশীর্বাদে। সৌদিসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের রাজতন্ত্রের বিরোধিতাকারী এই উগ্রপন্থী রাষ্ট্রনায়ককে আমেরিকা লেলিয়ে দিয়েছে ইরানকে ধ্বংস করতে। তার হাতে তুলে দিয়েছে রাসায়নিক ও জীবাণূ অস্ত্র। সেগুলো সাদ্দাম ব্যবহার করেছেন ইরান ও নিজ দেশের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। ১৯৯১ সালে সাদ্দাম কুয়েত দখল করে নিলে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে সারাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ পায় এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাককে বাধ্য করে কুয়েত ত্যাগ করতে। ইসরাইল বিরোধিতা ও ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করায় সাদ্দাম আমেরিকার সমর্থন হারায়। কুয়েত দখলের ঘটনায় তাদের মধ্যকার সম্পর্কের চরম অবনতি হয়।

কুর্দিদের রক্ষার নামে আমেরিকা-বৃটেন ইরাকের বড় একটা অংশে সাদ্দামের কর্তৃত্ব খর্ব করে। ইসরাইলের নিরাপত্তা ও ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভান্ডারের হাতছানিতে আমেরিকা অজুহাত খুঁজতে থাকে ইরাক আক্রমণের । শেষ পর্যন্ত ভুয়া অজুহাতে ইরাক দখল সম্পন্ন হয়। কাজেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস আমেরিকা-বৃটেন চক্রেরই সৃষ্টি। সুদূর প্রসারী আগ্রাসনের নীল নকশার অংশ হিসাবেই বিশ্বে পরিকল্পিত সন্ত্রাস সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ট্রাজেডিঃ সর্বকালের সেরা লোমহর্ষক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণচঞ্চল এলাকা হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্কের ডাউন টাউন ম্যানহাটন । ইতিহাসের এক শোচনীয় বিপর্যয় নেমে এসেছে নিউইয়র্কে এবং ওয়াশিংটনে। এখানে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সকালে যা ঘটে গেছে তার তুলনা হতে পারে কেবল মহাপ্রলয়ের সাথে। এদিনের আত্মঘাতী বিমান হামলায় নিউইয়ার্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ১১০ তলা টুইন টাওয়ার গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। একইদিন অন্য এক আত্মঘাতী বিমান হামলায় পেন্টাগন ভবনেরও একাংশ ধ্বংস হয়েছে। এ এক অবিশ্বাস্য সত্য ঘটনা যা কল্পকাহিনীর চেয়েও লোমহর্ষক। এ ঘটনায় নিহত হয়েছে ত্রিশ হাজার মানুষ। আহত হয়েছে আরো অসংখ্য লোক। হাজার হাজার কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের মূল অর্থনৈতিক ও সামরিক স্থাপনায় এ ধ্বংসাত্মক ঘটনায় দেশটির আত্মবিশ্বাসে বড় ধরনের চিড় ধরেছে। বহির্বিশ্বেও দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এখন ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, স্মরণকালের এ ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আমেরিকার শিক্ষা নেয়া উচিত।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সকালের শুরুটা ছিল অন্যান্য দিনের মতোই। নিউইয়র্ক সিটি, ওয়াশিংটন ডিসি সহ আমেরিকার ব্যস্ত লোকজন তাদের অফিসের কাজ কেবল শুরু করতে যাচ্ছে। নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ৫০ হাজার লোক কাজ করে। মঙ্গলবার সকাল ৯ টার সামান্য আগ পর্যন্ত সেখানে আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ হাজার লোক কাজ শুরু করেছিল। আর ঠিক এ সময়টাতে একটি বিমান এসে ভবনটিতে আঘাত হানে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আগুন ধরে যায়। ১১০ তলা ভবনের বেশ উপরের দিকে বিমানটি উপর থেকে নিচের দিকে কৌণিকভাবে আঘাত হানে। ভবনটির উপরের দিকটা তখন এক ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডের রূপ নেয়। চারদিকে ঘন মেঘের আকারে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। আর খড়কুটোর মতো নির্মাণ সামগ্রী চারদিকে ছিটকে পড়তে থাকে। কয়েক মাইল দূরে পর্যন্ত ছিটকে পড়ে ধ্বংসাবশেষ। ভবনের বিভিন্ন তলায় কর্মরত হাজার হাজার মানুষ যারা সরাসরি ধ্বংসের মুখে পড়েছে, তাদের শরীরতো বটেই; কংকাল পর্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় বিমান এসে টুইন টাওয়ারের দক্ষিণ দিকের অন্য টাওয়ারটিতে আঘাত হানে। দ্বিতীয় ভবন থেকেও একইভাবে ধোয়া ও ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ সময় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর লোকসহ কয়েকশ ত্রাণকর্মীও ভবনের নিচে চাপা পড়ে। এরই মধ্যে তৃতীয় একটি বিমান ছুটে যায় ওয়াশিংটন শহরের দিকে। সেখানকার পেন্টাগন ভবনটি যুক্তরাষ্ট্রের মূল সামরিক স্থাপনা। তৃতীয় বিমানটি সে স্থাপনায় আঘাত হানে এবং সে ভবনের একাংশ ধ্বংস হয়। হামলায় অংশ গ্রহণকারী চতুর্থ বিমানটি সম্ভবত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পেনসেলভেনিয়ার দিকে ছুটে যায়। এবং বিমানটি সেখানেই বিধ্বস্ত হয়। এটি আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী বাণিজ্যিক বিমান। বিভিন্ন সূত্র থেকে পরে জানা গেছে আত্মঘাতী হামলাকারীরাই বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় এবং সরাসরি লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানে। বিমানে মোট ২৬৬ জন যাত্রী ছিল। এই যাত্রীদের কেউ কেউ ছিনতাইকারীদের হাতে বিমান চলে যাবার পর মোবাইল ফোনে তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা বলেছিল।

বিভিন্ন বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়, টুইন টাওয়ারের একটিতে আঘাত হানার মাধ্যমে ধারাবাহিক আক্রমণের সূচনা হয়। এবং একে একে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমেরিকা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট বুশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনীকে প্রায় এক ঘন্টাকাল সময় খুঁজে পাওয়া যায়নি। কি হচ্ছিল বা কি ঘটছিল এটি কেউ বুঝে উঠতে পারেনি দীর্ঘ সময়। নিউইয়র্কের মেয়র রুডলক জুলিয়ানী বলেন, বহু সংখ্যক লোক ভয়ংকর হামলায় নিহত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে কর্মরত ৩০ হাজার মানুষের প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন।

কে ঘটিয়েছে এ লংকা কান্ড?

পেন্টাগন ভবন ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বিমান হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও পুরো ইউরোপ, ব্রিটেন, রাশিয়া অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বে ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কে বা কারা এ দুঃসাহসী কাজের সাথে জড়িত? এতে তাদের স্বার্থই বা কী? কিন্তু বিশ্ব বিবেককে বোকা বানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের সব সংবাদ মাধ্যমে কোন তথ্য প্রমান বা তদন্ত ছাড়াই এক যোগে সৌদী ভিন্ন মতাবলম্বী ইসলামী চিন্তাবিদ ও কোটিপতি ওসামা বিন লাদেন এবং তার অনুসারীদের এ ঘটনার জন্য দায়ী বলে দোষারোপ করা হচ্ছে। লাদেন এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। লাদেনের আশ্রয়দাতা আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয় যে, এ ধরনের হামলা চালানোর সামর্থ্য লাদেনের নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষনিক আফগানিস্তানের প্রতি লাদেনকে জীবিত বা মৃত তাদের হাতে হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়। না হয় আফগানদের ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি হবার হুশিয়ারী উচ্চারণ করে। তালেবান প্রধান সরাসরি জবাব দিয়ে বলেছেন, এ ঘটনার সাথে লাদেনের সংযুক্তি প্রমাণ করতে না পারলে তাকে আমেরিকার হাতে হস্তান্তর করা যায় না। কিন্তু প্রমান ছাড়াই আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে; এবং দখল করে নেয়। মূলত, মিথ্যা অজুহাতে বিভিন্ন দেশ দখল এবং লুটপাট করাই আমেরিকার উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলছেন ইহুদী চক্রের নীল নকসা অনুযায়ী এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। যাতে এ অজুহাতে বিশ্বজুড়ে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহের উপর হামলা চালানো যায়। ইহুদী ষড়যন্ত্রের একটি বড় ধরনের প্রমাণ ইতোমধ্যে বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশিত হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর যেদিন টুইন টাওয়ারে হামলা হয় সেদিন ওখানে কর্মরত সাড়ে ৪ হাজার ইহুদী নাগরিকের কেউ ডিউটিতে যায়নি। তাহলে কি একথা বুঝা যায় না সে এরা আগে থেকেই এই হামলার কথা জানতে পেরেছিল। এখন প্রশ্ন, কেন ঐ সকল ইহুদীকে কাজে যোগ না দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ইরানের একটি পত্রিকায় এই বিষয়টিকে উল্লেখ করে বলেছে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কেন ধসে পড়লো টুইন টাওয়ার?

হামলাকারী বিমানগুলোর ধাক্কায় গোটা টুইন টাওয়ারের তাৎক্ষণিক পতন ঘটে। সংশ্লিষ্ট হামলার জায়গা থেকে ধাপে ধাপে কয়েক তলা বিধ্বস্ত হয়েছিল । বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী দু'টি টাওয়ার নির্মাণ করতে প্রায় ৮০ হাজার টন ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রায় ২০০ ফিট চওড়া প্রতিটি টাওয়ারের প্রত্যেক ফ্লোর কেন্দ্রীয় ভাবে ইস্পাত দিয়ে মোড়া। ১৮ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের টিউবগুলো বাহ্যিক দিকে উল্লম্বভাবে অবস্থিত। এই পুরো ইস্পাতের টিউবগুলোই টাওয়ার দুটোর ভারসাম্য রক্ষা করতো। প্লেনের আঘাতগুলো কেন্দ্রের ইস্পাতে আঘাত হানে, ফলে চাপ পড়ে বাহিরের ইস্পাতের টিউবগুলোতে। এতে টিউবগুলো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

তাছাড়া হামলাকারী বিমানগুলোর জ্বালানি তেল পোড়ার কারণে টাওয়ার দু'টির ইস্পাত নির্মিত আভ্যন্তরীণ কাঠামো গলে রাবারের মতো নরম হয়ে গিয়েছিল। এখানে সৃষ্ট অগ্নিকান্ডে প্রায় ১০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট তাপ উৎপন্ন হওয়ার কারণে ইস্পাত নির্মিত কাঠামো মোমের মত গলে যায়। ফলে টুইন টাওয়ার ধসে পড়েছিল।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারঃ সংক্ষিপ্ত তথ্য

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতীক। রাষ্ট্রীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের একটি। এ ভবনে দৈনিক হাজার হাজার কোটি ডলারের বাণিজ্য চলতো। একে বলা হতো বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

- একই রকম দেখতে ১১০ তলা দু'টি ভবন নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র গঠিত ছিল। নিউইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র ম্যানহাটন এলাকার অবস্থিত ভবন দুটিকে বলা হতো 'টুইন টাওয়ার'।
- প্রথম টাওয়ারটির উচ্চতা ছিল ১,৩৬৮ ফুট (৪১৪ মিটার)। ১৯৭০ সালে তৈরি এই টাওয়ারের ফ্লোর সংখ্যা ছিল ১১০টি। এখানে যাত্রীবাহী ৯৭টি এবং পণ্যবাহী ৬টি লিফট ছিল। এটি আক্রান্ত হয় প্রথম। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে ধসে পড়ে।
- দ্বিতীয় টাওয়ারটির উচ্চতা ১,৩৬২ ফুট (৪১২ মিটার)। ১৯৭২ সালে তৈরি এই টাওয়ারে ফ্লোর ছিল ১১০টি। এখানে ৯৭টি যাত্রীবাহী এবং ৬টি পণ্যবাহী লিফট ছিল। এটি আক্রান্ত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। কিন্তু ধসে পড়ে প্রথম।
- শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত টুইন টাওয়ারই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উচু ভবন।
- ভবন দুটি অ্যালুমিনিয়াম ও ইস্পাত দিয়ে তৈরি ছিল।
- দু'টি ভবনেরই ফাউন্ডেশন মাটির নিচে ৭০ ফুট পর্যন্ত গভীর।
- ভবন দুটি ৬ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত।
- টাওয়ার দু'টি 'টিউব বিল্ডিং' মডেলের উৎকৃষ্ট নমুনা ছিল।
- প্রতি টাওয়ারেই ১০৪টি করে প্যাসেঞ্জার এলিভেটর এবং ২১,৮০০ টি জানালা ছিল।
- টুইন টাওয়ারে প্রতিদিন ৫০ হাজার লোক কাজ করতো। ২৬টি দেশের ৪৩০ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দফতর এখানে ছিল।
- ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে ২টি আত্মঘাতী বিমান হামলায় ভবন দু'টি বিধ্বস্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

তাৎক্ষণিক পর্যায়ে ঐ সময়ে-

- ✯ পর্যটন শিল্পে ব্যাপক ধস নেমেছে। বিমানের বুকিং ৭৫ শতাংশ কমে গেছে।
- ✯ বিমান কোম্পানীগুলো তাদের যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা ২৫ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে।
- ✯ ২ বছর পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সাড়ে তিন হাজার বিমান খালি পড়ে ছিল। অনেক এয়ার লাইন্স দেউলিয়া হয়ে পড়েছে।
- ✯ শীর্ষ মার্কিন কোম্পানী আমেরিকা এয়ার লাইন্স এবং ইউনাইটেড এয়ার লাইন্স ঐ সময় তাৎক্ষণিক ভাবে ৪০হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছে।
- ✯ ব্রিটিশ এয়ার লাইন্স তাদের ৭ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে।
- ✯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম বৃহৎ যাত্রীবাহী বিমান সংস্থা কন্টিনেন্টাল ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে।
- ✯ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রায় ১৪ হাজার আইনজীবীর অফিস ও তাদের দলিল পত্র বিনষ্ট হয়।
- ✯ টুইন টাওয়ারে বিশ্বের ২৬টি দেশের ৪৩০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দফতর ছিল। যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
- ✯ পুনরায় এ ভবনদ্বয় তৈরী করতে ব্যয় হবে প্রায় ৩০০০ কোটি ডলার।
- ✯ ৩০ হাজার মানুষ নিহত।

বিশ্বে গত অর্ধ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ন সন্ত্রাসী ঘটনা (১৯৪৫-২০০৫)

দেশে দেশে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা নতুন নয়। বিমান, ট্রেন, সামরিক স্থাপনা কিংবা সুউচ্চ ভবন সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছে। সামরিক সদস্যরা ছাড়াও নিহত হয়েছে বিপুল সংখ্যক নিরীহ বেসামরিক নাগরিক। গত অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে পরিচালিত তেমনি কয়েকটি ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

১৯৪৫ঃ ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধশেষে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইরাগান, হাগানা ও স্টার্ন গ্যাং নামে তিনটি ইহুদি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।

১৯৪৬ঃ ২২ জুলাই কিং ডেভিড হোটেলে ইহুদি ইরাগান সংগঠনের নেতৃত্বে বোমা বিস্ফোরণে ১৯ জনের মৃত্যু।

১৯৪৮ঃ ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী হিন্দু মৌলবাদী নাথুরাম গডসের হাতে নিহত। ৯ এপ্রিল ইহুদি সংগঠন ইরাগান ডেইর ইয়াসিন গ্রাম আক্রমন করে, ২৫৪ জন আরব নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়। প্রসঙ্গত এর পর আরবেরা ইসরাইল ছাড়তে শুরু করে এবং ১৪ মে সরকারিভাবে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠিত হয়।

১৯৫১ঃ ২০ জুলাই জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ জেরুজালেমে আরব সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত।

১৯৫৩ঃ ১৪ অক্টোবর জর্ডানের কিবিয়া গ্রামে ইসরাইলি সেনার হাতে ৬৬ জন আরব মহিলা, পুরুষ ও শিশুর মৃত্যু।

১৯৬০ঃ ২০ মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকার শার্পভিলে পুলিশ ৬৯ জন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস অহিংসার নীতি পরিত্যাগ করে।

১৯৬১ঃ ১মে প্রথম মার্কিন বিমান অপহরণ, পুয়ের্তোরিকোর আন্তলিও রামিরেজ ওর্তিজ মার্কিন ন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বিমান অপহরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৮ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম মার্কিন বাণিজ্যিক বিমানের সফল অপহরণ। ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ডিসি-৮ বিমান অপহরণ করে কিউবায় নিয়ে যাওয়া হয়। ৫ জুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী রবার্ট কেনেডি জর্ডানের সন্ত্রাসবাদী বিশারা সিরহানের হাতে লস এঞ্জেলসে নিহত।

১৯৭১ঃ ২৮ নভেম্বর কায়রোয় ফিলিস্তিনী ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সংগঠনের সদস্যদের হাতে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফিতাল নিহত। ৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিম জার্মানির মিউনিখে অলিম্পিক ভিলেজে আট জন ফিলিস্তিনী ব্লাক সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলের অ্যাথলেটদের মধ্যে দুজন হত্যা ও ৯ জনকে অপহরণ করে। পরে অপহৃতদের উদ্ধারের প্রয়াস নিলে নয়জন অ্যাথলেট, এক পুলিশ অফিসার ও পাঁচ সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়।

১৯৭৫ঃ ২১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী 'কার্লোস দ্য জ্যাকেল' অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ওপেক-এর বৈঠক চলাকালীন ১১ জন তেলমন্ত্রী ও আরো ৫৯ জনকে অপহরণ করে।

১৯৭৯ঃ ৪ নভেম্বর ইরানের তেহরানে মার্কিন দূতাবাস দখল করে ইরানের সন্ত্রাসবাদীরা ৬৬ জন মার্কিন কূটনীতিকে বন্দী করে। এই ঘটনার জের চলে ১৯৮১ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২০ নভেম্বর সৌদি আরবে মক্কার বিখ্যাত মসজিদ অধিকার করে ২০ ইসলামী সন্ত্রাসবাদী। কয়েকশ পুণ্যার্থী বন্দী হন। ফরাসি ও সৌদি নিরাপত্তা রক্ষীরা মসজিদ দখলমুক্ত করে। এতে প্রায় ২৫০ জন নিহত হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর বৈরুতে নিজের রাজনৈতিক দল ফ্যালাঞ্জ-এর সদর দপ্তরের সামনে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে নিহত লেবাননের রাষ্ট্রপতি বশির গেনায়েল। দু'দিন পরে ফ্যালাঞ্জ খ্রিষ্টানদের সশস্ত্র বাহিনী সার্বরা/চাটিলার ফিলিস্তিন উদ্বাস্তু শিবিরে নির্বিচার গণহত্যা চালায়, ৪৬০ জন নিহত হয়। ইসরাইলি সৈন্যরা নীরবে ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে।

১৯৮৩ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী বিমান বন্দরের ৩০ মাইল উত্তর পূর্বে পারস্য উপসাগরে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে বিধ্বস্ত হয় গালফ এয়ার-৭৩৭ বিমান। যাত্রীদের মালপত্র রাখার কম্পার্টমেন্টেই সন্ত্রাসীরা বোমাটি পেতে রেখেছিল। এ ঘটনায় নিহত হন ১১২ জন।

১৯৮৩ঃ ২৩ অক্টোবর বৈরুত বিমানবন্দরে মার্কিন সৈন্যদের ব্যারাকে ট্রাক বোমা হামলা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত হয় ২৪১ জন মার্কিন নৌ-সেনা। এর কয়েক মিনিট পরই পশ্চিম বৈরুতে ফরাসি সৈন্যদের ব্যারাকে আরেকটি ট্রাক বোমা বিস্ফোরিত হয়। নিহত হয় ৫৮ জন ফরাসি সৈন্য।

১৯৮৪ঃ ৮ মার্চ বৈরুতে সিআইএর চক্রান্তে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ, ৮০ জনের মৃত্যু। ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজেরই শিখ নিরাপত্তাকর্মীদের ছোঁড়া গুলিতে নিহত।

১৯৮৫ঃ ২৩ জানুয়ারি এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বোয়িং-৭৪৭ বিমান কানাডার ভ্যাংকুবার থেকে উড়ার পর আটলান্টিকের বুকে বিধ্বস্ত হয়। নিহত হন বিমানের ৩২৯ জন আরোহী। শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি গোষ্ঠী বিমানটিতে বোমা পেতে রেখেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

১৯৮৭ঃ ২৯ নভেম্বর কোরিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং-৭০৭ বিমান বার্মা উপকূলের অদূরে বিস্ফোরিত হয়ে সাগরে বিধ্বস্ত হয়। প্রান হারায় ১১৫ জন। দক্ষিণ কোরিয়া এই সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনে উত্তর কোরিয়া জড়িত বলে সন্দেহ করেছিল।

১৯৮৮ঃ ১৬ মার্চ উত্তর ইরাকে হালাবজার বিরুদ্ধে ইরাকের নার্ভ গ্যাস আক্রমণে ৪,০০০ কুর্দিদের মৃত্যু।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ঃ ২১ ডিসেম্বর প্যান অ্যাম ফ্লাইট-১০৩ স্কটল্যান্ডের লকারবির আকাশে বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনায় মারা যান ২৭০ জন। দুই লিবীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা স্যুটকেসে করে বিমানটিতে বোমা পেতে রেখেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে একজন লিবীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে হেগ শহরে বিচারের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হন।

১৯৮৯ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ইউটিএ ডিসি-১০ বিমান কঙ্গোর রাজধানী ব্রাজাভিল থেকে যাচ্ছিল প্যারিসে। বোমা বিস্ফোরণের নাইজারের ওপরেই নিহত হন ১৭১ জন। লেবাননের ইসলামি হলি এয়ার সংগঠন এই হামলা পরিচালনা করেছে বলে দাবি করে। ফ্রান্স বলেছে, লিবিয়া ঘটনার জন্য দায়ী।

১৯৯১ঃ ২১ মে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এলটিটিইর আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে নিহত।

১৯৯৩ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ব্যাপক ক্ষতি, ছয় জনের মৃত্যু। ১মে শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি রাণাসিংঘে প্রেমাদাসা এলটিটিইর আত্মঘাতী বোমায় নিহত।

১৯৯৪ঃ ৬ এপ্রিল ভূমি থেকে আকাশে মিসাইল নিক্ষেপে বিমান বিস্ফোরণে রুয়ান্ডার রাষ্ট্রপতি জুভেনেল হাবারিমানা নিহত। এই ঘটনার পর উপজাতি সংঘর্ষে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।

১৯৯৫ঃ ১৯ এপ্রিল ট্রাক বোমা হামলায় ওকলাহোমা শহরের আলফ্রেড পি মুরাহ ফেডারেল ভবন ধ্বংস হয়। এতে নিহত হন ১৬৮ জন। হামলার অভিযোগে টিমোটি ম্যাকভেইকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। অপর অভিযুক্ত টেরি এল নিকোলসকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

১৯৯৫ঃ ৭ জুলাই পাঁচ মার্কিন, ব্রিটিশ ও জার্মান পর্যটক কাশ্মীরে অপহৃত। এদের সবাইকে হত্যা করা হয়।

১৯৯৬ঃ ৭ আগষ্ট কেনিয়ার নাইরোবি ও তাঞ্জানিয়ার দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসের সামনে একই সময়ে বোমা বিস্ফোরণ, ১২ জন মার্কিন সহ ২৯১ জনের মৃত্যু। নাইরোবির দারুস সালামে একজন মার্কিন সহ ৮০ জন নিহত। এর পেছনে ওসামা বিন লাদেনের হাত আছে বলে সন্দেহ।

১৯৯৮ঃ ৭ আগস্ট কেনিয়ার নাইরোবি এবং তাঞ্জানিয়ার দারুস সালামের মার্কিন দূতাবাসে শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে আহত হয় সাড়ে ৫ হাজারেরও বেশি লোক। এ ঘটনায় কেনিয়ায় ২১৩ এবং তাঞ্জনিয়ায় ১১ জন নিহত হয়। ওসামা বিন লাদেন ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন।

১৯৯৯ঃ ২৪ ডিসেম্বর কাঠমন্ডু থেকে নয়া দিল্লীগামী বিমান ছিনতাই করে কাশ্মীরী জঙ্গিরা কান্দাহারে নিয়ে যায়। পরে বন্দীমুক্তির বিনিময়ে বিমানের ১৮৯ জন যাত্রী মুক্তি পান।

২০০০ঃ ১মে সিয়েরা লিওনে রেভ্যুলুশনারি ইউনাইটেড মিশনের সন্ত্রাসবাদীরা জাতিসংঘের ২০ জন প্রতিনিধিকে অপহরণ করে।

২০০১ঃ ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে নজিরবিহীন ও ভয়াবহ সন্ত্রাসী বিমান হামলায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন বিধ্বস্ত হয় এবং আমেরিকার গর্ব ধুঁলোয় মিশে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২০০২ঃ কলকাতার আমেরিকান ট্রেড সেন্টারে হামলা। করাচীতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সমনে বোমা বিস্ফোরণ। আফগানিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্টকে হত্যা।

২০০৩ঃ ইরাকের নাজাফ-এ বোমা বিস্ফোরণে ইরাকে শীর্ষ শিয়া ইসলামী নেতা আয়াতুল্লাহ আঃ হাকিম সহ শতাধিক মানুষের মৃত্যু। বাগদাদে জাতিসংঘ ভবনে বোমা বিস্ফোরণে ইরাকস্থ জাতিসংঘের প্রধান প্রতিনিধি সার্গিও ভিয়েরা দ্য মিলো সহ বহু মানুষের মৃত্যু। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে শতাধিক মানুষ নিহত। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ২ বার আল কায়দার হামলা থেকে বেঁচে যান।

২০০৪ঃ স্পেনে রিয়েল মাদ্রিদের চারটি রেল স্টেশনে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে ২ শতাধিক লোক নিহত ও পনের শতাধিক আহত। ইসরাইলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের অংশ হিসেবে দেশটির সেনাবাহিনী ২২ মার্চ ২০০৪-এ স্বাধীন ইসলামী ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিনকে হত্যা করে। ২১ আগস্ট ঢাকায় বাংলাদেশের বিরোধীদল আওয়ামীলীগের সমাবেশে ঘৃণ্য গ্রেনেড হামলায় ২২ জন লোক নিহত হন এবং বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনাসহ দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা অল্পের জন্য হামলা থেকে বেঁচে যান।

২০০৫ঃ ফেব্রুয়ারি মাসে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে সংঘটিত এক গাড়ী বোমা হামলায় দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরিসহ ৯ জন নিহত। ৭ জুলাই লন্ডনের পাতাল রেলসহ চারটি স্টেশনে বোমা হামলা। নিহত ৫৬ এবং আহত ২ শতাধিক। এবং ২১ জুলাই লন্ডনে পুনরায় বোমা হামলা। ১৭ আগষ্ট বাংলাদেশের ৬৩ টি জেলার অফিস এবং আদালতে সন্ত্রাসী জে এম ভি কর্তৃক একযোগে বোমা হামলা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় গেরিলা ও সন্ত্রাসী গ্রুপ

বিশ্বব্যাপী গেরিলা ও সন্ত্রাসী দলগুলো এখন সবচেয়ে আলোচিত। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কিছু গেরিলা ও সন্ত্রাসী দলের নাম এবং দেশের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং	*দলের নাম*	*দেশ*
১.	লর্ডস র‍্যাজিস্ট্যান্স আর্মি	উগান্ডা
২.	গর্ডস আর্মি	মায়ানমার
৩.	এন এল এফটি	ভারত
৪.	মুজাহিদিন খালক	ইরান
৫.	সুদান পিপলস লিবারেশন অগ্রানাইজেশন্স	সুদান
৬.	অমশিং রিও	জাপান
৭.	মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট/ইরাগান, হাগানা	ফিলিপাইন/ইসরাঈল
৮.	নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদ)	নেপাল
৯.	লেবানিজ আমর্ড রেভ্যুলিউশনারিফ্যাকশন	ফিলিস্তিন
১০.	আল-আকসা মার্স্টার্স ব্রিগেড	ফিলিস্তিন
১১.	ইসলামী জিহাদ	ফিলিস্তিন
১২.	হিজবুল মুজাহেদিন	কাশ্মীর
১৩.	আল পাটি হুরিয়াত কনফারেনস	কাশ্মীর
১৪.	আবু নিদাল অরগানাইজেশন/স্টার্নগ্যাং	ফিলিস্তিন/ইসরাঈল
১৫.	এ ইউ সি	কলম্বিয়া
১৬.	সাইনিং পাথ	পেরু
১৭.	পিপলস ওয়ার গ্রুপ	ভারত
১৮.	তালেবান ইসলামী আন্দোলন	আফগানিস্তান
১৯.	ফিফটিন মে অর্গানাইজেশন	ইরাক

Dhaka University Institutional Repository

২০.	রেভ্যুলেশনারি অর্গানাইজেশন সেভেনটিন নভেম্বর	গ্রীস
২১.	ফোর্স সেভেনটিন	লেবানন
২২.	আবু নিদাস অর্গানাইজেশন (অ্যানো)	লিবিয়া/সিরিয়া
২৩.	সিক্রেট আর্মি ফর দ্য লিবারেশন অব আর্মেনিয়া	লেবানন
২৪.	বাস্ক সেপারেটিস্ট মুভমেন্ট (ইটা)	(স্পন/ফ্রান্স
২৫.	রেভ্যুলেশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়া (ফার্ক)	কলম্বিয়া
২৬.	কারাবুল্ডো মান্টি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এফ এম এলএন	এল সালভাদর
২৭.	হিজবুল্লাহ	লেবানন
২৮.	জাপানিস রেড আর্মি (জে আর এ)	লেবানন/সিরিয়া
২৯.	কুর্দিস্থান ওয়ার্কার্স পার্টি	ইরান/সিরিয়া/ইরাক
৩০.	এমানুয়েল রডিরিগুয়েজ প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট	চিলি
৩১.	মোজাম্বিকান ন্যাশনাল রেসিসটেন্স	মোজাম্বিক
৩২.	ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি	বলিভিয়া
৩৩.	ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি অব কলম্বিয়া (ই এল এন)	কলম্বিয়া
৩৪.	নিউ পিপলস আর্মি (এনপিএ	ফিলিপাইন
৩৫.	উলফা	ভারত
৩৬.	আবু সায়াফ	ফিলিপাইন
৩৭.	কারেন ন্যাশনাল ফ্রন্ট	মায়ানমার
৩৮.	কসভো লিবারেশন আর্মি	কসভো
৩৯.	অরেঞ্জ অর্ডার	উঃ আয়ারল্যান্ড
৪০.	রেভ্যুলেশনারী ইউনাইটেড ফ্রন্ট	সিয়েরা লিওন
৪১.	এম-১৯	কলম্বিয়া
৪২.	লর্ডস রেসিসট্যান্স আর্মি	উগান্ডা
৪৩.	ইউনিটা	অ্যাঙ্গোলা
৪৪.	রেভ্যুলেশন পিপলস স্ট্রাগল	গ্রীস
৪৫.	টুপাক আমারু রেভল্যুশন মুভমেন্ট	পেরু/বলিভিয়া
৪৬.	আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি	উঃ আয়ারল্যান্ড
৪৭.	লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম (এলটিটিই)	শ্রীলংকা

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গেরিলা গ্রুপ পরিচিতি

আল-কায়দা

বহুল আলোচিত নন্দিত ওসামা বিন লাদেনের সংগঠনের নাম আল কায়দা। ১৯৮৮ সালের দিকে আল কায়দা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করা এবং ইসলামী দেশ সমূহ থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিম নামধারী শাসকদের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যে সরকার শরীয়ত অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। সৌদি ধনকুব লাদেন তার সম্পত্তির বিরাট অংশ ব্যয় করেন। আল কায়েদার সদস্যদের ভরণ পোষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য।

মাওবাদী গেরিলা

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাও সে তুং। মাও সে তুং এর ভাবাদর্শ ও মতবাদে বিশ্বাসী জনগণকে মাওবাদী বলা হয়। ১৯৯৬ সন থেকে তারা নেপালে সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। মাওবাদী গেরিলা সংগঠনের প্রধান হলো পুষ্পকমল দহল। সামরিক শাখার প্রধান ডঃ বাবুরাম ভট্টরাই। অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের মধ্যে মোহন বৈদ্যর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনের প্রধান দাবী হলো বর্তমান সাংগঠনিক রাজতন্ত্র বাতিল করে গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ প্রতিষ্ঠা করা এবং কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রভাষা করা।

Dhaka University Institutional Repository

হিজবুল্লাহ

হিজবুল্লাহ হলো লেবাননের শিয়া মুসলমানদের একটি সংগঠন যারা লেবাননের জাতীয় স্বার্থরক্ষার কাজে নিয়োজিত। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এই সংগঠনকে আল কায়দার মতোই ভয়াবহ ও সক্রিয় সংগঠন বলে মনে করেন। তারা ১৯৮৩ সালে বৈরুতে মার্কিন দূতাবাস ও মার্কিন মেরিন ব্যারাকে আত্মঘাতী বোমা হামলার জন্য হিজবুল্লাহকেই সন্দেহ করে আসছে। হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতার নাম নাফিস আজম।

ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট

আলজেরিয়ায় সামরিক সরকার শাসন কার্য পরিচালনা করে আসছে। সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট বিয়ামায়িন জেরুয়াল এর বিরুদ্ধে সাধারণ জনসাধারণ সন্তুষ্ট নয়। সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত প্রধান বিরোধী শক্তি ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট। এই গেরিলা সংগঠনের প্রধান হল আব্বাস মাদানী।

এলটিটিই

শ্রীলংকার বিচ্ছিন্নতাবাদী তামিল গেরিলা সংগঠনের নাম এল.টি.টি.ই। এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হল লেবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম। জাফনার তৎকালীন তামিল মেয়র আলফ্রেড দুরিয়াফকে গুলি করে হত্যার মধ্যে দিয়ে এল টি.টি.ই ১৯৭৮ সালে তার গেরিলা তৎপরতা শুরু করে। এল টি.টি.ই. এর প্রধান হল ভিলুপিল্লাই প্রভাকরণ।

সাইনিং পাথ গেরিলা

দক্ষিণ আফ্রিকার রুগ্ন দেশ পেরু। ইকুয়েডরের সঙ্গে আমাজান নদীর পানি বন্টন নিয়ে ৫৩ বছর যুদ্ধ চলছে। পেরুর বামপন্থী মাওবাদী গেরিলা সংগঠনের নাম শাইনিং পাথ গেরিলা। ১৯৯০ সালে পেরুর অধিকাংশ অঞ্চল ছিল এই গ্রুপটির দখলে। এই বাহিনীর কমান্ডার এডমিরাল গুজম্যান তার বেশ কয়েক হাজার গেরিলা নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন ল্যাটিন আমেরিকার মাও সে তুং হবার। তার টার্গেট ছিল ১৯৯২ সনের মধ্যে পেরুর শাসন ভার গ্রহণ করা কিন্তু গুজম্যানের সেই আশায় গুড়ে বালি ছিটিয়ে দেন পেরুর বর্তমান প্রেসিডেন্ট আর্নেষ্ট ফুজিমারো।

ইনকাথা

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নেলসন মেন্ডেলার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশের সংখ্যা লঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গরাই রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োজিত। দক্ষিণ পন্থী শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর নাম ইনকাথা ফ্রিডম পার্টি। কাওয়াজুলু ও নাটাল প্রদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত। জুলুরা এখানে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। এই গোষ্ঠির প্রধান বুথোলুজী।

এমকিউএম

এম কিউ এম গঠনের প্রধান কারণ হলো মোহাজেরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। প্রসঙ্গতঃ করাচিতে জন্ম গ্রহণকারী মোহাজেরদের ছেলে-মেয়েদেরকে ৪৮ বছর পরও মোহাজের ও বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং পাকিস্তানের রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতিতে তাদের কৃত অবদান অস্বীকার করা হয়। একজন উর্দুভাষী ছাত্র নেতা আলতাফ হোসেন (বর্তমানে লন্ডনে নির্বাসিত) এম কিউ এম দল পরিচালনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

জে. কে. এল. এফ

জম্মু ও কাশ্মীরের গেরিলা সংগঠনের নাম জে কে এল এফ। জে কে এল এফ বলতে বোঝায় জম্মু কাশ্মীর লেবারেশন ফ্রন্ট। ভারত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য এই গেরিলা সংগঠনটি কয়েক দশক ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ভারত সরকার এই গেরিলা সংগঠনের সাথে পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ করেছে এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করছে। এ গ্রুপের নেতা ইয়াসিন মালিক।

এমআরটি এ

পেরুর অস্থিতিশীল রাজনীতির জন্য এই গেরিলা সংগঠন অনেকাংশে দায়ী। গত ১৯৯৯ সনে স্মরণকালের এক ভয়াবহ জিম্মি সংকট সৃষ্টি করে এই গেরিলা সংগঠন। তারা পেরুর রাজধানী লিমায় জাপানী দূতাবাসে ৭৪ জনকে পণবন্দী হিসেবে জিম্মি করে রাখে। তাদের দাবী পেরুর বিভিন্ন কারাগারে আটক তাদের ৪৫০ জন সঙ্গীর মুক্তি প্রদান। পরবর্তীতে সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে জিম্মি সংকটের সমাধান হয়।

পিকেকে

তুরস্কের কুর্দীদের সশস্ত্র সংগঠনের নাম কুর্দী ওয়াকার পার্টি বা সংক্ষেপে পিকেকে। এই গেরিলা সংগঠনের জনশক্তি প্রায় দশ হাজার। কুর্দী উপদলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত মারমুখী। সরকারী বাহিনীর সঙ্গে যতটুকু না তাদের শক্তি ক্ষয় হয় তার চেয়ে বেশী হয় আন্তঃদলীয় সংঘর্ষে। দলটির নেতা আব্দুল্লাহ ওসালান যাবজ্জীবন কারাদন্ডের শাস্তি ভোগ করছেন।

ফ্রেটিলিন

ফ্রেটিলিন ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। এর পূর্ণ নাম Revolutionary Front for the Independent of East Timor. ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনী এককভাবে পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং দেশের নতুন নামকরণ করে "গণপ্রজাতন্ত্রী পূর্ব তিমুর"। গেরিলা সংগঠনটির প্রধান হল জানানা গুসমাও। ডিসেম্বর, ১৯৭৫ ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনী ব্যাপকভাবে পূর্ব তিমুরে অনুপ্রবেশ করে এবং ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ পূর্ব তিমুরের রাজধানী দিলির পতন ঘটায়। তিমুরকে ২৭ তম প্রদেশ ঘোষণা করে। তখন থেকেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ইন্দোনেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আদায়ের প্রশ্নে সংগ্রাম করে আসছিল। ১৯ মে ২০০২ ইং তারিখে বিশ্বের দরবারে পূর্ব তিমুর ১৯২ তম স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান এই স্বাধীন দেশের নাম পিপলস রিপাবলিক অব ইষ্ট তিমুর। জানানা গুসমাও পূর্ব তিমুরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট।

ইউআরএনজি

গুয়েতেমালার বামপন্থী বিপ্লবী দলের নাম Guetemalan National Revolutionary Unit বা সংক্ষেপে ইউ আর এন জি। এর প্রেসিডেন্ট হল ভারো আরজু। মধ্য আমেরিকার এই গুয়েতেমালায় সুদীর্ঘ ৩৬ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসান ঘটিয়ে সে দেশের সরকার এবং বামপন্থী বিপ্লবী দল ইউআরএনজি গত ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু এই চুক্তি অমান্য করে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে দু'পক্ষই।

রাফ

পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চিম উপকুলের দেশ সিয়েরা লিওনে আন্দোলনরত গেরিলা সংগঠনের নাম Revolutionary United Front বা সংক্ষেপে রাফ। গত প্রায় এক দশক ধরে ফোদে সানকোর নেতৃত্বে রাফ সিয়েরা লিওনে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। গত ডিসেম্বর ১৯৯৬ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সরকারী পক্ষের সাথে রাফ এর ২৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আহমদ তেজান কাব্বাহ এবং বিদ্রোহীদের নেতা ফোদে সানকো শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বর্তমানে যাদের বিচার চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

খেমাররুজ

খেমাররুজ হল কম্বোডিয়ার প্রাক্তন খিউসাম্পান ও পলপট সরকারের নেতৃত্বাধীন চরমপন্থী বাহিনী। ১৯৭৫ সনে খেমাররুজ গ্রুপ দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মার্কিন সমর্থিত পুতুল সরকারের উৎখাত করে ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৯ সালে এই সরকারকে উৎখাত করে ভিয়েতনামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাহায্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জয়ী হয় ফুনসিনফিক দল। বর্তমান খেমাররুজ বাহিনী বেশ কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে।

ইউনিটা

এ্যাঙ্গোলার বিচ্ছিন্নতাবাদী বামপন্থী গেরিলা সংগঠনের নাম National Union for the Total Independence of Angola বা সংক্ষেপে ইউনিটা। এই সংগঠনের প্রধান হল জোনাস সাভিম্বি। কয়েক দশক ধরে তারা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত।

আল ফারান

জম্মু ও কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামের একটি গোষ্ঠী আল ফারান। আল ফারান মোজাহেদ গ্রুপটি ধারণা করা হয় প্রধানত আফগান গেরিলা নিয়ে গঠিত। গত ৪ জুলাই, ১৯৯৫ সালে ৫ জন পাশ্চাত্য নাগরিককে পণবন্দী হিসেবে জিম্মী করে। তাদের মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ১ জন, নরওয়ের ১ জন, যুক্তরাজ্যের ২ জন এবং জার্মানীর ১জন। আগষ্ট ১৯৯৫ নরওয়ের পণবন্দী ক্রিশ্চিয়ান অষ্ট্রাকে তারা হত্যা করে।

এমএনএলএফ

ফিলিপাইনের মিন্দানাও প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের নাম Moro National Liberation Front বা সংক্ষেপে এম এন এল এফ। ২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ এম.এন.এল.এফ ফিলিপাইন সরকারের সাথে তাদের একটি স্বায়ত্বশাসন চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ফলে দক্ষিণাঞ্চলীয় মিন্দানাও দ্বীপ নিয়ে তাদের মধ্যেকার দীর্ঘ ২৪ বৎসরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অবসানের জন্য একটি ঐতিহাসিক শান্তি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কিন্তু বেশী দিন এই শান্তি প্রক্রিয়া টিকে থাকেনি। এম এন এল এফ বাহিনীর প্রধান হল মোহাম্মদ নূর মিসৌরী।

তালেবান

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তারা আফগানিস্তানের কাবুলসহ দেশের অধিকাংশ অংশ দখল করে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট নজীবুল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। তালেবানদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ছিলেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। ১৯৯৪ এর প্রথম দিকে আফগানিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশ কান্দাহারের নাশাক নাখুদ স্থানে জনা ত্রিশেক আফগান একত্রে মিলিত হয়। মুজাহিদদের উপদলীয় লড়াই, দেশব্যাপী উৎখাত, ধ্বংস ও অরাজকতার পরিপ্রেক্ষিতে কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বসে তাঁরা। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আত্মঘাতী যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বিপর্যস্ত দেশবাসিকে রক্ষার জন্য কিছু একটা করা দরকার। সেই কিছু একটি করা থেকেই তাদের জন্ম। আফগানিস্তানে এরাই তালেবান নামে পরিচিত। রহস্যময় উত্থান, বিস্ময়কর ব্যাপ্তি ও পতন তাদের। সাম্প্রতিক টু ইন টাওয়ার ধ্বংসের পর যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। আফগানিস্তানের দক্ষিণ পূর্ব অংশের তালেবানদের আবার উত্থান ঘটেছে।

ব্লাক প্যান্থার

কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় নিগ্রোদের গঠিত সংস্থা হলো ব্লাক প্যান্থার। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করা এবং শেতাঙ্গদের আক্রমণ প্রতিহত করা বা পাল্টা আক্রমণ করাও এদের লক্ষ্য ছিল। দলের সদস্যগণ আগ্নেয়াস্ত্র, সাধারণ বন্দুক বহন করত এবং কাল চামড়ার প্যাকেট ব্যবহার করত। বর্তমানে এই সংস্থা সমাজ সেবা মূলক কাজের সাথে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্লাক ডিসেম্বর

প্যালেস্টাইনদের ব্লাক সেপ্টেম্বরের অনুকরণে পাকিস্তানের কিছু যুবক কর্তৃক গঠিত অস্বীকৃত দল। এই দল ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরে পাক-ভারত-বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের গ্লানি মোচন এবং ভারতে আটক ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই গোষ্ঠী তাদের প্রথম হামলা চালিয়েছিল লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশন অফিসে এবং এতে তাদের দুজন সদস্য নিহত হয়। বর্তমান এই দলের কোন তৎপরতা নেই।

কেডিপি

ইরাকী কুর্দীদের সশস্ত্র উপদলের একটি হল কেডিপি বা কুর্দীস্থান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। মাসুদ বারজানী নেতৃত্বাধীন এই বাহিনীতে প্রায় ৩০ হাজার সমর্থক আছে। ১৯৭৯ সালে মোল্লা মোস্তফা বারজানীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মাসুদ বারজানী স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করে আসছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল মনে করেন কুর্দীদের উস্কানীর পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে।

পি ইউ কে

ইরাকী কুর্দীদের সশস্ত্র সংগ্রামের জালাল তালাবানী নের্তৃত্বাধীন অন্য একটা উপদলের নাম পেট্রিয়াটিক ইউনিয়ন অব কুর্দীস্তান বা সংক্ষেপে পি ইউ কে। এই উপদলটি ইরানপন্থী। সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। বর্তমানে তালাবানী ইরাকের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন আছেন।

উলফা

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য আসামের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলা স্বাধীনতাপন্থী সংগঠন হল উলফা। যার পূর্ণ নাম হল ইউনাইটেড লেবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম। ১৯৬০ সাল থেকে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগ্রত হলেও ১৯৭৯ সালে উলফা প্রতিষ্ঠিত হবার পর তা সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ লাভ করে। ১৯৮৫ সালে ভারতীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও অল আসাম ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও উলফা সমর্থকরা তা মেনে নেয়নি এবং সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। ভারত সরকার ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালে উলফাদের উচ্ছেদ করার জন্য অপারেশন বজরঙ্গ এবং অপারেশন রাইনো নামে দুটি সেনা অভিযান পরিচালনা করে। বহু দমননীতি ও কৌশল প্রয়োগ করেও ভারত সরকার উলফাদের দমাতে পারেনি। ২০০৩ এ ভুটান সেনাবাহিনী ভুটানী ভূমি থেকে এ গ্রুপকে উচ্ছেদ করে এবং ২০০ নেতা কর্মীকে ভারতের হাতে তুলে দেয়।

সন্ত্রাসী কর্তৃক বিশ্বের কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড

ক্রমিক	*রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব*	*পদবী*	*হত্যাকান্ডের তারিখ*
১.	আব্রাহাম লিংকন	যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ড	১৫ এপ্রিল, ১৮৬৫
২.	জেমস্ এ পারফিল্ড	যুক্তরাষ্ট্রের ২০ তম প্রেসিডেন্ট	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১
৩.	ম্যাক কিন্‌লী	যুক্তরাষ্টের প্রেসিডেন্ট	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০১
৪.	ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যান্ড	অস্ট্রিয়ার যুবরাজ	২৮ সে জুন, ১৯১৪
৫.	নিকোলস দ্বিতীয়	রাশিয়ার জার সম্রাট	১৬ জুলাই ১৯১৮
৬.	লিওন ট্রটস্কি	রাশিয়ার যুদ্ধ মন্ত্রী ও রুশ বিপ্লবের নায়ক	২০ আগস্ট, ১৯৪০
৭.	ফক বনটে	জেরুজালেমে জাতিসংগের সুইডিশ সমন্বয়কারী	১৯৪৮ সাল
৮.	হোসনী জাইম	সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট	আগষ্ট, ১৯৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	পদবী	হত্যাকান্ডের তারিখ
৯.	মহাত্মা গান্ধী	ভারতের জননেতা ও স্থপতি	২০ জুলাই ১৯৫১
১০.	আব্দুল ইবনে হুসেন	জর্ডানের বাদশাহ	২০ জুলাই ১৯৫১
১১.	লিয়াকত আলী খান	পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	১৬ অক্টোবর ১৯৫১
১২.	বাদশা ফয়সাল	ইরাকের বাদশা	১৪ জুলাই, ১৯৫৮
১৩.	সলোমান বন্দর নায়েক	শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী	২৫সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
১৪.	প্যাট্রিক লুলুম্বা	কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী	১৭ নভেম্বর, ১৯৬১
১৫.	রাফালে ট্রুজিলো	ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রেক নায়ক	১৯৬১ সাল
১৬.	আব্দুল করিম কাশেম	ইরাকের প্রধানমন্ত্রী	৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩
১৭.	নগো. দিন দায়েম	ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট	১২ নভেম্বর, ১৯৬৩
১৮.	জন এফ কেনেডী	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট	২২ নভেম্বর, ১৯৬৩
১৯.	জিগমী দোরজী	ভুটানের প্রধানমন্ত্রী	৫ এপ্রিল, ১৯৬৪
২০.	হাসান আলী মনসুর	ইরানের প্রধানমন্ত্রী	২১ জানুয়ারি, ১৯৬৪
২১.	আবু বকর তাফাওয়া	নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী	ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
২২.	আবদুল্লাহ	জর্ডানের সুলতান	২৯ জুলাই, ১৯৬৬
২৩.	এইচ এফ হাওয়ার্ড	দঃ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬
২৪.	ড. মার্টিন লুথার কিং	মার্কিন নিগ্রো নেতা	৪ এপ্রিল, ১৯৬৮
২৫.	রবার্ট এফ কেনেডি	মার্কিন সিনেটর ও এটর্নি জেনারেল	৫ জুন, ১৯৬৮
২৬.	শোরমর্ক	সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট	অক্টোবর ১৯৬৯
২৭.	টম মুনমা	নাইরোবীর মন্ত্রী	১৯৬৯ সাল
২৮.	লুইস কারেরা ব্লানকোন	স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী	১৯৭৩ সাল
২৯.	বাদশাহ ফয়সাল	সৌদি আরবের বাদশাহ	২৫মার্চ, ১৯৭৫
৩০.	শেখ মুজিবুর রহমান	বাংলাদেশের স্থপতি ও রাষ্ট্রপতি	১৫ আগষ্ট, ১৯৭৫
৩১.	জেনারেল মুর্তজা মুহম্মদ	নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬
৩২.	ওয়াল্যান্ড লেটেরিয়ার	চিলির প্রতিরক্ষামন্ত্রী	১৯৭৬ সাল
৩৩.	ইব্রাহিম আল-হামদী	ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট	অক্টোবর, ১৯৭৭
৩৪.	কামাল জুমলাত	মধ্য লেবাননের নেতা	১৯৭৭ সাল
৩৫.	মুহাম্মদ দাউদ	আফগানিস্তান রাষ্ট্রপতি	২৭ এপ্রিল, ১৯৭৮
৩৬.	মোহাম্মদ দাউদ	আফগানিস্তান প্রেসিডেন্ট	১৯৭৮ সাল
৩৭.	পার্ক চুং হি	দঃ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট	২৭ অক্টোবর, ১৯৭৯
৩৮.	আনাসউমমিও সামেজা	নিকারাগুয়ার সাবেক একনায়ক	১৯৮০ সাল
৩৯.	জিয়াউর রহমান	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি	৩০ মে, ১৯৮১
৪০.	মোহাম্মদ আলী রাজাই	ইরানের প্রেসিডেন্ট	৩০ আগস্ট, ১৯৮১
৪১.	আনোয়ার সাদাত	মিশরের প্রেসিডেন্ট	৬ অক্টোবর, ১৯৮১
৪২.	বশির জামায়েল	লেবাননের প্রেসিডেন্ট	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
৪৩.	বেনগুইনো একুইনো	ফিলিপাইনের বিরোধী নেতা	১৯৮৩ সাল
৪৪.	ইন্দিরা গান্ধী	ভারতের জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী	৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪
৪৫.	ওলফ পালমে	সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী	২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬
৪৬.	রশীদ কারামী	লেবাননের প্রধানমন্ত্রী	১ জুন, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৭.	আবু জিহাদ	প্যালেস্টাইনী কমান্ডো প্রধান	১৯৮৮ সাল
৪৮.	জিয়াউল হক	পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট	১৯৮৮ সাল
৪৯.	লুই কার্লোস	কলম্বোর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী	১৯৮৯ সাল
৫০.	রেনে মুয়াদ	লেবাননের প্রেসিডেন্ট	১৯৮৯ সাল
৫১.	আহমেদ আবদুল্লাহ	কমোরভোর প্রেসিডেন্ট	১৯৮৯ সাল
৫২.	রিফাত মাহজিন	মিশরের স্পিকার	১৯৯০ সাল
৫৩.	ভ্যান্টিমান	লেবাননের খ্রিষ্টান রাজনীতিবিদ	১৯৯০ সাল
৫৪.	রাজিব গান্ধী	ভারতের প্রধানমন্ত্রী	২১ মে, ১৯৯১
৫৫.	আবু ইয়াদ (সালাহ খালাফ)	ফিলিস্তিনী নেতা	১৯৯১ সাল
৫৬.	মোহাম্মদ বোদিয়াফ	আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি	২৯ জুন, ১৯৯২
৫৭.	ললিত আতুলাখ মুদালী	শ্রীলঙ্কার বিরোধী দলীয় নেতা	১ মে, ১৯৯৩
৫৮.	রানাসিঙ্গে প্রেমাদাসা	শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি	১ মে, ১৯৯৩
৫৯.	হ্যাবাইয়াবিমানা	রুয়ান্ডার রাষ্টপতি	৭ এপ্রিল, ১৯৯৪
৬০.	এন্টারাইয়াসিয়া	বুরুন্ডির রাষ্ট্রপতি	৭ এপ্রিল, ১৯৯৪
৬১.	যামিনী দেশানায়েক	শ্রীলঙ্কার বিরোধী দলীয় নেতা	অক্টোবর, ১৯৯৪
৬২.	আইজ্যাক রবিন	ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী	৫ নভেম্বর, ১৯৯৫
৬৩.	ভাজগেন সার কিসিয়ান	আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী	২৭ অক্টোবর, ১৯৯৯
৬৪.	জোরান ঝিনজিচ	সার্বিয়ার প্রধানমন্ত্রী	২০০৩ সাল
৬৫.	আখমাদ কাদিরভ	চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট	২০০৪ সাল
৬৬.	লক্ষ্মণ কাদিরগামা	শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী	১২ আগষ্ট, ২০০৫

আমেরিকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে নতুন শতকের এই সময় পর্যন্ত দুনিয়া জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে এবং মিত্রদের মদদ জুগিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করলে আমেরিকাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলতে হয়। অর্থ ও শক্তির ক্ষমতার দাপটে আমেরিকা সারা দুনিয়ায় কায়েম করে রেখেছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। ছোটখাট দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক সংঘাতকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে রূপ দেওয়া এবং তাতে জড়িয়ে ফায়দা নেওয়ার প্রবণতা আমেরিকা গত অর্ধশতাব্দী ধরে চালিয়ে এসেছে। আমেরিকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা হলো।

১৯৪৫ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে ৬ আগষ্ট ও ৯ আগষ্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করে সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে' বড় সন্ত্রসী ও বর্বোরোচিত ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। আজ পর্যন্ত জাপানের কাছে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়া তো দুরের কথা দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেনি আমেরিকা।

১৯৫০-৫৩ঃ কোরিয়ার যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে অস্ত্রসহ সমর্থন জোগায় আমেরিকা। এই কোরিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই আমেরিকা বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধে সরাসরি কোনো একপক্ষের হয়ে জড়িয়ে পড়ার ধারা সুচনা করে যা পরবর্তী দশকগুলোতে অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০ঃ কথিত বিপজ্জনক ব্যক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে ধরতে হবে-এই অজুহাতে ডোমিনিকান রিপাবলিকে মার্কিন সৈন্যরা সরাসরি হামলা চালায়।

১৯৬২ঃ কিউবায় রাশিয়ার মিসাইল বেস স্থাপনের উদ্যোগ নিলে রণদামামা বাজিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে নেমে যায় যুক্তরাষ্ট্র। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনই বেধে যেতো যদি না ক্রুশ্চেভ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। এরপর থেকে সিআইএ বহুবার ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যার চেষ্টা করছে।

১৯৬৫ঃ কম্বোডিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট বোমা হামলা চালায়।

১৯৭০ঃ ভিয়েতনাম যুদ্ধের এক পর্যায়ে নমপেনে বোমা ফেলে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে মার্কিন সেনাবাহিনী পশ্চাদপসারণ করে।

১৯৭৯ঃ আফগান যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা। রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে হটানোর জন্য অস্ত্র তুলে দেয় আফগানদের হাতে। ১৯৮৯ সালে রাশিয়া পরাজয় স্বীকার করে আফগানিস্তান থেকে পশ্চাদপসারণ করে।

১৯৮১ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাককে সরাসরি সমর্থন যোগায় আমেরিকা। যোগান দেয় অস্ত্র। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবে মার্কিন অনুগত শাহ রাজবংশের পতন ঘটে এবং ইমাম খোমেনী শাসনভার গ্রহণ করেন। এরপর থেকে আমেরিকা সবসময়ই ইরানকে শায়েস্তা করার চেষ্টায় থাকে। ১৯৮১ সালে একটি যাত্রীবাহী ইরানী বিমানে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালিয়ে সেটি বিধ্বস্ত করে যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৮৮ঃ লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্ণেল গাদ্দাফীর বাসভবনে হামলা চালালে গাদ্দাফীর পালক কন্যা নিহত হয়।

১৯৮৯ঃ পানামায় মার্কিন সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং মাদক চোরাচালানে জড়িত এই অজুহাতে পানামার প্রেসিডেন্ট জেনারেল নরিয়েগাকে অপহরণ করে নিয়ে আসে।

১৯৯১ঃ কুয়েতকে দখলমুক্ত করে ইরাককে শায়েস্তা করার জন্য জাতিসংঘের তথাকথিত অনুমোদন নিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর নের্তৃত্ব দেয় আমেরিকা। যুদ্ধে পরাজিত হয় ইরাক। আত্মসমর্পন করার পর বহু ইরাকি সৈন্যকে ট্যাংকের নিচে নির্মমভাবে পিষ্ট করা হয় আমেরিকার নির্দেশে।

১৯৫০,১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন সদ্য স্বাধীন দেশগুলোয় বিভিন্নভাবে হানা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন মদদে এসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক ও তার সরকারকে উৎখাত করা হয়। ১৯৭৩ সালে চিলিতে আলেন্দেকে হত্যা, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে হত্যাসহ আরো অনেক নেপথ্য হত্যাকান্ডে মার্কিন মদদ ছিল স্পষ্ট। আরব বিশ্বে সিরিয়া ও লিবিয়া রাশিয়ার মিত্র হওয়ার কারণে এ দেশগুলোর ওপর বিভিন্নভাবে নেমে আসে মার্কিন আক্রোশ। প্যালেস্টাইনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করার জন্য ইসরাইলকে সব রকম মদদ দিয়ে আসছে আমেরিকা। ইসরাঈল ১৯৮১ সালে ইরাকের ওসিরাক পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করে দেয় বিমান হামলা চালিয়ে। ১৯৮৩ সালে তিউনিসিয়ার পিএলও'র সদর দপ্তরে বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। মধ্যপ্রাচ্যে সংকট জিইয়ে রাখা এবং ইসরাইলকে ক্রমাগত শক্তিশালী করার পেছনে রয়েছে মার্কিন মদদ। বসনিয়া-হারজেগোভিনায় হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে যখন হত্যা করা হয়েছে তখন মার্কিন বিমান মানবতার পক্ষ নিয়ে সার্বীয়দের ঠেকাতে যায়নি। অথচ উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকেই তুচ্ছ অজুহাতে আফগানিস্তান ও ইরাকে যথাক্রমে ২০০১ ও ২০০৩ সালে দখল করে বর্তমানেও অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র সন্ত্রাসী রাষ্ট্র

প্রথমতঃ আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা এবং পরবর্তিতে দখল করার ফলে জাতিসংঘের যে যে ধারা গুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লংঘন করেছে তা হলো -

ধারা-১ ঃ উপধারাঃ ৪ (ক), (গ), (ঘ) ঃ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্যবৃন্দ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সচেতন থাকবে। সকল সদস্যের সার্বভৌমত্ব ও সমতার মুলনীতির উপর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত। সকল সদস্য তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে নিস্পত্তি করবে যাতে আন্ত র্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার বিঘ্নিত না হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল সদস্য আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোন উপায় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

ধারা-৬ঃ বর্তমান সনদে উল্লিখিত মূলনীতিসমূহ ক্রমাগত ভঙ্গের জন্য দায়ী জাতিসংঘের কোন সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ সংগঠনটি থেকে বহিস্কার করতে পারবে।

ধারা-১৩ঃউপধারা-১ (খ)ঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমুহ অর্জনে সহায়তা দান।

ধারা-৩৩ঃ উপধারা-১ঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে হুমকিস্বরূপ কোন বিরোধের ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুলো প্রথমত আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, সালিশী, বিচার বিভাগীয় নিস্পত্তি, আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাদির মারফত অথবা তাদের পছন্দমত অন্যান্য শান্তি পূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করবে।

ধারা-৩৯ঃ শান্তির প্রতি কোন হুমকি রয়েছে কি না, শান্তিভঙ্গ হয়েছে কি না, অথবা কোন আক্রমণাত্মক কার্য ঘটেছে কি না, নিরাপত্তা পরিষদ তা নির্ধারণ করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য সুপারিশ করবে, অথবা ধারা ৪১ ও ৪২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা-৪১ঃ নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকর করার জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্যান্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা স্থির করবে এবং জাতিসংঘের সদস্যদের সেগুলো কার্যে বাস্ত বায়ন করার জন্য আহবান জানাবে। সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আর্থিক সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, রেলপথ, আকাশপথ, ডাক, তার, রেডিও এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রভৃতি এসব ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত।

ধারা-৪২ঃ ধারা ৪১-এ বর্ণিত ব্যবস্থাদি অপর্যাপ্ত হবে বলে অথবা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে যদি নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তার রক্ষা বা পুনরুদ্ধারকল্পে পরিষদ বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্যাদি গ্রহণ করতে পারে। জাতিসংঘের সদস্যদের সামরিক মহড়া, অবরোধ সৃষ্টি অথবা নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী নিয়োগ করে সামরিক শক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি এই ব্যবস্থাদির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ধারা-৪৯ঃ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত কর্মপন্থা অনুসরণ করার জন্য জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানে স্বীকৃত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বলে দেয় যুক্তরাষ্ট্র শুধু সন্ত্রাসী রাষ্ট্রই নয় বরং একে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের লালন ক্ষেত্র বলা যায়।

বিগত পঞ্চাশ বছরে দেশটি ১১৩ টি দেশে হয়তো সামরিক অভ্যুত্থানে ইন্ধন যুগিয়েছে নয়তো সরাসরি সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে। বিশ্বে এমন কোন দেশ খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর, যে দেশে কোন না কোনভাবে মার্কিন হস্তক্ষেপ ঘটেনি। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে ইরাক। যুক্তরাষ্ট্র নিজের ভন্ডামি চাপা দেওয়ার জন্য যত সাফাই-ই গেয়ে থাকুক না কেন, দেশে দেশে তার বিষাক্ত নখর বসানোর দাগ ইতিহাস থেকে কখনো মুছে যাবে না। আজ এখানে তার দস্যুতা ও বর্বরতার সামান্য চিত্র তুলে ধরা হলো।

১৯৪০-১৫৫০ঃ ফিলিপাইনে তেইশটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়া হয় ১৯৪০ এর দশকে। ১৯৫০ এর দশকে পঞ্চাশ হাজার ফিলিপিন সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, বিশ কোটি ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করা হয়।

১৯৪৫-১৯৫৩ঃ ১৯৫০ এর কোরিয়ার যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই আমেরিকার হস্তক্ষেপ শুরু হয়।

১৯৪৫ঃ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশে।

১৯৪৮-১৯৫৬ঃ স্পিলন্টার ফ্যাক্টর-এর মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার ১,৬৯,০০০ কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্যকে গ্রেফতার করানো হয়।

১৯৫০ এর দশকঃ জার্মানীতে রাশিয়ার আগ্রাসনের অজুহাতে পশ্চিম জার্মানীতে গোপন সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হয়।

১৯৫৩ঃ ইরানের একমাত্র ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানী অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানী জাতীয়করণ করায় প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ মোসাদ্দেককে সরিয়ে রেজা শাহ পাহলবীকে ক্ষমতায় বসানো হয়।

১৯৫৩-১৯৫৪ঃ আমেরিকা গুয়েতেমালার জ্যাকোবো আরবেনজ-এর নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে চক্রান্ত কারী সামরিক দলকে ক্ষমতায় বসায়।

১৯৫৬-১৯৫৭ঃ সিআইএ বিদেশ মন্ত্রীকে বিপুল অর্থ দিয়ে সিরিয়ার সরকার বদল করে।

১৯৫৭-১৯৫৮ঃ ১৯৫৭ সালে ৯ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্যনীতি অনুমোদিত হয়। ইসরাইল বাহিনী মিশরে প্রবেশ করে সিনাই উপদ্বীপ এবং গাজা স্ট্রিপ দখল করে।

১৯৫৭-৫৮ঃ আটটি ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনায় সিরিয়া এবং মিশরের সরকারের পতন ঘটানো হয়। মিশরের রাজা ফারুককে নির্বাসনে পাঠানো হয়। লেবাননে মোতায়েন হয় প্রায় ১৪,০০০ মার্কিন নৌ ও স্থলসেনা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৭-১৯৫৮ঃ ১৯৫৫ সাল থেকে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে হটাতে সিআইএ গোপন সামরিক কার্যকলাপ এবং প্রশিক্ষণ শুরু করে। ১৯৫৭-এর নভেম্বর মাসে সামরিক বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯৫৭-এর জুন মাসের মধ্যে সুকর্নের বাহিনী সিআইএ সমর্থিত বিদ্রোহীদের দমন করে।

১৯৫০-১৯৭৩ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান-এর নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধে মোট পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ ভিয়েতনামীকে হত্যা করা হয়।

১৯৫৫-১৯৭৩ঃ আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে বিশ লাখ কম্বোডিয়ানকে হত্যা করা হয়।

১৯৫৯ঃ হাইতির বিদ্রোহীদের দমন করতে সরকারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আক্রমণ হানে আমেরিকান সেনা।

১৯৬০-১৯৬৪ঃ সিআইএর আর্থিক ও সামরিক সাহায্য নিয়ে কঙ্গোর জোসেফ মবুতর বাহিনী প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক লুলুম্বাকে বন্দী করে জেলখানায় হত্যা করে।

১৯৬১-১৯৬৪ঃ ব্রাজিলে সরকারী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আমেরিকার OPS (ইউএস অফিস অব পাবলিক সেফটি) এক লাখ রক্ষীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে খুনী জাতীয় বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

১৯৫৯-১৯৮০ঃ ১৯৫৯-এর জানুয়ারীতে কিউবার বিপ্লবের পর থেকে আমেরিকা রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র প্রয়োগের ফলে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে কিউবায়। বহু মানুষ ও পশু মারা যায়, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

১৯৬৪-১৯৭৩ঃ চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে বিনা ক্ষতিপূরণে আমেরিকান মালিকানাধীন চিলির মাইনিং কোম্পানী জাতীয়করণ করেন। সিআইএ জেনারেল অগাস্টো পিনোশের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সরকারের পতন ঘটায়। আলেন্দেকে হত্যা করা হয়।

১৯৭০-১৯৭১ঃ কোস্টারিকায় জোসে ফিগুয়ার্স-এর সরকারকে আবার গদিচ্যুত করে সিআইএ।

১৯৭২-১৯৭৫ঃ ইরাক-ইরানের শাহের মদদ নিয়ে আমেরিকা ১৯৭২-এ ইরাকের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী কুর্দি উপজাতিদের অস্ত্র সরবরাহ করে।

১৯৮১ঃ নিকারাগুয়ায় ধীরগতিতে সন্ত্রাস চালিয়ে এ পর্যন্ত আমেরিকা তের হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করছে।

১৯৮৯ঃ আমেরিকান আগ্রাসনে পানামায় কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

১৯৮১-১৯৮৯ঃ সিআইএ লিবিয়ার মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে হত্যা করতে গিয়ে তার দু'বছরের শিশুকন্যাকে হত্যা করে। ধারাবাহিক সন্ত্রাসের ফলে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল থেকে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ থেকেঃ আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ সন্ত্রাসী কার্যকলাপে এ পর্যন্ত ইরাকে কয়েক লাখ মানুষ মারা গেছে।

১৯৬০ থেকেঃ মাদক চোরাচালান বন্ধ করার অজুহাতে মার্কিন অস্ত্র ও সেনা প্রশিক্ষণে কলম্বিয়ার সরকার সাতষট্টি হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।

১৯৯২ থেকেঃ যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়াতে ১৯৯৯ সালের ২৪ মার্চ থেকে আকাশপথে আক্রমণ চালিয়ে ৩,০০০-এর বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়।

১৯৪৮ থেকেঃ মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ইসরাইলী সেনা হাজার হাজার ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছে।

১৯৯১ সালঃ এ বছরের ১৬ জানুয়ারী ইরাকে অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম পরিচালনা করা হয়। ৪৪ দিনব্যাপী এ সামরিক অভিযানে মার্কিন বাহিনী ইরাকের গোটা অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধের পথম দিনে দেড়শ মার্কিন বিমান একসঙ্গে বোমাবর্ষণ করে এবং ৯৮টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। এ যুদ্ধ ইরাকের পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে। বোমার প্রতিক্রিয়ায় ক্যান্সারসহ মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা যেয়। এক হিসেবে জানা গেছে যে, এ পর্যন্ত উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ১৫ লাখ ইরাকী শিশু নিহত হয়েছে। এছাড়া ১০ লাখ ইরাকী প্রতিবেশী দেশগুলোতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়।

১৯৯৩ সালঃ হাইতিতে যুক্তরাষ্ট্র অপারেশন রেস্টোর হোপ পরিচালনা করে। মার্কিন অভিযানে এ দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশটির হাজার হাজার ভুখানাঙ্গা মানুষ নিহত হয়। জেনারেল ফারাহ আইদিদের বীরোচিত প্রতিরোধের মুখে মার্কিন বাহিনী পিঠটান দিতে বাধ্য হয়।

১৯৯৮ সালঃ এ বছরের ২০ আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্র একই সময়ে আফগানিস্তান ও সুদানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়, এ হামলায় আফগানিস্তানে প্রচুর নিরীহ মানুষ নিহত হয়। এছাড়া, সুদানের আল-শিফা নামে একটি ঔষুধ প্রকল্পও ধ্বংস হয়।

১৯৯৮ সালঃ এ বছরের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র আবার ইরাকে হামলা চালায়। অপারেশন ডেজার্ট ফক্স ছদ্মনামে পরিচালিত এ অভিযানে ইরাকে যুগপৎ বিমান ও ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালানো হয়। এ হামলায় রাজধানী বাগদাদসহ সারা দেশের অসংখ্য বেসামরিক আবাসিক এলাকা, মসজিদ, মক্তব ও গির্জা ধ্বংস হয়। এর পরবর্তীতে আফগানিস্তান ও বর্তমান ইরাকসহ দেশে দেশে তাদের অপকর্ম আজ বিশ্ববাসীর সামনে উদ্ভাসিত।

২০০১ সালঃ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেন সেন্টারে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এ হামলার জন্য একতরফা ভাবে কোন প্রমাণ ছাড়াই ওসামা বিন লাদেন ও তার সংগঠন আল-কায়দাকে দায়ী করে। ওসামা সৌদি নাগরিক হলেও আফগানিস্তানে তালেবান প্রশাসনের আশ্রয়ে থাকেন। ওসামাকে ধরার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২০০১ সালেল ৭ অক্টোবর ইঙ্গ-মার্কিন যৌথভাবে আফগানিস্তানে বিমান হামলা শুরু করে। একতরফা এবং অমানবিক এ হামলা একযোগে চলে। ১৩ নভেম্বর কাবুলের পতন ঘটে। তালেবান প্রশাসন ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে মার্কিন আজ্ঞাবহ হামিদ কারজাই শাসনভার গ্রহণ করেন।

২০০৩ সালঃ ব্যাপক বিধ্বংসী মরণাস্ত্র থাকার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ইরাক দখল।

Dhaka University Institutional Repository

ইরাকে বন্দী নির্যাতনঃ আমেরিকার ঘৃণ্য সন্ত্রাসী চেহারা

ইরাকের অসহায় মুসলিম বন্দীদের ওপর বর্বরোচিত নিপীড়ন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সন্ত্রাসের এক কলংক জনক অধ্যায়। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিনীদের বন্দী নির্যাতনের ভয়াবহতা ও চরম অমানবিক স্বরূপকে এক কথায় পশুত্ব বলা যায়। ইরাকের এসব বন্দীর সাথে যুদ্ধের ময়দানে নয়, তারা যখন কারাগারের চার দেয়ালে আবদ্ধ ও নিরুপায়, তখনই চালানো হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। এখানে সন্ত্রাস, প্রতিশোধ পরায়ণতা, অনৈতিক আচরণ ও যৌনবিকৃতি এক হয়ে জন্ম দিয়েছে পাশবিক কর্মকান্ড। এসব অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে যোগ হয়েছে অসহায় বন্দীদের ওপর নারকীয় নির্যাতনের বর্বরতা।

চরম নৃশংস, বীভৎস ও ভয়াবহ কোন ঘটনা বা দৃশ্য বুঝানোর জন্য 'নারকীয়' শব্দটা ব্যবহার করা হয়। ইরাকে অকথ্য বন্দী নির্যাতনের মাধ্যমে মার্কিন বাহিনী কারাগারকে 'নরক' বানাতে চেয়েছিল। এটা হচ্ছে একজন মহিলা সৈনিকের স্বীকারোক্তি, যে নিজে এই অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। মানবাধিকার সংগঠক এবং কারাকর্মকর্তা ও বন্দীদের মতে, আমেরিকার দখলকৃত ইরাকের জেলখানাগুলো নাৎসী হিটলারের কুখ্যাত বন্দীশিবিরগুলোর সাথে তুলনীয়।

ইরাকের কারাগারকেও আমেরিকান ফৌজ সে রকম জঘন্য বর্বরতার পাদপীঠে পরিণত করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল গতানুগতিক দৈহিক নিপীড়ন ও মানসিক হয়রানিই নয়, বুশবাহিনীর যৌনবিকৃতি ও ধর্ষনের মতো নরপশুত্বও ফুটে উঠেছে।

ইরাকে যে সব মার্কিন সেনা বন্দীদের সাথে চরম অসদাচরণ করেছে, নির্যাতন-হয়রানি চালিয়েছে বিভিন্ন কায়দায়, তাদের মধ্যে আছে নারীও। এমনি এক কুখ্যাত মহিলা-সৈন্যের নাম লিন্ডি ইংল্যান্ড। এ এফ পি পরিবেশিত এবং ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়, আবু গারীব জেলে এক বন্দীকে নগ্ন করার পর তার গলায় কুকুরের বেল্ট বেঁধে তাকে মাটিতে টেনেহিচড়ে বেড়িয়েছে উক্ত মহিলা। সে লোকটির গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে বাধ্য করেছে হামাগুড়ি দিতে। উলঙ্গ ইরাকী বন্দীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে উল্লাস করছে লিন্ডি।

লিন্ডির ন্যায় আরেক নারীরূপী পিশাচিনীর নাম সাবরিনা হারম্যান। সে ছিল ইরাকে মিলিটারী পুলিশ অফিসার। 'ওয়াশিংটন পোস্টকে' দেয়া সাক্ষাৎকারে সে অকপটে বলেছে, বন্দীশালাগুলোকে নরক বানিয়ে দেয়াই ছিল আমাদের কাজ। উল্লেখ্য, নির্যাতনের সময় সে অন্যদের সাথে ছবি তোলার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'পোজ' দিয়েছিল। তার স্বীকারোক্তি, 'আসলে আমার মূল কাজ ছিল আবু গারীব জেলখানাকে ইরাকীদের জন্য দুঃসহ নরকে পরিণত করা।' নিষ্ঠার সঙ্গে সে পালন করেছে দায়িত্বটি।

পশ্চিমা দুনিয়ার বস্তুবাদী অসভ্যতা নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের নামে নারীর কমনীয়তা, লজ্জা, শালীনতা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে পুরুষের সমান বানিয়েছে অনৈতিকতা ও নৃশংসতার ক্ষেত্রে। টিভি চ্যানেলে পাশ্চাত্যের যুবতীদের নৃশংস মুষ্টিযুদ্ধের দৃশ্য দেখেছেন অনেকেই। যেখানে বর্বরতার অভিযোগে এই 'খেলা' নিষিদ্ধ করার দাবী উঠছে, সেখানে নারীকেও প্রলুব্ধ করা হচ্ছে এই সহিংস কাজে লিপ্ত হতে। সবশেষে ইরাকে বন্দী নির্যাতনে নারীর অংশ গ্রহণ সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইউরোপ-আমেরিকার নীতিহীন ভোগবাদ 'নরপশুর' পাশাপাশি 'নারীপশু'ও বানাতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

ইরাকী বন্দী নির্যাতনের ঘটনার দরুন এখন আবু গারীব কারাগারের নাম বিশ্বে বহুল আলোচিত। নির্যাতনের কয়েক মাস পরে বর্তমানে জানা যাচ্ছে, ইরাকে মার্কিন গোয়েন্দা ও ঠিকাদারের হাতে আটক হতো যে সব বন্দী, তাদেরকে প্রাথমিক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই জেলে পাঠানো হতো। তখন বন্দীদের মুখ ঢাকা থাকতো কালো কাপড়ে আর হাতে লাগানো হতো হাতকড়া। আবু গারীবে ২য় দফা জিজ্ঞাসাবাদের আগেই শুরু হতো নির্যাতনের চরমমাত্রা। এটা করতো মহিলা কর্মকর্তা সাবরিনা ও তার সহকর্মীরা।

নির্যাতনের অনেকগুলো চিত্রে দেখা যায়, ইরাকী বন্দীদের উলঙ্গ করে মুখ ঢেকে তাদের দিয়ে পিরামিড আকারে স্তুপ বানানো হয়েছে। এর পেছনে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি উপভোগ এবং তাদের উপহাস করছে মার্কিন সেনারা। সাবরিনা হারম্যান এদের একজন।

আবু গারীব জেলখানায় স্থানান্তরের পর বন্দীদের সব কাপড়চোপড় খুলে তাদেরকে একেবারে নগ্ন করে ফেলা হতো। এরপর কয়েক ঘন্টা একনাগাড়ে দাঁড় করিয়ে অথবা হাঁটু মুড়ে বসিয়ে রাখা হতো। কখনো বা বন্দীদেরকে নড়বড়ে বাক্সের ওপর দাঁড় করিয়ে হাতে বিদ্যুৎবাহী তার ধরিয়ে বলা হতো, 'বাক্স থেকে পড়েছো কি মরেছো'।

প্রকাশ পাওয়া ফটোগুলোতে অত্যাচারের যেসব দৃশ্য ফুটে উঠেছে, সেগুলো থেকে দেখা গেছে, লাইনে দাঁড়ানো বিবস্ত্র পুরুষ বন্দীর প্রতি মার্কিন নারীসেনা অশ্লীল ভঙ্গী প্রদর্শন করছে। নগ্নবন্দীদের দিয়ে 'মানবপিরামিড' বানিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের হাসি হাসছে মার্কিন সৈন্যরা। পিছমোড়া হাতবাঁধা জনৈক কারাবন্দীর যৌনাঙ্গে রাইফেল দিয়ে আঘাত হানছে একজন বৃটিশ সৈন্য। মেঝেতে পড়ে থাকা বন্দীর গায়ে প্রস্রাব করছে পাশে দাঁড়ানো ব্লেয়ারের আরেক সেনা।

নির্যাতনে মার্কিনীদের চেয়ে কম যায়নি দোসর বৃটিশরা। ১৯ বছরের এক তরুণ বন্দীর ঘটনায় জানা গেছে, বৃটিশরা তাকে বন্দুকের বাঁট ও লাঠি দ্বারা আঘাত করে মাথায় ও উরুতে। লাথি মারে জোরে জোরে। পায়ের নীচে ফেলে দলিত মথিত করে। তার শরীরে প্রস্রাব করে দেয়। তদুপরি মুখে ঢুকিয়ে দেয়া হয় বন্দুকের নল।

এই অকথ্য-অমানুষিক জুলুমে তরুণটির অঝোর ধারায় রক্তক্ষরণ হতে থাকে সারা শরীর দিয়ে। অনবরত বমি হতে থাকে। ভেঙে যায় তার চোয়াল। এমনকি পড়ে যায় মাড়ির সব ক'টি দাঁত। বৃটিশ সৈন্যের বেশে নরপশুরা এভাবে আট ঘন্টা ধরে নির্যাতন চালালে ঐ তরুণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এর আগে বার বার একটু করুণা ভিক্ষা করেও সে ব্যর্থ হয় নির্মম বৃটিশদের মন গলাতে। এই হানাদার সৈন্যরা বন্দী তরুণটিকে নির্দয় নির্যাতনে জর্জরিত ও অর্ধমৃত করে ছুঁড়ে ফেলে চলন্ত ট্রাক থেকে।

প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলোর কোন কোনটিতে দেখা যায়, বন্দীর মাথা ফাঁসির আসামীর মতো 'যমটুপি' দিয়ে ঢেকে তার মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে রেখেছে একজন সৈন্য। কারো কারো মাথায় যমটুপি লাগিয়ে নিম্নাঙ্গে জড়ানো হয়েছে বৈদ্যুতিক তার। কুকুর লেলিয়ে দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। কয়েকজন বন্দীর দেহে লিখে রাখা হয় অশ্লীল নোংরা কথাবার্তা।

এমনকি, বন্দীদেরকে পরস্পরের সঙ্গে যৌনক্রিয়ার ভান করতে পর্যন্ত বাধ্য করা হয়েছে। তখন 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে উল্লাস করছিল কতিপয় মার্কিন সৈন্য। 'ভি' অর্থ 'ভিক্টরী' বা বিজয়। প্রকৃতপক্ষে এ রকম পাশবিক আচরণের মধ্য দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি নিজেই পরাজিত হলো নৈতিকভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতক সাবরিনার বক্তব্যের একটি দিক খুব তাৎপর্যপূর্ণ। রয়টার্স বলেছে, ওয়াশিংটন পোস্টের উদ্ধৃতি দিয়ে, "তার সাক্ষ্য থেকে একটি নতুন তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তা হলো-দখলীকৃত ইরাকে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক কন্ট্রাক্টররাও বন্দীদেরকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ নয়, তাদেরকে আটক ও নির্যাতনও করছে। এটা থেকে অনুমিত হয়, কিছুদিন পূর্বে উত্তর ইরাকে গেরিলারা যে ৪ জন মার্কিন ঠিকাদার বা কন্ট্রাক্টরকে খুন করেছে, ওরা নির্যাতনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এসব বিদেশী ঠিকাদার নিজেদের ভাড়াটে বাহিনী দিয়ে দখলদার ফৌজকে যুদ্ধেও সহযোগিতা করে চলেছে।"

গার্ডিয়ান অনলাইন ইরাকী কারাগারে বন্দীদের উপর অত্যাচারকে জঘন্য যুদ্ধাপরাধ হিসাবে অভিহিত করে বলেছেন, "নির্যাতনের চিত্রগুলো যেন পর্নোগ্রাফী। আমরা অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে যতটুকু জানতে চাই, এসব ছবি হয়তো তার চাইতেও অনেক বেশী কিছু প্রকাশ করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসের এহেন মহোৎসব অত্যন্ত অশ্লীল। বন্দীকে মানুষ হিসাবে ন্যূনতম মর্যাদা না দিয়ে নিছক বস্তু কিংবা নাম-গোত্রহীন মাংসপিন্ডরূপে তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছে। যারা ইরাকী বন্দীদের নির্যাতন করেছে, তাদের অপরাধবোধটুকুও আছে বলে মনে হয় না। তারা যৌনবিকারগ্রস্ত।

গার্ডিয়ান-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়ার ভাষ্যে আরো বলা হয়, বিজয়ী মার্কিন সৈন্যরা কেবল ইরাকেই নয়, এর আগেও অনেক দেশে এ ধরনের জঘন্য কাজের স্বাক্ষর রেখেছে। নারী ও পুরুষ সৈন্য নির্বিশেষে এমন অপকর্ম ওরা অতীতে করেছে বলে দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য। ইরাকে কারাগারের মধ্যে চলছে যে বর্বরতা, উর্ধ্বতন সেনা অফিসার সে ব্যাপারে ভাল করেই জানতো। এর প্রমাণ বহু। তারা চোখ বুঁজে থেকেছেন জেনে শুনেই। বন্দী-নিপীড়নের দৃশ্যসমূহ বিকৃত রুচির অশ্লীলতা। এর বাহবা বা স্বীকৃতি দেয়া উচিত নয় কোনমতেই।

ইরাকে কারাবন্দী নির্যাতনের মধ্য দিয়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের অন্যায় পাপের ষোলকলা পূর্ণ হলো। ইরাকের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে, আমেরিকা নিজ দেশে গণতন্ত্র চাইলেও অন্যদেশে স্বৈরতন্ত্রকে কেবল অনুমোদন বা সমর্থনই করে না, নিজেই তার নজীর হয়ে উঠতে পারে। তদুপরি, যে উন্নত সভ্যতার অধিকারী বলে তারা গর্ববোধ করে থাকে, তার মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে আছে চরম অসভ্যতার নগ্ন কদর্যরূপ।

এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ওরা ইরাকী বন্দীদের নগ্ন করে। আসলে নিজেদের দুশ্চরিত্র ও লাম্পট্যকেই উদোম করে দিয়েছে বিশ্ববাসীর সামনে। এর সাথে পরিস্ফুট হয়েছে, ইরাকী তথা মুসলমানদের প্রতি এক প্রকার প্রতিহিংসা এবং পাশবিক উল্লাসও। এই জুলুম নিপীড়নের ঘৃণ্য কাহিনী উদঘাটিত হয়ে পড়ার পরও ইরাকে মার্কিন হামলা, হত্যা, সন্ত্রাস ও অত্যাচারের তান্ডব অব্যাহত আছে। ইরাকী বন্দীদের প্রহার, মানসিক লাঞ্ছনা, নগ্ন করা, তাদের ওপর যৌন নির্যাতন, প্রভৃতি চরম অমানবিক কাজের জন্য কেবল সংশ্লিষ্ট মার্কিন সৈন্যগুলো দায়ী নয়। মূলতঃ দায়ী ঐ সৈন্য বাহিনীর পরিচালক পেন্টাগন এবং তার পরিচালক হোয়াইট হাউস।

বিশ্ব মানবতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের স্বার্থেই ইরাকী বন্দী নির্যাতনের বিচার হওয়া উচিৎ আন্তর্জাতিক ভাবে। আর তা অবিলম্বে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাহীন এক অসহায় সংগঠনের নাম জাতিসংঘ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বৃটেনের পায়ের নিচে থাকা ক্ষমতাহীন এক অসহায় সংগঠনের নাম জাতিসংঘ। বিশ্ব জনমতকে তোয়াক্কা না করে, জাতিসংঘকে গুরুত্ব না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন মানব সভ্যতার অন্যতম শীর্ষস্থান বলে স্বীকৃত ইরাকের বিরুদ্ধে গত ২০ মার্চ ২০০৩ মানবতা বিরোধী নির্মম হামলা শুরু করে। এ অবৈধ ও অনৈতিক হামলা রচনা করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার শিষ্যরা। অথচ জাতিসংঘ এ অনৈতিক ও অবৈধ হামলার জন্য কোন কথাই বলেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ভেতরে চেপে রাখা কদাকার কুৎসিত ও বীভৎস চেহারাটা গোটা দুনিয়ার মানুষ দেখল।

দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল বিজয়ী ডেসমন্ড টুটু'র মতে, "যুক্তরাষ্ট্র এ হামলার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, ক্ষমতা থাকলে যা ইচ্ছা তাই করা যায়।" মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মোহাম্মদ তো আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এতে প্রমাণ হলো জাতিসংঘের কোন অস্তিত্বই নেই। বিশ্ববাসী এটাই বুঝে নিল যে, এখন যাকে খুশি তাকে যেকোন সময় আক্রমণ করা যায়। আজ তারা ঘায়েল করার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে বেছে নিয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা বৃটেন ও আমেরিকা এবার এক নয়া গণতন্ত্র শিক্ষা দিল আমাদের।"

সাদ্দাম হোসেন সরকারকে পতনের নামে ইরাকের তেল সম্পদ দখলের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পরিচালিত এ যুদ্ধ নিশ্চিতভাবে একটি স্বাধীন জনগণকে শৃঙ্খলিত করার যুদ্ধ। জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে পরিচালিত এ ইরাক যুদ্ধ জাতিসংঘকে "ঠুঁটো জগন্নাথ" বানানোর উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা কারোরই অজানা নেই। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো ৫০ বছর আগে যারা জাতিসংঘের গোড়াপত্তন করেছিলন তারাই আজ জাতিসংঘকে লীগ অব নেশনের মতো কফিনে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

বহু বছর পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, You may fool; all the people some of the time; you can ever fool some of the people all the time but you can't fool all of the people all the time. কথাটি সর্বাংশে সত্য। বহুদিন মার্কিন যুদ্ধংদেহি রাষ্ট্রনেতারা একই সাথে মার্কিনী জনগণ ও বিশ্ববাসীকে বোকা বানিয়ে রেখেছিলেন কমিউনিজমের শ্বেত ভল্লুক, সন্ত্রাসবাদ এবং শেষে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র দমনের অজুহাত তুলে ধরে। একক পরাশক্তির সুযোগ নিয়ে ২০০১-এ আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতন ঘন্টা নিষ্কন্টকভাবে সম্পন্ন করার পরই যুক্তরাষ্ট্রের সাহসের পাল্লা বেড়ে যায়। কারণ কেউ তাতে বাগড়া দেয়নি। আর জাতিসংঘ নামক কাগুজে বাঘও তাতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের সব দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ নামে পরিচিত জাতিসংঘ সত্যই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের অনুমতি ছাড়াই ইরাককে তারা ধ্বংস করল, তারপর জাতিসংগের অনুমতি ছাড়াই ইরাকের জনগনের ওপর নিজের লোকদের নিয়ে গঠিত সরকারকেও চাপিয়ে দিল। ইরাকের অপরাধ ছিল সাদ্দাম হোসেন ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করেছে। কিন্তু তারা কোন নিষিদ্ধ অস্ত্রের খোঁজ পায়নি। অথচ ইরাক ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অধিকৃত হয়েছে। বিধ্বংসী অস্ত্র থাকার অপরাধেই সাদ্দাম সরকারকে হটানো হলো। আবার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ইরাকের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের ওপর ক্লাষ্টার বোমার মতো বিধ্বংসী রাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ করে ইরাকের মাটিকে দুষিত, বিষাক্ত করেছে।

এককালের ব্যাপক সমৃদ্ধ বাগদাদ ভূঁতুড়ে শহরে পরিণত করেছে। খাদ্য নেই, পানি নেই, গ্যাসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ কিছুই নেই সমগ্র ইরাকে। এক দশকে UN নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত ক্ষুধার্ত ইরাকীদের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন হামলা ছিল মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ নিষেধাজ্ঞার কারণে মারা গিয়েছিল। মোট কথা মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে ধনী, শিক্ষিত, ইরাকী জাতিকে প্রথমে UN নিষেধাজ্ঞার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে গরীব বানিয়ে ফেলে, পরে বোমা হামলা করে সব কিছু ধ্বংস করে ভিক্ষুক জাতিতে পরিণত করে। শিক্ষা-দিক্ষা ও সাংস্কৃতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য ইরাকের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী, মিউজিয়াম লুট করা হয়েছে। ইরাকীদের নৈতিকভাবে দুর্বল জাতি প্রমাণের জন্য বলা হলো এসব লুট করেছে ইরাকীরাই। কিন্তু পরে থলের বিড়াল বেরিয়ে এল, পরবর্তীতে জানা গেল, মার্কিন সাংবাদিক ও সৈন্যরা এসব লুট করে নিয়ে গেছে। এসব অভিযোগ বেশ কিছু মার্কিন সৈন্য ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সাথে থাকা ছয়শত এমডেড নামে পরিচিত হলুদ সাংবাদিক পর্যন্ত লুটপাটে অংশ নিয়েছে।

ইরাকে মার্কিন নের্তৃত্বাধীন একতরফা সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের ভূমিকাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে কিনা তা বিশ্বব্যাপী আলোচনা-বিশ্লেষণের বিষয়। একটি বিশ্ব সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘকে যদি উপেক্ষা করা হয়েই থাকে, তাহলে তো মহাসচিব কফি আনানের তখনই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাহলে কি জাতিসংঘকে অবমূল্যায়ন করা হয়নি?

অবশ্যই হয়েছে। ইরাকে প্রথম বোমাটি পড়ার মুহূর্তেই এই বিশ্ব সংস্থাটির নৈতিক মৃত্যু হয়েছে। জাতিসংঘ যে একটি নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান, কার্যক্ষেত্রে যে তার কোনো ভূমিকা নেই সেটা পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে এই সংগঠনটির ভবিষ্যৎ নেই। তারা আফগানিস্তান এবং শেষে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা ঠেকাতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে হামলা ঠেকাতে জাতিসংঘ সর্বোচ্চ কতটুকু পদেক্ষেপ নিতে পারে? অবশ্যই পারে। কারণ ইরাকে হামলা-পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপটগুলো জাতিসংঘের মধ্যদিয়েই এসেছে। কিন্তু জাতিসংঘ হামলার অনুমতি না দিলেও যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা চালিয়ে এই সংস্থাটিকে হত্যা করেছে।

জাতিসংঘের আইন অনুযায়ী অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রধান হ্যান্স ব্লিক্সের রিপোর্টে যদি বলাও হতো সাদ্দামের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র আছে, তবু জাতিসংঘ দ্রুত ইরাকে হামলার অনুমতি দিতে পারতো না। এ অবস্থায় জাতিসংঘ প্রথমে ইরাককে শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র হওয়ার সুযোগ দেবে। বহু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘ ইরাকের ওপর হামলা করার অনুমতি দেবে। কিন্তু ইরাক বিষয়ে বিশ্ব একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট দেখলো। হ্যান্স ব্লিক্স ও আল বারাদেই রিপোর্ট দিলেন ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী কোনো অস্ত্র নেই। বুশ-ব্লেয়ার বললেন, ইরাকে অবশ্যই ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে। অতএব, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার অনুমতি সংবলিত দ্বিতীয় একটি প্রস্তাব পাসের চেষ্টা করে কিন্তু প্রস্তাব পাস হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র বললো, জাতিসংঘের অনুমোদনের দরকার নেই। ইরাককে নিরস্ত্র করতে তারা একাই যথেষ্ট। আমেরিকার এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কাজেই জাতিসংঘকে ক্ষমতাহীণ এক অসহায় সংগঠনের সাথে তুলনা করা যায়। যদি তাই হয় তবে জাতিসংঘের কোন প্রয়োজন নেই।

মুলতঃ আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরোধী। সন্ত্রাসী ব্যক্তি হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী কিংবা মুসলিম যাই হোক না কেন তার প্রতি আমাদের সমর্থন নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, এ বিষয়ে বড়ো বড়ো দেশের নেতাদের অনুসৃত নীতি পক্ষপাতমুক্ত নয়। কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি মুসলিম নামধারী হলে তাঁদের লম্ফ ঝম্প দেখার মতো। কিন্তু কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি যদি হিন্দু, খৃষ্টান কিংবা ইহুদী হয় তাঁরা যেন দেখেও দেখেন না। ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সন্ত্রাসী তৎপরাতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তাঁদেরকে দেখা যায় না। অথচ ইসরাইলের সন্ত্রাসবাদই বর্তমান দুনিয়ার সব'চে বড়ো সমস্যা।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসবাদ সমাজ ও সভ্যতার দুশমন। প্রতিটি বিবেকবান মানুষই এর উচ্ছেদ কামনা করেন। কিন্তু এক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদকে বরদাশত করা ও আরেক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা দ্বারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসমুক্ত হবে না।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা

১. 'পৃথিবী' নভেম্বর' ২০০১
২. 'কারেন্ট নিউজ' অক্টোবর' ২০০১
৩. 'কারেন্ট নিউজ' এপ্রিল' ২০০৩
৪. 'কারেন্ট নিউজ' মে' ২০০৩
৫. 'পৃথিবী' জুলাই' ২০০৪
৬. 'সাধারণ জ্ঞান' কারেন্ট পাবলিকেশন্স-২০০৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৮

মিডিয়া সন্ত্রাস ঃ একটি পর্যালোচনা

মিডিয়ার মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়, তাই মিডিয়া সন্ত্রাস। আরও অগ্রসর হয়ে বলা যায়, মিথ্যা বা বানোয়াট তথ্য দ্বারা প্রবল ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি করে শত্রুকে কাবু করার যে প্রক্রিয়া, এরই নাম মিডিয়া সন্ত্রাস। যার অপর নাম তথ্য সন্ত্রাস। মিডিয়া জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য যারা বিস্তার করেছেন, তারা নিজেদের সৃষ্ট ঘটনা থেকে বিচিত্র তথ্য বের করে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে টার্গেটকে ধরশায়ী করার জন্য বিশ্বময় ভীষণ হৈ-চৈ শুরু করে এবং প্রমাণের চেষ্টা করে যে, তাদের উদঘাটিত ও প্রচারিত তথ্যই সঠিক। এ প্রক্রিয়ার নাম মূলত মিডিয়া সন্ত্রাস।

তথ্যের মাধ্যমে বা তথ্যের দ্বারা বিভীষিকা আর ধুম্রজাল সৃষ্টি করে বিবেককে বিভ্রান্ত করা হয়। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যেমন তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। আবার ঘটনা সৃষ্টি করেও তথ্য আহরণ করা যেতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সন্ত্রাস বেশ জমে উঠে। নন্ ইস্যুকে ইস্যু করে ঝড় সৃষ্টি করে থাকে মিডিয়া সন্ত্রাসীরা। মিডিয়া সন্ত্রাসকে মিথ্যাচারও বলা যায়। ছয়কে নয় আর নয়কে ছয় করাই মিডিয়া সন্ত্রাসের কূটনীতি। অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন ও সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে অথবা মিথ্যার উপরে সত্যের একটা চাদর বিছিয়ে ধোঁয়ার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে তথ্য সন্ত্রাসীরা শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে। মূলতঃ চরিত্র হননই মিডিয়া সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

মিডিয়া সন্ত্রাসকে আরও সহজভাবে আমরা বুঝতে পারি নিম্নোক্ত দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে।

মিডিয়া সন্ত্রাস-১

মনে করা যেতে পারে, আপনি একজন ডাকাতকে ধরলেন এবং পুলিশের হাতে সোপর্দ করলেন। ধৃত ডাকাত যদি কোন দাংগাবাজ রাজনৈতিক দলের কর্মী হয়, তাহলে আপনি অবশ্যই মিডিয়া সন্ত্রাসীদের শিকার হবেন। দুর্বৃত্তটি ধরা পড়ার খবর তার রাজনৈতিক দলে পৌঁছার সাথে সাথে দল থেকে এমন সব বিবৃতি ছাড়া হবে, যা শুনে বা পত্র-পত্রিকায় দেখে আপনি অবাক হবেন এই ভেবে যে, কি ঘটলো, অথচ আমি কি দেখছি আর শুনছি। তারা প্রমাণ করে ছাড়বে যে, রাজনৈতিক কারণে ওর ওপর ডাকাতির অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে আটক করা হয়। শুধু তাই নয়, রাজনীতির এমন প্যাঁচ কষা হবে, ঘটনার তথ্যকে এমন ভাবে সাজানো হবে, প্রচারণা এমন প্রবল করা হবে, অনেককে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য করবে যে, ডাকাতির অপবাদে যে ধৃত হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে সে পরিস্থিতির শিকার, অভিযোগটি নিছক অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এ হলো মিডিয়া সন্ত্রাস।[১]

মিডিয়া সন্ত্রাস-২

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিন দিনের লাগাতার হরতাল চলাকালে এক ভদ্রলোককে রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে অজস্র লোকের সামনে হরতাল আহবানকারী রাজনৈতিক দলের কতিপয় ক্যাডার দিগম্বর করে। ভদ্রলোকের অপরাধ ছিল এই, তিনি কেন হরতালের দিন অফিস করেন? ঘটনার পরের দিন ৩/৪টি পত্র পত্রিকায় এক ধরনের তথ্য আসে, এবং তথ্য সন্ত্রাসী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক শ্রেণীর পত্রিকায় বিপরীত তথ্য পরিবেশন করতে থাকে। ফলে সাময়িকভাবে একটি রাজনৈতিক দলের মেকিয়াভেলী দর্শনের জয় হলো। মূলতঃ মিডিয়া সন্ত্রাসের জয় হলো।[২]

Dhaka University Institutional Repository

মিডিয়া সন্ত্রাসের উপকরণঃ তথ্য সন্ত্রাস যে সব উপকরণ-নির্ভর, তা হচ্ছে প্রধানত নারী, অর্থ, মিথ্যাচার, প্রলোভন এবং চাকরী সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আর লোভনীয় টোপ। যুদ্ধ আর আগ্রাসনও এ ধরণের শিকারের উপকরণ।

মিডিয়া সন্ত্রাসকারী ঃ

মিডিয়া সন্ত্রাসী হতে পারে যে কোন দেশের নীতিভ্রষ্ট রাজনৈতিক দল বা সংস্থা। প্রতিপক্ষ মাথা সোজা করলেই মিডিয়া সন্ত্রাসীরা তাদের তথ্য সন্ত্রাসের হাতিয়ার দ্বারা আঘাত হেনে প্রতিপক্ষকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মিডিয়া সন্ত্রাসী হচ্ছে গোটা ইহুদী জাতি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তথ্য সন্ত্রাসের ওপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয় মিডিয়া সন্ত্রাসী হচ্ছে খ্রীষ্টান দুনিয়ার প্রভাবশালী একটি মহল।

মিডিয়া সন্ত্রাসীদের টার্গেট ঃ

তথ্য সন্ত্রাসীদের টার্গেট হতে পারে যে কোন প্রতিভাবান বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি, খেলোয়াড়, বা কোন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রী, আমলা বা সিপাহসালার। টার্গেট হতে পারে যে কোন ব্যাক্তি, যে কোন ইস্যু, যে কোন চরিত্র, যে কোন ভু-খন্ড, যে কোন দেশের বিজ্ঞান-প্রকল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে কোন দেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি। তবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানের তথ্য সন্ত্রাসীদের টার্গেট-তালিকায় মুসলিম দেশ, মুসলিম ব্যক্তিত্ব আর ইসলাম। পরিস্থিতিগত কারণে চরিত্র, সময় এবং ট্রেডেজিও বদলায়।

মিডিয়া সন্ত্রাসের পরিধিঃ

তথ্য সন্ত্রাসের পরিধি বিশ্বব্যাপী। তাদের টার্গেট বিস্তৃত। বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের কী (Key) পয়েন্ট পর্যন্ত। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তথ্য সন্ত্রাসের কারেন্ট জাল রয়েছে। তাঁদের এজেন্টরা প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের খবর স্ব-স্ব হেড কোয়ার্টারে পাঠাচ্ছে। প্রেরিত খবরের ভিত্তিতে হেড কোয়ার্টারের কর্মকর্তারা ট্রেডেজি পরিবর্তন করছে, টোপ অদল বদল করছে, নতুন তালিকা তৈরী করে এজেন্টদের নিকট প্রেরণ করছে। এভাবে তারা বিশ্বব্যাপী তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করছে। সুতরাং বলা যায়, তাদের নেটওয়ার্কের বাহিরে এ পৃথিবীর কোন স্থান বা সংস্থা, এমন কি কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা ইস্যুও নেই।

তথ্য সাম্রাজবাদ গড়ে উঠেছে প্রধানত চারটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সমন্বয়ে। এরা হচ্ছে এপি. ইউপিআই, রয়টার এবং এজেন্সী ফ্রান্স প্রেস (এ এফ পি)। 'সংবাদের অবাধ ধারা' এই শ্লোগান নিয়ে তারা মাঠে নামে। ইউনেস্কোর নয়া বিশ্ব যোগযোগ নীতি এই সাম্রাজ্যের সম্রাটেদের মূল লক্ষ্য।

মিডিয়া সন্ত্রাসের বিকৃতিঃ ডায়নার বিয়ে

১৯৮৩ সালের ২৯শে জুলাই বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয় ডায়নার বিয়ের খবর ও ছবি। দু'টি পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পদকীয় ছাপা হয়। চালর্স-ডায়নার সংবাদ অবজারভার ছাপে ৪৭ ইঞ্চি, ইত্তেফাকে ১১০ ইঞ্চি, সংবাদে ৪৬ ইঞ্চি আর বাংলাদেশ টাইমস ছাপে ৭২৫ ইঞ্চি।

চার্লস-ডায়নার ছবি এতো ফলাও করে প্রচার করার হেতু কি? হেতু শুধু একটি, তথ্য সাম্রাজের তথ্য-শৃংখলে আমরা বন্দী। চালর্স-ডায়নার বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্যে কানাডার এক দুর্লভ জাতের ৬০০ ভল্লুককে একদিনে হত্যা করা হয়। বিয়ে উপলক্ষ্যে রাজকীয় বাহিনীর বিশেষ টুপী ভল্লুকের চামড়া দিয়ে তৈরী করার জন্য। এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন চার্লসের পিতা ফান্ড চার্লস। তিনি তাঁর ছেলেকে বলেন, তুমি খুনী। দুর্লভ প্রজাতির ভল্লুক তুমি হত্যা করেছো। অথচ মিডিয়া সন্ত্রাসীরা এ খবরটি পরিবেশন করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

ডায়না নিহত হওয়ার ঘটনা আরও ব্যাপক পাবলিসিটি পায়। আমাদের দেশেই দেখা গেল, দেশের প্রায় সবক'টি দৈনিক ডায়নাকে 'হৃদয়ের রাণী' উপাধিতে ভূষিত করলেন। অথচ যে ডায়না ছিল নিহত হওয়ার সময় ৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। ডায়নার পেটের এ সন্তানতো চালর্সের ছিল না। তাহলে ডায়নার সন্তান কার ছিল? এমন ভ্রষ্টা নারীকে নিয়ে আমাদের নাচানাচি পক্ষপাত দুষ্ট মিডিয়া সন্ত্রাসের কাজ।

আবার আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত এক ধরনের কীটনাশক ঔষুধ ইরাকের শস্য ক্ষেত একবার ব্যবহৃত হয়। এর ফলে উৎপাদিত গম ও রুটি খেয়ে একটি এলাকার ৬ হাজার লোক মারা যায়। পাশ্চত্য তথ্য সাম্রাজের সম্রাটরা এ খবর চেপে যায়। এ হচ্ছে তথ্য সাম্রাজের 'সংবাদের অবাধ ধারার' নমুনা। আগেই বলেছি, তিলকে তাল করা আর তালকে তিল করার লক্ষ্যেই তথ্য সন্ত্রাসের সৃষ্টি।[৩]

মিডিয়া সন্ত্রাসের উদ্ভব

আধুনিক বিশ্বে মিডিয়া সন্ত্রাস জন্ম নিয়েছে ইয়েলো জার্নালিজম থেকে। ইহুদী খ্রীষ্টানদের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে এই জার্নালিজম অনেক এগিয়ে দিয়েছে। ইসলাম-বিদ্বেষ হচ্ছে তাদের প্রধান টার্গেট।

ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতার বয়স খুব বেশি নয় এবং জন্মস্থানও একাধিক নয়, মাত্র একটি। আর সে স্থান হলো খোদ আমেরিকা। আমেরিকা হচ্ছে ইয়েলো জার্নালিজমের সূতিকাগার। এই সাংবাদিকতা সে দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে চালু ছিল। এখনও কূটনৈতিক আবরণে শক্তিমান ও সক্রিয়। ১৮৯৫ সালের শেষ দিকে নিউইয়র্ক থেকে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। একটি সানডে ওয়ালর্ড অপরটি সানডে জার্নাল। সানডে ওয়ালর্ড পত্রিকায় ' দি ইয়েলো ফিড' নামে একটি হাসির ছবির সিরিজ বের হতো। পরে জার্নাল পত্রিকায়ও এ ধরনের ছবি প্রকাশ হতে থাকে। শুরু হয় প্রতিযোগিতা। কে কত বেশি লোক হাসাতে বা কাঁদাতে পারে, কে কত আশ্চর্য খবর দিতে পারে, কে কত অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ফিচার বা গল্প ছাপতে পারে, সে প্রতিযোগিতায় কর্মকর্তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। একই সাথে চমক লাগানো খবর পরিবেশনের প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। চমক লাগানো খবর সৃষ্টির জন্য তারা সত্য খবরকে অতিরঞ্জিত করতে থাকেন। মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে থাকেন। সমাজে প্রতিষ্ঠিতদের দোষ-ত্রুটিও খোঁজতে থাকেন। মিথ্যাচার ভর করে। শুরু হয় ইয়েলো জার্নালিজমের যাত্রা।

তথ্য পরিবেশনার চেয়ে উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি চরিতার্থ করাই ইয়েলো জার্নালিজমের মুল লক্ষ্য। কাগজের অতিরিক্ত কাটতির জন্য যৌনতা, হিংসা, জিঘাংসা, কেলেংকারী, অপরাধ,মিথ্যাচার, অপবাদ ইত্যাদি বিষয়ক সংবাদ সৃষ্টি করে পরিবেশন শুরু হয়। এটা হয়ে দাঁড়ায় ইয়েলো জার্নালিষ্টদের দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় কাজ। তবুও আমেরিকার সে সময়কার ইয়েলো জার্নালিজম আর আমাদের দেশের বর্তমানের ইয়েলো জার্নালিজমের পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। ওরা যদি পায় পাস মার্ক, আমাদের 'তারা' পাবেন লেটার মার্ক। পথিকৃৎদের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা আদি ওস্তাদদের পর্যন্ত ছাড়িয়ে গিয়েছি। কয়েকটি ফটকাবাজ দেশী ঔষুধ কোম্পানীর এমন সব বিজ্ঞাপন আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়, যার ভাষা শুনে শয়তানও লজ্জা পায়। এ হচ্ছে মিডিয়া সন্ত্রাসের রাজত্ব।

আমেরিকার এক শ্রেণীর সাংবাদিক নিউইয়র্ক জার্নাল, নিউইয়র্ক ওয়ার্লড প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ইয়েলো জার্নালিজমের নামে যে জার্নালিজম শুরু করেছিলেন, তা ছিল মুলত ক্রাইম রিপোর্ট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চাঞ্চল্যকর কেলেংকারির ঘটনা, সরকারী-বেসরকারী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্নীতি সংক্রান্ত খবর। স্যামুয়েল হপকিন্স, এ্যাডামস্, লিংকন, ষ্টিমোন্স এবং এ্যাডাম টারবেল প্রমুখ সাংবাদিক হলেন ইয়েলো জার্নালিজমের পথিকৃৎ। এই সাংবাদিকতাকে তখন আমেরিকার সুধীরা বলতেন Journalism of Muckworm অর্থাৎ গোবরে পোকাদের সাংবাদিকতা। যারা এ সাংবাদিকতা করতেন, তাদের বলা হতো Muckrakers, এর অর্থ হচ্ছে যারা নোংরামি ছড়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ইয়েলো জার্নালিজমকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যম করে নেয়া হয়। ইহুদীরা এ জার্নালিজমকে প্রথমেই লুফে নেয়। তারা এরই ভিত্তিতে তথ্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। সারা বিশ্বে তারা তথ্য সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। বর্তমান অবস্থা তো হচ্ছে এই, বিশ্বের সংবাদপত্র ব্যবসা থেকে ইহুদীদের যদি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তাহলে বর্তমান জগৎ প্রায়ই সংবাদপত্র শুন্য হয়ে পড়বে।

মুসলিম বিশ্বে মিডিয়ার আগ্রাসন

মিডিয়া আধুনিক বিশ্বে এক অপার শক্তির আধার। মুসলিম বিশ্ব আজ যেসব আগ্রাসনের শিকার তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রিন্ট ও আকাশ মিডিয়া। দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী অস্ত্র এখন এ গণমাধ্যম। এর যাদুকরী প্রভাব মানুষের চিন্তা ও চেতনার জগতে সৃষ্টি করতে পারে প্রলয়ংকরী ঝড়। বিশ্বে এখন যারা যত উন্নত তারা মিডিয়ার ক্ষেত্রে ততটা অগ্রগামী। এ মিডিয়া একচেটিয়া পশ্চিমাদের হাতে থাকার কারণে তারা এখন গোটা দুনিয়ার হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছে। প্রিন্ট ও আকাশ মিডিয়ায় তারা অগ্রসর। এ কারণে দুনিয়ার যাবতীয় অর্জন ও সাফল্য প্রচারের তোড়ে তারাই সব হাতিয়ে নিচ্ছে। দুনিয়ার অর্জনে ও সফলতায় আর কারো যে ভূমিকা থাকতে পারে তা তাদের অবিরাম প্রচারণার প্রাবল্যে হারিয়ে গেছে।

আরো দুঃখজনক হলো, দুনিয়ার তাবৎ মিডিয়াগুলোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ইহুদীদের হাতে। আর ইহুদীরা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর ও ইসলাম বিরোধী আগ্রাসী শক্তি। ফলে আজকের মিডিয়ার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম বিরোধিতা এবং মুসলিম বিদ্বেষ। ইসলামকে ইহুদীরা কোনদিনই বরদাশত করতে পারেনি। তাদের শঠতা, কপটতা ও মিথ্যাচারের তান্ডবে ইসলাম সব সময় উৎপীড়িত হয়েছে। তাই পবিত্র কুরআন পাকে এ জাতিকে অভিশপ্ত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বর্তমান যুগেও ইহুদীরা একই আচরণ করেছে ইসলামের সাথে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমান। ইসলামের সাথে সম্পর্কিত এবং মুসলিম স্বার্থের সাথে জড়িত যে কোন খবরকে তারা অসত্যভাবে অথবা বিকৃত করে প্রচার করে থাকে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে জন্ম হয় বিরক্তি বা ঘৃণা। পশ্চিমের মানুষের মনে ইসলাম বিদ্বেষের মুল কারণ তাদের মিডিয়ার অব্যাহত মিথ্যা ও অমূলক প্রচারণা। এ কাজে ইহুদীদের সাথে এখন খৃষ্টানরাও এসে হাত মিলিয়েছে। তারা প্রতিনিয়ত ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করে চলছে। মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত চেহারা তারা ইচ্ছে করেই বদলে দিচ্ছে অথবা আড়াল করে দিচ্ছে।

ইহুদী-খৃষ্টানদের এ চরিত্রকে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ Edward Sayyed যথাযর্থভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "The Media have therefore covered Islam, they have portrayed it, analyzed it, characterized it, given instant courses on it, and consequently they have made it Known." [৪]

পশ্চিমারা মিডিয়া থেকে ইসলামকে সেকেলে (Backdated), উগ্র (Fanatic), মৌলবাদী (Fundamentalist) বলে প্রচার করছে। অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সন্ত্রাসী, প্রতিক্রিয়াশীল (Fanatic), অসভ্য (Uncivilized), অজ্ঞ (Ignorant) বলে গালাগালি দিয়ে চলেছে। সুযোগ পেলেই পশ্চিমা মিডিয়াগুলো মুসলমানদের চরিত্র হনন করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার প্রচার করে থাকে। তারা মিডিয়াকে মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ব্যবহার করে যাচ্ছে। [৫]

পশ্চিমারা মিডিয়াতে অহরহ যেসব প্রচারণা চালাচ্ছে সেগুলো হলোঃ ১. ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা। অথচ ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিকে এক বলে মনে করে। ২. ইসলামে মানবাধিকার বলতে কিছু নেই।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে তারা ইসলামের হাতকাটা ও শিরচ্ছেদের বিধানকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। ৩. ইসলাম বহু বিবাহ সমর্থন করে। ইসলামে নারীর কোন মর্যাদা নেই। ইসলামের পর্দা বিধান প্রগতিবিরোধী। ৪. ইসলাম অন্যান্য ধর্মকে অসহ্য মনে করে। ৫. মুসলমানরা প্রতিক্রিয়াশীল। ৬. ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের কোন স্থান নেই।[৬]

এভাবে ইসলামের ব্যাপারে অমূলক প্রচারণা পশ্চিমারা গণমাধ্যমগুলোতে চালিয়ে মিডিয়া সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।

মিডিয়ার পরিচিতি

সারা পৃথিবীতে অসংখ্য মিডিয়া জালের মত ডালপালা বিস্তার করে আছে। এসব মিডিয়া সাধারণত দুই ধরনের। যথাঃ ১. প্রিন্ট মিডিয়া ২. আকাশ মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া (স্যাটেলাইট বা চ্যানেল)। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে আছে পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া নানা ধরনের। যথা-টেলিভিশন, রেডিও, ক্যাবল নেটওয়ার্ক, অডিও-ভিডিও, টেলিফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি। চলচ্চিত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটি বড় অংশ। গান-বাজনা, নাটক এগুলোও মিডিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে কাজ করছে। এ মিডিয়াগুলো উপনিবেশিক আমল থেকে মুসলিম দেশগুলোতে প্রবেশ করেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অধিকাংশ মুসলিম দেশে পশ্চিমাদের কলোনী স্থাপিত হয়। তখন থেকে সেখানে পশ্চিমাদের আদলে মিডিয়া গড়ে ওঠে। এরপর এক সময় মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা এলেও দেশের হর্তাকর্তারা পশ্চিমা ঘেঁষা হবার কারণে মিডিয়ার ধরন ও প্রয়োগ আগের মতই থেকে যায়। মুসলমানদের নিজস্ব কোন মিডিয়া নীতিমালা গড়ে উঠতে পারেনি। আজও মুসলমানরা মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমা দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে।

এ বাস্তব বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন Suhaib J. al Barzinji তাঁর বিখ্যাত বই 'Working Principles for an Alternative Islamic Model in Mass Media Communication'-এ। তিনি লিখেছেন- 'The most significant influence of colonialism remaining after these Muslim countries gained independence is apparent in the institutions constituting their political systems. Many of these countries adopted secular constitutions, thus completely separating the institutions of government from those of religion. In addition, many of the educational, judicial, economic, and mass media institutionswere also closely modeled on those of former occupiers'.[৭]

মুসলিম বিশ্বে প্রিন্ট মিডিয়ার আগ্রাসন

দুঃখজনক হলো প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে (বই-পুস্তক, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল) পশ্চিম দুনিয়া ইহুদীদের প্রভাব একচেটিয়া। এ মিডিয়ার নিয়ন্ত্রন হাতে গোনা কয়েকটি খৃষ্টান অথবা ইহুদী প্রতিষ্ঠানের উপর। পশ্চিমাদের সংবাদপত্র,বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় সেগুলোতে মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাসকে কতটা সুকৌশলে তারা বিকৃতভাবে প্রচার করছে। মুসলিম দুনিয়ার ভাল খবরকে তারা চেপে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের সামান্য ভুলকে তারা ফুলিয়ে ফাপিয়ে বড় করে প্রচার করছে। মুসলমানদের নানাভাবে ব্যাঙ্গবিদ্রুপ করা হয় তাদের বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায়। আমরা লক্ষ্য করি, ফিলিস্তিনের নিরীহ ও অধিকার হারা মানুষকে বিনা কারণে ইসরাইলী সেনারা প্রতিদিন পাখির মত গুলি করে হত্যা করছে, তাদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এ ঘৃণার কাজটি করার পরও প্রচার মাধ্যম ইসরাইলকে শান্তির পক্ষের শক্তি বলে অবিরাম প্রচারণা চালাচ্ছে। আর ফিলিস্তিনীরা বর্বরোচিত ইসরাইলী আক্রমণকে ইট পাটকেল দিয়ে প্রতিহত করতে গেলে তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

"একই ভাবে ইসলামী দুনিয়ার সবকটি স্বাধীনতার লড়াইকে পশ্চিমারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, মৌলবাদের অপতৎপরতা কিংবা সন্ত্রাসীদের উগ্রতা বলে প্রচার করছে। একই প্রচারণা আমরা লক্ষ্য করি কাশ্মীর, ইরান, আলজেরিয়া, বসনিয়া, কসোভা কিংবা মরো আন্দোলনের বেলায় আলজেরিয়ার ইসলামী ফ্রন্ট বিপুলভাবে বিজয় লাভ করায় সারা বিশ্বের মিডিয়াগুলো সমস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল। তারা এ গণতান্ত্রিক বিজয়কে মেনে নিতে পারলো না। তারা এটাকে মৌলবাদের বিজয় বলে প্রচারণা চালাতে থাকলো। প্রিন্ট মিডিয়াতে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা এ নিয়ে আতংক ছড়াতে শুরু করে দিলো। বলা হলো, 'There are fears that such fundamentalist success will inspire fanatics in Algeria. তারা ইসলামপন্থীদের বিজয়কে মধ্যযুগের বর্বরতার উত্থান বলে প্রচারণা চালাতেও দ্বিধা করলো না। বলা হলো, 'The scope for the fundamentalist mandate give rise to return to the Middle ages. প্রিন্ট মিডিয়ার এরকম মুসলিম বিরোধী প্রচারণা আমরা কাশ্মীরের বেলায়ও দেখা যায়।" [৮]

"তাদের স্বাধীনতার লড়াইকে সন্ত্রাসী কাজ বলে আখ্যায়িত করা হলো। কাশ্মীরের ব্যাপারে বলা হলো, The terrorist in Kashmir are struggling for the establishment of a extreme fundamentalist state. বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্বদের গণহত্যার বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতিও ঠিক একই বিষোদগার চালিয়েছিল পশ্চিমারা। তখন বলা হয়েছিল, সেখানকার মানুষ Fundamentalist এবং উগ্র। মিডিয়াগুলো এ লড়াইকে রুখার আহবান জানালো। বৃটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর পর্যন্ত নিরীহ ও নিরস্ত্র বসনীয়াবাসীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বললেন। তিনি তার একজন মন্ত্রী ডগলাস হেগকে মুসলমানদের এ প্রয়াস দমন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি বললেন, An Islamic state within Europe will not be tolerated. We will continue to follow this policy. সবগুলো পশ্চিমা প্রিন্ট মিডিয়া থেকে জন মেজরের এ কথা সমস্বরে প্রচার পাচ্ছিল।" [৯]

"বিশ্বের প্রিন্ট মিডিয়া বর্তমানে দুই ডজনের মত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যার অধিকাংশই কোন না কোনভাবে পাশ্চাত্য বিশেষ করে ইহুদীদের নিয়ন্ত্রিত। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- Time Warner (Publishing, Movies, CNN, HBO, Time Magazine, People Magazine etc.) Disney (ABC, Disney, A&F, Publishing, Radio Stations etc.) Bertelsman (TV channels, 100 news papers, Magazines, Radio Station), Viacom (Radio station, MTV, Publishing), GES news Corporation (Fox, 132 Newspapar including London Times and New York Post, TV guide). বিশ্বে অনবরত যে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে এবং যেসব মন্তব্য, মতামত ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানই সেসব নির্ধারণ করে থাকে। যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হচ্ছে ইহুদী বা খৃস্টান, তাই তাদের লক্ষ্য থাকে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতা। উল্লেখ্য, বই-প্রস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রেও পশ্চিমা বিশ্ব শীর্ষে অবস্থান করছে।" [১০]

পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য থেকে প্রতিবছর ৫৯,০০০ এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪০,০০০ বেশি পুস্তক প্রকাশিত হয়। অথচ মালয়েশিয়ায় সর্বোচ্চ ৪,০০০ এবং পাকিস্তানে ৩২০টি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। পশ্চিমাদের এই বিশাল পুস্তক ভান্ডারের কোথাও ইসলামের অনুকূলে বা পক্ষে কোন আলোচনা নেই বললেই চলে। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রিন্ট মিডিয়াতেও পশ্চিমারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

"এসব পত্র-পত্রিকা পুরোমাত্রায় ইসলামবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-১. The International Herald Tribune. এটির সদর দপ্তর ফ্রান্সে। হংকং এবং সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের ১০টি শহর থেকে এই পত্রিকাটি একত্রে প্রকাশিত হয়। এটির প্রচার সংখ্যা ৯০,০০০। ৩. The Financial Time of London. পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৩,০০,০০০ এর মত। এটি অর্থনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় পত্রিকা। ৪. The Economist. পত্রিকাটির দপ্তর বৃটেনে হলেও এটি ভার্জিনিয়া, লন্ডন ও সিঙ্গাপুর থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়। এর প্রচার সংখ্যা ৪,০০,০০০। ৫. The Wall Street Journal. পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ৯০,০০০। এটি ইউরোপ ও এশিয়ায় জনপ্রিয়। এগুলো ছাড়াও আরো যেসব পশ্চিমাঘেঁষা পত্রিকা রয়েছে তার মধ্যে আছে- New York Times, Le Monde (France), Elapais (Spain) ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে কতগুলো সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক জনপ্রিয় ম্যাগাজিন। এগুলো হলো- Readers Digest (Circulation-1,60,00,000 in 200 countries in 15 Ianguages). Time (Circulation-1,50,00,000 in 150 countries), Asia Week, Business Week, Fortune ইত্যাদি।" [১১]

এ ছাড়াও বিশ্বে কতগুলো বড় বড় নিউজ এজেন্সি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো রয়টার, এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস (এএফপি), ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল। এসব এজেন্সির সবগুলোর নিয়ন্তা হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব। ফলে এসব প্রিন্ট মিডিয়াতে মুসলমানদের ভাল খবরকেও বিকৃত করে প্রচার করা হয়। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে অধিকার হারা মুসলমানরা যে লড়াই আন্দোলন করে যাচ্ছে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে তাকে কখনই ভাল চোখে দেখা যাচ্ছে না বরং ফিলিস্তিন, ইরাক, চেচনিয়া, সোমালিয়া, কাশ্মীর, মিন্দানাও-এর স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের পশ্চিমা মিডিয়াতে কুখ্যাত সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো হয়।

পাকিস্তান যখন পারমাণবিক বোমা বিপজ্জনক এবং বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। কিন্তু ভারত বোমা বানালে তাকে হিন্দু বোমা বলা হয় না। কিংবা ইসরাইল হাজারো পারমাণবিক বোমার অধিকারী হলে তাকে ইহুদী বোমাও বলা হয় না অথবা তাকে কোনরূপ হুমকি মনে করা হয় না। এমতাবস্থায়, পশ্চিমা প্রিন্ট মিডিয়ার এ ঘৃণ্য তৎপরতা ও বিরুদ্ধাচরণের মুকাবিলায় মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী কোন একটি মাধ্যম নেই যা দিয়ে ইসলামবিরোধী অপতৎপরতার সামান্য হলেও জবাব দেয়া যায়।

বিশ্ব নিউজ এজেন্সির মধ্যে মুসলমানদের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালে OIC কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিকল্প সংবাদ সংস্থা। International Islamic News Agency (IINA). যা মুসলিম বিশ্বের বিশাল চাহিদা বিন্দুমাত্র প্রশমিত করতে পারলেও বর্তমানে তা অকর্মণ্য ও নামমাত্র সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

সউদী আরবের সবচেয়ে পুরানো দৈনিক পত্রিকা আল বিলাদ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। চলতি বছরের শুরু থেকে পত্রিকা ষ্টান্ডে আল বিলাদ দেখা যাচ্ছে না। জেদ্দা ভিত্তিক পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশনা শুরু হয় যে বছর, আধুনিক সউদী আরব ঐক্যবদ্ধ হয় সে বছরই, ১৯৩২ সালে। তখন অবশ্য পত্রিকাটির নাম ছিল 'হেজাজের কণ্ঠস্বর'। ২৮ বছর পর এর নামকরণ করা হয় আল বিলাদ। বিলাদ অর্থ দেশ। বর্তমান সময়ে যার প্রচার সংখ্যা কয়েক হাজার হলেও প্রায় ৫ কোটি রিয়াল লোনের বোঝা মাথায় নিয়ে ও সাংবাদিক-কর্মচারীদের ৫ মাস ধরে বেতন দিতে না পারায় পত্রিকাটি দুঃখজনক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে গত ২০০২ সালের এপ্রিলে আল জাজিরার সান্ধ্য দৈনিক আল মাসাইয়া বন্ধ হয়ে যায়। সউদী আরবে ৭টি আরবী, তিনটি ইংরেজী ও একটি বাণিজ্য দৈনিক পত্রিকা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও লন্ডন থেকে প্রকাশিত সউদী মালিকানাধীন নিখিল আরব দৈনিক আল হায়াত ও আল-শারক আল আওসাত পত্রিকা দুটি সউদী আরবে বেশ চললেও এ পত্রিকার সবগুলোই ব্যক্তিমালিকানাধীন। সউদী সরকার বিভিন্ন সংস্থায় অবদান রাখলেও নিজস্ব কোন পত্রিকা আজ অবধি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং প্রচার মাধ্যমে তেমন কোন অবস্থাও গড়ে তুলতে পারেনি।

বই-পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারেও পশ্চিমা বিশ্ব শীর্ষে অবস্থান করছে। প্রতি বছর যুক্তরাজ্য গড়পড়তা ৫৯,০০০ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৪০,০০০ নতুন বই প্রকাশিত হয়। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে মালয়েশিয়া ৪০০০ নতুন বই প্রকাশ করে থাকে। পাকিস্তান প্রতিবছর ৩২০টি নতুন বই প্রকাশ করে। পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় যা অতি নগণ্যই বটে।

গ্লোবাল ব্রডকাস্টিং মিডিয়ার আগ্রাসন

"বিশ্বের ১৫০টির বেশী দেশ International Short Wave (আন্তর্জাতিক নিম্ন তরঙ্গ) এর সাথে যুক্ত। প্রচন্ড প্রতিযোগিতার এ বিশ্বে নিম্নলিখিত পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিচালকের সীটে অবস্থান করছে। (১) The Vioce of America: মাত্র কিছুদিন পূর্বে ২০০২ সালে সংস্থাটি তার অর্ধশত বছর পূর্তি উৎসব শেষ করল। এ সংস্থাটি ১৫০ মিলিয়ন শ্রোতার কাছে ৪০টি ভাষায় তাদের সংবাদ, ফিচার, সঙ্গীতসহ নানাবিধ বিষয় প্রচার করে থাকে। (২) Radio Moscow (RM): সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির পূর্বে রেডিও মস্কোর খ্যাতি ছিল বিশ্বে সবার শীর্ষে। (৩) The World Service of The British broadcasting Corporation (BBC): বিবিসি সংবাদ সংস্থাটি ১৫০ মিলিয়ন শ্রোতার কাছে ৩৭ টি স্বতন্ত্র ভাষায় সংবাদসহ নানাবিধ প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে সংস্থাটির জনপ্রিয়তা সর্ব শীর্ষে অবস্থান করছে। (৪) Radio Beijing: প্রতি সপ্তাহে এ সংস্থাটি ৪০টি পৃথক ভাষায় গড়ে ১৪০০ ঘন্টার প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকে। (৫) Deutsche Well (DW): প্রতি সপ্তাহে এ সংস্থাটি ২৬ টি পৃথক ভাষায় ৮০০ ঘন্টার প্রেগাম ব্রডকাষ্ট করে থাকে। DW-র ট্রান্সমিশন জার্মানি, এশিয়া, আফ্রিকাতে রয়েছে।

৮০ এবং ৯০ এর দশকে ব্রডকাষ্টিং ইতিহাসে স্যাটেলাইট ব্যবস্থাপনা যোগ করেছে এক নতুন অধ্যায়। Cable News Network (CNN) -এর পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা Ted Turner এই নব দিগন্তের সূচনা করেন। ১১২ টি দেশের ৭৫ মিলিয়ন পরিবার বিশ্বের হাজারো হোটেলের বাসিন্দা CNN এর সংবাদ প্রত্যক্ষ করে থাকে।

International Vido Service of Japan যা (NHK) নামে সমধিক পরিচিত যা CNN এর সাথে প্রতিযোগিতায় নামে। আন্তর্জাতিক যোগযোগ সংস্থা যেমন VIS NEWS এবং World Wide Television News (WTN) বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশন ষ্টেশনে তাদের সংবাদ, ছবি ও সঙ্গীত প্রেরণ করে থাকে।" [১২]

যুক্তরাষ্ট্রের World Net সংস্থাটি বিশ্বের ৫৮ টিরও বেশী দেশে তাদের নিজস্ব নির্মিত মুভি এবং ভিডিও টেপ প্রেরণ করে। অতি সম্প্রতি Fox Television Network বিশ্বব্যাপী তাদের প্রোগ্রাম প্রচার করতে শুরু করেছে। স্যাটেলাইট ডিশ এ্যান্টেনা টেলিভিশন প্রচার মাধ্যমের সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ভিডিও ক্যাসেট এবং ফিল্ম তাদের শক্তিশালী একটা অবস্থান দখল করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমেরিকা রয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। যেখানে আফ্রিকা এবং ইউরোপ তাদের মোট টেলিভিশন প্রোগ্রামের ৪০ শতাংশই আমদানী করে থাকে, সেখানে আমেরিকা আমদানী করে মাত্র ২ শতাংশেরও কম। এখন হলিউডে নির্মিত ফিল্ম এবং মুভি বিশ্বের আনাচে -কানাচে সর্বত্রই পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

স্যাটেলাইটের যাত্রার প্রথমদিকেই ১৯৯০ সালে আমেরিকা শুধু মুভি এক্সপোর্ট করেই ৩ বিলিয়ন ডলার কামাই করে, যা এখন ১০ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। মিডিয়ার কোন সীমারেখা নেই, নেই কোন বিধি-নিষেধ। এ সুযোগ গ্রহণ করে আমেরিকা শুরু করেছে New World Information Order (NWIO) বা নতুন বিশ্ব তথ্য নির্দেশিকা। যার একমাত্র লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং সাথে সাথে তৃতীয় বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদের নগ্ন ও উলংগ সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করা।

ইন্টারনেট বর্তমান বিশ্বকে আমাদের বেডরুমে এনে দিয়েছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ভয়ংকর ভাবে মুসলমানদের উপর। কেননা এ আগ্রাসনের বিপরীতে মুসলমানদের তেমন কোন প্রস্তুতি বা পদক্ষেপ কোনটাই নেই। সুতরাং স্বভাবতই ব্রডকাষ্টিং এর সিংহভাগই রয়েছে পশ্চিমাদের কব্জায়। এসবের বিপরীতে ১.৫ মিলিয়ন মুসলমানদের নিজস্ব কোন রেডিও সার্ভিস নেই, যা পুর্বোল্লেখিত সার্ভিসগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবে। এসবের জন্যই গোটা মুসলিম বিশ্বকে শুধুমাত্র পশ্চিমাদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

স্যাটেলাইট ও টেলিভিশনের আগ্রাসন

প্রিন্ট মিডিয়ার কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু স্যাটেলাইট ও টেলিভিশন প্রযুক্তির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এটা সর্বাধুনিক হাইটেক প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে অতি সহজেই সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতি ঘরে ঘরে পৌছে যেতে পারে। তাই আজ সর্বত্র এ মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ মিডিয়ার প্রভাব ও ব্যাপকতা কতটা ভয়ংকর তা আজ মুসলিম সমাজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এ ভংকর মিডিয়ার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও পশ্চিমাদের হাতের মুঠোয়। তারা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একচ্ছত্র মালিক। এ মাধ্যমেও তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ মিথ্যাচার ও বিকৃতি প্রচার করার প্রয়াস পাচ্ছে। পশ্চিমা জগতের অধিকাংশ মানুষ বস্তুবাদী এবং ধর্মবিদ্বেষী, নয়তো ধর্মের ব্যাপারে সীমাহীন উদাসীন। ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো তাদের কাছে গুরুত্বহীন বা বিরক্তিকর।

তাই মুসলিম দুনিয়ার খবরাখবর এসব পাশ্চাত্য মিডিয়াতে একেবারে অনুপস্থিত। বরং তাদের খবরে ইসলামকে বিকৃত করেই দেখানো হয়। মুসলিম বিশ্বের ঘটনাকে এই সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া এমনভাবে প্রচার করে থাকে, যাতে তাদের স্বার্থই শুধু রক্ষা হয়। তারা মুসলিম নেতৃত্বকে ইচ্ছামাফিক কুৎসিত হিসেবে তুলে ধরতে প্রয়াস পায়। দেখা যায়, এ মিডিয়ার আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের জনপ্রিয় নেতা ইয়াসির আরাফাত একজন সন্ত্রাসী হিসেবে প্রচার পান, আর স্বীকৃত খুনি শ্যারন একজন শান্তিবাদী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আলজেরিয়ার ইসলামী ব্যক্তিত্ব আব্বাস মাদানীকে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রচার করতেও মিডিয়া দ্বিধা করে না। এ সব মিডিয়ায় খোমেনী একজন পাগল ও উন্মাদ বলে প্রচার করছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সন্ত্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল। চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীরের ন্যায় পূর্ণ স্বাধিকার আন্দোলন তাদের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। মুসলমানরা স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট বা টেলিভিশন মিডিয়াতে উগ্র, পশ্চাদপদ, সেকেলে, প্রগতিবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল ও মূর্খ হিসেবে চিত্রিত।

আফগান মুজাহিদরা দেশ রক্ষার জন্য পবিত্র লড়াই করে মিডিয়াতে হয় সন্ত্রাসী আর আমেরিকানরা সে দেশকে দখল করতে এসে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে লাভ করে ত্রাণকর্তার খ্যাতি। ইরাক জোর করে দখল করে আমেরিকা বলে বেড়ায় তারা শান্তিবাদী, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের রক্ষক। আর ইরাকীরা বাঁচার জন্য লড়ছে বলে তারা হচ্ছে মৌলবাদী, উগ্র এবং শান্তি ও উন্নয়নের বিরোধী। ইরাকে আমেরিকা আক্রমণ করার আগে মিডিয়ার বদৌলতে বলে বেড়াল, ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে। অথচ আজ প্রমাণিত হয়েচে তা মিথ্যা। শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রাধান্যের কারণে পশ্চিমারা মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারছে এবং বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার কথাই বলি না কেন। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পরই আমেরিকার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলে দেয়া হলো এটা সন্ত্রাসী আল-কায়েদার কাজ এবং এর মূল হোতা ওসামা বিন লাদেন।

সারা দুনিয়ার মানুষেকে মিনিটেই বিভ্রান্ত করা হলো। অথচ আজও এর কোন সঠিক প্রমাণ পেশ করা যায়নি। মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ পশ্চিমাদের হাতে থাকায় তারা অহরহ মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে আরো বেশি ভয়কর ও চরিত্র বিনাশী করে তুলেছে ডিশ কালচার। এর কারণে পশ্চিমের উলংগ সংস্কৃতি ও নৈতিকতাবর্জিত কালচার মুসলিম বিশ্বে অতি সহজে ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে মুসলিম দেশগুলোর যুব সমাজ। তারা এ সংস্কৃতির কারণে হয়ে উঠছে বেপরোয়া, উগ্র, নেশাগ্রস্ত, উচ্ছৃংখল। তাদের এ অধঃপতন অবশেষে তাদেরকে ধর্মবিদ্বেষী করে তুলছে।

মোটকথা স্যাটেলাইট ও টেলিভিশন মুসলিম দেশগুলোর ধর্মপ্রাণ ও নৈতিক মানসম্পন্ন মানুষকে অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক পরিবেশ আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। বদলে যাচ্ছে আমাদের কালচার, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিমন্ডল। পশ্চিমাদের এ মিডিয়া আগ্রাসন দেশগুলোর পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মিডিয়া জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অবদান রাখা এবং ইসলামী বিধানের আলোকে মিডিয়া প্রোগ্রামকে ঢেলে সাজানো।

চলচ্চিত্রের আগ্রাসন

এটিও বিনোদন এবং প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যমে। কম বা অশিক্ষিত মানুষের জন্য চলচ্চিত্রের চাইতে আর কার্যকরী কোন গণমাধ্যম নেই। না পড়ে শেখার জন্য চলচ্চিত্র একটি উত্তম মিডিয়া। চলচ্চিত্র সহজেই মানুষকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত এবং উদ্দীপ্ত করতে পারে। দুঃখজনক হলো, এ অধিক কার্যকরী মিডিয়াতেও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ পশ্চিমা বিশ্বের। পশ্চিমাদের মধ্যে যেহেতু নীতি নৈতিকতার কোন বালাই নেই তাই যে কোন অশ্লীলতা ও বেলাল্লাপনা তারা চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করতে পারে। আর এ কাজটিই তারা করছে চলচ্চিত্রে। এরই কুপ্রভাব গিয়ে পড়ছে মুসলিম দেশগুলোর উপর। মুসলমানদের ঘরে এখন এসব চলচ্চিত্রের প্রদর্শন চলছে। তার কারণ এসব চলচ্চিত্রের মত কারিগরীভাবে সমৃদ্ধ ও মানগত উন্নত ছায়াছবি মুসলমানদের কাছে নেই।

পশ্চিমা দেশের চলচ্চিত্রগুলোতে অবাধ মেলামেশা, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, সামাজিক নিয়মের বাইরের যথেচ্ছ আচার আচরণ, মারপিট-হাংগামা, অস্ত্রের অবাধ ব্যবহার, অলীক ও কাল্পনিক গাঁজাখুরি গল্প, ধর্মবিরোধী বিষয়াদি তুলে আনা হয় উলংগভাবে। শৈল্পিক আবহে এসব বিষয় এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যা তরুণ সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমারা ইসলামের অনেক বিষয়কে বিকৃতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পায় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ইসলামের ঐতিহাসিক বীরদের চলচ্চিত্রে তারা সন্ত্রাসীরূপে দেখাতে কার্পণ্য করে না। পশ্চিমা মানসিকতা ও অনৈতিকতা সম্পন্ন আমাদের দেশের পরিচালকদের ছবিতেও আমরা এরূপ ইসলামবিরোধী তৎপরতা লক্ষ্য করি। দেখা যায় গ্রাম বা শহরের যারা খারাপ লোক, বদমায়েশ ও দুশ্চরিত্র তাদেরকে সাজানো হয় মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি পরিয়ে। তারা বুঝাতে চায়, ইসলামের নামেই মানুষ কেবল খারাপ কাজ করে বা ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোই সব খারাপ। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের যে বিকৃতি দেখানো হয় তাতে কোন মানুষের পক্ষে সুস্থ কল্পনা করা কিংবা স্বাভাবিক জীবনের চিন্তা করাও অসম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান তথাকথিত চলচ্চিত্র তাই মুসলিম দুনিয়ার মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের জন্য এক বড় বাধাস্বরূপ। পশ্চিমারা আমাদের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে প্রকারান্তরে ইসলামের বিনাশে যে ভূমিকা নিয়েছে সে আগ্রাসন ঠেকানো এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম বিশ্বের কোথাও সুস্থ বিনোদনের পক্ষে কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে আমাদের সমাজ ও ধর্ম এখন ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে ইরান কিছুটা এগিয়ে আসলেও পশ্চিমা জগতের ভয়ংকর জোয়ারের কাছে তা খড়কুটোর মত। ইরান প্রমাণ করেছে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকেও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায়। তারা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ছবি বানিয়েও প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইরানের ছবি ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবে সবার প্রশংসা পেয়েছে। অথচ অন্যান্য মুসলিম দেশ এ ক্ষেত্রে একেবারে নীরব রয়েছে। ফলে পশ্চিমা দেশের আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ইসলামী দেশগুলোকে তাই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। সম্মিলিতভাবে রুখতে হবে চলচ্চিত্র আগ্রাসনকে। তা না হলে আমাদের সমাজ ও আদর্শ-ঐতিহ্যের ভাংগন ও বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

ইন্টারনেটের আগ্রাসন

বর্তমানে সময়ে ইন্টারনেটও একটি বড় মিডিয়া হিসেবে পরিগণিত। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম বাহন এটি। এর ব্যবহার বহুমুখী। চিঠিপত্র আদান-প্রদান, পত্রিকা প্রকাশ, যে কোন তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে অনেক কাজ ইন্টারনেটে সম্পন্ন হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে মানুষ এটির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আজকাল বড় বড় প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ওয়েবসাইট খুলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনকে ত্বরিত গতিতে সম্পন্ন করতে পারছে। ইন্টারনেটও এমন একটি মাধ্যম যাকে ভাল খারাপ দু'ভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর খারাপ দিকটি সুস্থ্য সমাজ ও নির্মল মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। পশ্চিমারা এই মাধ্যমকেও ইসলামের পরিশুদ্ধ মনন এবং মুসলমানদের সুন্দর জীবনকে বিকৃতির পথে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহার করছে। অগণিত ওয়েবসাইট রয়েছে যার মাধ্যমে তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

এই ইন্টারনেটও ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসা রটানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মাধ্যমটির বিপরীতে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোন ওয়েবসাইট নেই। মুসলমানদের যাও হাতে গোনা দু'চারটি ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলো তথ্যসমৃদ্ধ না হবার কারণে এর কোন আকর্ষণ নেই। এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হলে আমাদের ভাবতে হবে। ইন্টানেটের আগ্রাসন মুকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া এখনই প্রয়োজন। মুসলমানরা যাতে ইসলামী ওয়েবসাইট থেকে উপকৃত হতে পারে সে ধরনের ব্যবস্থা নেয়া এখন জরুরী। মুসলমানদের মধ্যে ইন্টারনেট ও ই-মেইল প্রযুক্তিতে দক্ষ গভীর জ্ঞানসম্পন্ন লোক তৈরি হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মিডিয়া এখন দুনিয়ার নিয়ন্ত্রক শক্তির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি মিডিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে পশ্চিমা জগত মুসলমানদের উপর একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মিডিয়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে পশ্চিমারা আমাদের নানাভাবে বিভ্রান্ত বিস্তার করে চলছে। আমাদের অর্জনকে চাপিয়ে রেখে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করছে। ফলে মুসলমানদের সুকুমারবৃত্তিগুলো, তাদের সৌন্দর্য এবং ইসলামের কালজয়ী আদর্শ বিকৃতরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও, ইন্টারনেট, প্রভৃতিকে অনৈসলামিক শক্তির হাতে তুলে দিয়ে মুসলমানদের নীরব থাকলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে আমাদের সকল কিছুই বিস্মৃতির অতল গহবরে হারিয়ে যাবে। আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিলীন হয়ে যাবে। আমরা হয়ে পড়বো পঙ্গু, অপাংক্তেয়। গাঢ় অন্ধকার আমাদেরকে গ্রাস করবে। মিডিয়া যুদ্ধে হেরে গেলে আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও সফল হতে পারবো না। আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমান মিডিয়াই হলো বিজয়ের প্রধান সোপান।

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র মিডিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হলে আমাদের আগামী প্রজন্ম মান-মর্যাদা ও তাদের দ্বীন-ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হবো। অতএব মিডিয়ার ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। গোটা মুসলিম মিল্লাতকে প্রয়োজনে এর জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। **আল্লাহ আমাদের সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।**

তথ্যপঞ্জি

১. জহুরী, তথ্য সন্ত্রাস, পৃষ্ঠা- ২
২. জহুরী, তথ্য সন্ত্রাস, পৃষ্ঠা- ২
৩. জহুরী, তথ্য সন্ত্রাস, পৃষ্ঠা- ৯
৪. পৃথিবী, মার্চ ২০০৪
৫. পৃথিবী, মার্চ ২০০৪
৬. পৃথিবী, মার্চ ২০০৪
৭. Suhaib J. al Barzinji, Working Principles for an Alternative Islamic Model in Mass Media Communication, উদ্ধৃত, পৃথিবী,মার্চ ২০০৪।
৮. পৃথিবী মে ২০০৪
৯. পৃথিবী মে ২০০৪
১০. পৃথিবী মে ২০০৪
১১. পৃথিবী মে ২০০৪
১২. পৃথিবী মে ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৯

সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দরুন আল্লাহ্ কর্তৃক ধ্বংস ও সাজা প্রাপ্ত কয়েকটি জাতি

পৃথিবীতে যে সকল ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটে তাতে পৃথিবীর কোন না কোন অংশের মানুষ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে তা ধর্মীয় মুল্যবোধের আলোকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এসব ধ্বংসাত্মক ঘটনা রোধকল্পে মানুষ যা করছে বা করতে পারছে তা একান্তই অপ্রতুল এবং নগণ্য। এ সকল অনিবার্য বিপর্যয় সংঘটিত হবার পিছনে মুলত মানুষের কর্মকান্ডই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু মানুষ তার প্রজ্ঞা, পান্ডিত্য আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও সকল বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে না। অর্জন করতে পারেনি এমন কোন কৌশল যা মানুষকে নিরাপত্তা এবং রক্ষা করতে পারে এ সকল বিপর্যয় থেকে।

অতীতে যেসব জাতি ধ্বংস ও সাজা প্রাপ্ত হয়েছে তার মূল কারণ হল, আল্লাহপাক যখন তাদেরকে প্রভূত সম্পদ ও ক্ষমতা দান করেন, তখন তারা ভোগ-বিলাস ও ক্ষমতায় মত্ত হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা শুরু করে। তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, ওসব জাতির সৎ লোকরা তাদেরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তখনই আল্লাহপাক ঐ জাতিগুলোকে সাজা অথবা ধ্বংস করে দেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপথগামী জনপদ বা জাতিকে শাস্তি দিয়ে হিদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনা এবং জীবিতদের এ সকল বিপর্যয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শিরকমুক্ত একটি তৌহিদী সমাজ গঠন করে সুন্দর ভবে জীবন যাপন করা।

আল্লাহপাক বলেন, "আর তোমার রব এমন নয় যে, তিনি জনবসতিসমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, অথচ সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল।" [১]

বিভিন্ন ধরণের আপতিত শাস্তি

পাক কুরআনে মহান আল্লাহ নাফরমান, অকৃতজ্ঞ আল্লাহদ্রোহী কওম বা জনগোষ্ঠীর প্রতি যুগে যুগে হিদায়েত এবং সত্যের পথ অনুসরণ করার জন্য যে সকল শাস্তি দিয়েছেন সেগুলো বিভিন্ন রকমের। এ শাস্তি বিশেষ বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে আপতিত হয়ে থাকে। কুরআনে যে সকল শাস্তির কথা রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

পবিত্র কুরআনের সুরা আয যারিয়াত ও সুরা আশ্ শোআরা'র বর্ণনা মতে, নুহ (আঃ) এর কওমের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, ঝড় তুফান, পাহাড় পর্বত প্লাবিত করার মত ধ্বংসকারী এক ভয়াবহ বন্যা ।

পবিত্র কুরআনের সুরা নাযম, আয যারিয়াত, আহকাফ ও সুরা মমিন এর বর্ণনা মতে, আল্লাহ দ্রোহী আদ জাতির জনপদের উপর আপতিত হয়েছিল পাথরের ঝড়, অনাবৃষ্টি, এবং দুর্ভিক্ষ।

পবিত্র কুরআনের সুরা আশ্ শোআরা'র বর্ণনা মতে, অহংকারী এবং গর্বিত আল্লাহদ্রোহী সামুদ জাতির জনগোষ্ঠীর উপর আপতিত হয়েছিল প্রবল বায়ু, ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে কানফাটা বজ্রপাতের নিনাদ আর বিদ্যুতের ঝলকানি এবং সংঘটিত হয়েছিল ভূমিকম্প, কংকর বর্ষিত হয়েছিল প্রবল বায়ুর সঙ্গে।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের সুরা আয যারিয়াত সুরা যুখরুফ, কাসাস, ত্বাহা ও সুরা আরাফের বর্ণনা মতে, অহংকারী আল্লাহদ্রোহী ফেরাউনের কওম ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন হয়েছিল লোহিত সাগরের চতুর্দিক থেকে প্রবল বেগে ছুটে আসা পানির চাপে। নাফরমান ফেরাউনের কাহিনী আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বেশি করে বর্ণনা করেছেন। ফেরাউনের ধ্বংসের ইতিবৃত্ত।

পবিত্র কুরআনের সুরা কাসাস ও সুরা নূরের বর্ণনা মতে, অর্থ সম্পদ আর বৈভবের অহংকারী কারূন ধ্বংস হয়েছিল প্রচন্ড ভূমিকম্পের ধ্বংস্তুপের মধ্যে পরে।

পবিত্র কুরআনের সুরা দুখান ও সুরা সাবা'র বর্ণনা মতে, সম্পদশালী সাবা জাতির নাফরমান অকৃতজ্ঞ এবং আল্লাহদ্রোহী জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়েছিল বাঁধভাঙ্গা প্রবল বেগে ছুটে আসা পানির চাপে। ধ্বংস হয়েছিল তাদের উর্বর কৃষিখামার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি।

নবী-রাসুল হত্যাকারী নাফরমান এবং অকৃতজ্ঞ বনী ইসরাঈলের প্রতি যালিম শাসক পাঠিয়ে যুগে যুগে তাদেকে নিপীড়ন আর নির্যাতনের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন। লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের বিকৃত যৌনাচার ও বেপরোয়া সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতি ফেরেস্তা পাঠিয়ে সমগ্র লোকালয়ই উল্টে দিয়ে ভূমিকম্পের মাধ্যেমে তাদেরকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিলেন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তাআলা। এছাড়াও কুরআনে আরো কতক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কুম্মাল গোত্রভূক্ত পতঙ্গ, মাছি, উকুন, সুড়সুড়ি, পঙ্গপাল, ব্যাঙ প্রভৃতি। এ সকল শাস্তি বিশেষ করে আল্লাহদ্রোহী ফেরাউনের অনুচরদের উপর আপতিত হয়েছিল। এসকল শাস্তির ইতিবৃত্ত মহান আল্লাহ কুরআনের অনেক জায়গায়ই উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের কৃতকর্মের উল্লেখ করে কুরআন কারীমে ঘোষণা করেছেন, "মানুষের কৃতকর্মের জন্য স্থলে, সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা সৎপথে ফিরে আসে" [২]

যে সকল শাস্তি বিভিন্ন মানব জাতির উপর আপতিত হয়েছে তা পৃথকভাবে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

শাস্তির কবলে নুহ (আঃ) জাতি

'নূহ' আরবী শব্দ। কেউ বলেন ইবরানী (হিব্রু শব্দ)। নূহ (আঃ) আদম (আঃ) এর পর প্রথম শরীয়তের প্রবর্তক রাসুল। অনেকে মনে করেন, নূহ (আঃ) ইদ্রিস (আঃ)-এর পৌত্র লমকের পুত্র। আবার কেউ বলেন, বেশি বেশি ক্রন্দনের জন্য তার নাম হয়েছে নূহ। কারণ হিব্রু ভাষায় নূহ অর্থ ক্রন্দনকারী। নূহ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং তাঁর বয়স ছিল ৯৫০ বছর। তিনি মুজিযা হিসেবেই এই দীর্ঘ হায়াত লাভ করেন। তিনি ৯১০ বছর যাবৎ তাঁর জাতিকে হিদায়াত করার ব্যাপারে চেষ্টার একটুও ত্রুটি করেননি।

পবিত্র কুরআনে ৪৫ জায়গায়, ২৮ টি সুরায় নূহ (আঃ) এর প্রসঙ্গ এসেছে। কোথাও সংক্ষিপ্তকারে কোথাও বিস্তারিতভাবে। আমাদের আলোচনায় সব সূরার বর্ণনা উল্লেখ করা হয়নি। আমরা শুধু গ্রন্থের বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সুরাগুলোর বর্ণনাই আলোচনায় আনব। কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্যে হযরত নূহ (আঃ)-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পাঁচজন মহা সম্মানিত নবীর অন্তর্ভূক্ত যাদের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নূহ (আঃ) এর পৃথিবীতে আবির্ভাবকাল নিয়ে মুফাস্‌সির, গবেষক, আলিম এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। একদলের মতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের তিন হাজার তিনশ বছর পর দুনিয়ায় আগমন করেছেন। নূহ (আঃ) এর ছয়'শ বছর বয়সকালে প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। নূহ (আঃ) নয়শ পঞ্চাশ বছর জীবত ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, নূহ (আঃ) মোট আশি বছর কেউ মনে করেন তিনশ বছর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করেছিলেন। একজন ঐতিহাসিক গবেষকের মতে সতের হাজার বছর পুর্বে নূহ (আঃ)-এর প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল।

আবার অনেক ইসলামী গবেষক পন্ডিত মনে করেন যে, নূহ (আঃ) খ্রিষ্টপুর্ব তিন হাজার আটশ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার আটশ পঞ্চাশ সালের মধ্যে জন্মগহণ করেন। ঐতিহাসিক স্বাক্ষ্য, প্রমাণ, নিদর্শন এবং সাম্প্রতিক কালে যুদি পর্বতের শৃংগ থেকে আবিস্কৃত নূহ (আঃ) -এর জাহাজের কাষ্ঠ খন্ড প্রভৃতির তথ্য থেকে গবেষক পন্ডিতগণ মনে করেন, আজ থেকে পাঁচ বা সাত হাজার বছরের মধ্যে নূহ (আঃ) এর সময়কাল ছিল। অতি সাম্প্রতিককালে রবার্ট ডি ব্যালার্ডের নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী কৃষ্ণ সাগরের সাত হাজার ফুট গভীর তলদেশের তিনশত ফুট নিচে সাড়ে সাত হাজার বছর আগে মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাহাজের ধ্বংসসাবশেষ আবিস্কার করেছেন বলে দাবি করেছেন।

নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায় তাওহীদ, রিসালত এবং জীবনদর্শন থেকে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং বিপথগামী। বিভিন্ন উপাস্যের ইবাদত এবং মূর্তি পূজাই ছিল তাদের প্রধান ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য। তাদের উপাস্যের মধ্যে আদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াসুক এবং নাহর নাম্নী পাঁচটি খোদা ছিল। এক এক গোত্র এবং উপগোত্রের জন্য এক এক দেবতা নির্দিষ্ট ছিল। মুক্তির প্রত্যাশায় তারা এগুলোর পূজা করতো। সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু ও সমাজপতিগণ জনসাধারণকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বোধের উপর দৃড়ভাবে স্থির থাকার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ অনুশীলন করাতো। কুরআনে তাদেরকে ফাসিক বলা হয়েছে। তারা ছিল ঘোরতর আল্লাহদ্রোহী।

মহান আল্লাহ চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বিপথগামী এ সম্প্রদায়ের হিদায়েত এবং সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরই মধ্য হতে রাসুল হিসেবে নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে মহা সত্যের প্রতি আহবান জানান। তাদেরকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বারবার তাগিদ দিতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী কওমের লোকেরা তার আহবানে সাড়া দেয়নি বরং ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। সমাজের গুরু বা পুরোহিত শ্রেণী এবং সামাজের নেতৃস্থানীয় সামজপতিগণ তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন পন্থায় তাঁকে অপমানিত করার নীতি গ্রহণ করে।

নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের লোকদের হিদায়েত করে সঠিক এবং তাওহীদের পথে আনতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ ছয়শ বছর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় মাত্র ক'জন গরীব নিঃস্ব লোককে সঠিক পথে আনতে সক্ষম হন। এ সংখ্যা ১০ থেকে ৭০ জনের বেশি হবে না। মক্কার কুরায়েশদের মত এ কওমের মধ্যেও আভিজাত্যের বড়াই চরম আকার ধারণ করেছিল। সাধারণ লোকের বৈঠকে পুরোহিত শ্রেণী যোগদান করতে অনীহা প্রকাশ করত।

মুলতঃ সন্ত্রাসের মাধ্যমেই তাদের সামাজিক জীবন যাত্রা পরিচালিত হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তার জাতির দ্বারা প্রহারের চোটে নূহ (আঃ) অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। কখনও কখনও তাঁর গলা টিপে ধরা হতো। তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। তবুও তিনি জাতির কল্যাণের জন্য এভাবে দোয়া করতেন, হে রব! এদের ক্ষমা কর। কারণ, এরা বুঝতে অক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এক পুরুষের ঈমান না আনার কারণে নিরাশ হয়ে দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। এভাবে কয়েক পুরুষ আশা করতেন। কিন্তু তারা নাফরমানই প্রমাণিত হল।

অবশেষে তিনি দুঃখ করে বলেন, "হে রব! আমি ওদেরকে হিদায়াতের পথে আনার জন্য দিন-রাত, এককভাবে, কয়েকজন মিলে প্রকাশ্য ও গোপনে চেষ্টা করেছি। ওদেরকে কখনও জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখিয়েছি। কখনও জান্নাতের নিয়ামতের লোভ দেখিয়েছি। কখনও তোমার কুদরতের কথা স্মরণ করে দিয়েছি। ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হলে, ওরা এ দুনিয়াতেও শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে, এ কথাও বলেছি। কিন্তু তিনি তাদেরকে হিদায়েতের পথে আনতে ব্যর্থ হয়ে পুনরায় আল্লাহকে বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কওমকে দিনরাত্রি আহবান করেছি। কিন্তু আমার আহবানে তাদের শুধু পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি যখনই তাদেরকে আহবান করি যাতে তুমি ওদের ক্ষমা কর, তখনই ওরা ওদের কানে আঙ্গুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করে, জিদ করে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। এরপর তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি এবং সোচ্চার হয়েছি এবং গোপনে উপদেশ দিয়েছি।" [৩]

ফলশ্রুতিতে নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায় উল্টো তাকে পাগল আখ্যায়িত করে। শুধু তাই নয়, তাকে পথভ্রষ্ট বলতে শুরু করে। পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার হুমকি দেয় এবং তাঁর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করে। অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে বলেন, "আমি আর পারছি না, আমাকে সাহায্য কর।" [৪]

আরো বলেন, "হে আমার রব! দুনিয়ার একজন কাফিরকেও তুমি বসবাসের জন্য ছেড়ে দিও না। তাদের যদি ছেড়ে দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে এবং তাদের বংশ থেকে যারাই পয়দা হবে, তারাই দুস্কৃতকারী ও কাফির হবে। [৫]

তখন আল্লাহপাক জবাব দেন, হে নূহ! তোমার জাতির মধ্যে যারা ঈমান আনার তারা ঈমান এনেছে। আর কেউ ঈমান আনার নেই। অতএব তাদের পরিণামের জন্য দুঃখ করা ছেড়ে দাও। [৬]

এরপর নূহ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে সব ধরনের প্রাণীর এক এক জোড়া, পরিবারের সদস্যদের এবং যারা ঈমান এনেছেন তাদেরকে তার নৌকায় তুলে নেন।

আল্লাহপাক বলেন তারপর আমি আসমানের দরজা খুলে দিলাম, যার ফলে অবিরাম বর্ষণ হতে থাকল। আর ভূমি হতে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ।[৭]

অবশেষে আল্লাহর হুকুম হল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল এবং হে আকাশ! থেমে যাও। সেই মত পানি থেমে গেল, কাজ শেষ হয়ে গেল এবং নৌকা জুদি পর্বত-এর উপর থেমে গেল।

জানা যায়, জুদী ও আরারাত একই পবর্তমালার দু'টি অংশ। বিভিন্ন তথ্য থেকে মনে করা হয় যে, গোটা মানবগোষ্ঠী কোন এক সময় হয়তো একটি ভূখন্ডেই বসবাস করত। ঐ মহাপ্লাবনের পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্ণিত আছে যে, নূহ (আঃ) ১০ রজব তাঁর নৌকায় ওঠেন এবং ১০ মহররম নৌকাটি জুদীতে ভিড়ে। এই ছয়মাস যাবৎ নৌকাটি তুফান ও প্লাবনের মধ্যে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নৌকাতে মোট ৮০ জন মুমিন ব্যক্তি ছিলেন। তার মধ্যে নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্র, হাম, সাম ও ইয়াফেস এবং তাঁদের তিন স্ত্রীও ছিলেন। চতুর্থ পুত্র কেনান ও তার মা কাফিরদের সাথে থেকে প্লাবনে ডুবে মারা যায়।

আল্লাহ অংহকারী এবং সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ যখন কোন আল্লাহদ্রোহী সম্প্রদায়কে ধরেন, তখন অত্যান্ত শক্ত হাতে ধরেন, আল্লাহর শাস্তি থেকে তখন কেউ রক্ষা পায় না। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৎ এবং হেদায়েতের পথে আসার জন্য এক নির্দিষ্ট কাল সময় দিয়ে থাকেন। এ নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হলে অত্যাসন্ন শাস্তিকে কেউ বিলম্বিত করতে পারে না।

শাস্তির কবলে আদ জাতি

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে সুরা আরাফ, হুদ, মু'মিনুন, আশ্‌শোআরা, আস-সিজদা, আহকাফ আয যারিয়াত, কাওসার, আল হাক্কাহ, হাজর, আনকাবুত এবং সুরা নাযম-এ আদ জাতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। আদ জাতির উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক তথ্য মূলত কুরআনভিত্তিক। ঐতিহাসিক গবেষক পন্ডিতগণের গবেষণালব্দ জ্ঞান, প্রাপ্ত শিলালিপি এবং পবিত্র কুরাআনে ঐতিহাসিক আদ জাতির বর্ণনাকে আরো নির্ভরশীল এবং সহজবোধ্য করেছে। পবিত্র কুরআনের হুদ (আঃ) এর বিষয়ে সুরা আরাফ-৬৫, হুদ ৫০-৫৩, ৫৮, ৬০ ও ৮৯ আশ্‌শোআরা ১২৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

'হিব্রু' ভাষায় 'আদ' শব্দের অর্থ উচ্চ বিখ্যাত। এ জাতি সে সময়ে বিশালকার অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। বিশাল পাহাড় কেটে শৈল্পিক কর্ম করেছিল। আদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে তাদের ঘর তৈরি করে তাতে বসবাস করত। আদ জাতি আরব বংশোদ্ভুত ছিল। আরবের প্রাচীন গোত্র সামের (নূহ আঃ এর পুত্র) সাথে সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী এবং পরাক্রমশালী গোষ্ঠীর নাম হলো আদ। আরবের আদিম অধিবাসীগণ সংখ্যায় বিশাল আকারের ছিল এবং শক্তি ও দেহের আকৃতিতে তারা ছিল অতুলনীয়। তারা আরব থেকে বের হয়ে মিসরে, বাবেল ও সিরিয়ায় এক বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আল্লাহপাক আদ জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "স্মরণ কর, নূহ জাতির পর তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে খলীফা অর্থাৎ প্রতিনিধি করেছেন।" [৮]

নূহ (আঃ)-এর এক পুত্র সাম-এর বংশধরদের এক ব্যক্তির নাম ছিল 'আদ'। তাদের দাদার নাম 'ইরাম'। আদ ও ছামুদ উভয়ে ইরামের দু'শাখা। পরে তাদের বংশধরেরা আদ সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল।

আম্মান থেকে হাজরামাওত অর্থাৎ জর্দান থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। এদের কেন্দ্রীয় আবাসস্থল ছিল দক্ষিণ আরবের 'আহক্বাফ' নামক এলাকাটি।

আদ জাতি অজ্ঞ ও মূর্খ ছিল না। তারা ছিল তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ, সুসভ্য ও প্রগতিশীল লোক। দুনিয়ার কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যাপারে তারা পরিপক্ব জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত। তারা বোকা ছিল না । আর এমতাবস্থায় শয়তান তাদেরকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বরং তারা ঠান্ডা মাথায় ও ভেবেচিন্তে শয়তানের পথে চলত। কারণ ওপথেই তারা দুনিয়াবি নগদ লাভ ও ভোগের সন্ধান দেখতে পেয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ পাক বলেন, "আদ ও ছামূদ জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি। তারা যেখানে বাস করত, সেসব জায়গা তোমরা দেখেছ। তাদের কার্যাবলীকে শয়তান তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর বানিয়ে দিল এবং তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করল। অথচ, তারা ছিল বিচক্ষণ।" [৯]

তারা সুঠামদেহী, বিরাট বপূবিশিষ্ট ও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ পাক আদ জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, "আর আমি তোমাদেরকে শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ করেছিলাম। তোমরা আল্লাহর নেয়ামত সমূহ স্মরণ কর যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।" [১০]

তারা অতি উচ্চ দালান কোঠা তৈরী করার জন্য প্রভূত সম্পদ, শক্তি ও কৌশলের অধিকারী ছিল। আল্লাহপাক তাঁর নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে জানিয়ে দেন যে, আদ জাতিকে প্রচুর নিয়ামতের অধিকারী করে দেয়া সত্ত্বেও তারা দিনের পর দিন নাফরমানি করতেই থাকে। অবশেষে তিনি ঐ নাফরমান জাতিটিকে ধ্বংস করে দেন।

আল্লাহ পাক বলেন, "হে নবী (সাঃ)! তুমি কি দেখনি তোমার রব কি রকম ব্যবহার করেছিলেন, আদ-ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে, যাদের দেহ স্তম্ভের মত ছিল। আমি তাদের সমকক্ষ কোন জাতিকে দুনিয়ার কোন শহরে সৃষ্টি করিনি।" [১১]

অথচ, তাদের ঐসব বস্তুগত উন্নতি ও শারীরিক শক্তি তাদেরকে অহঙ্কারী করে তুলেছিল।

ঐ নিয়ামতগুলো পেয়ে, তারা যদি আল্লাহপাকের অনুগত বান্দা হতো এবং তার বিধি বিধান মোতাবেক চলত, তাহলে তিনি এই দুনিয়াতেই তাদেরকে আরও নিয়ামত দান করতেন।

আল্লাহ পাক বলেন, "তিনি আল্লাহ তোমাদের জন্য সম্পদ পাওয়ার ব্যাপারে আসমানের মুখ খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন।" [১২]

এ জাতিটি ছিল মূর্তিপূজক। হূদ (আঃ) বললেন, "হে আমার স্বজাতির লোকেরা, আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহা ইবাদত বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য মালিক নেই। নিশ্চয় তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে থাক।" [১৩]

এ জাতিটি ছিল একটি যালিম জাতি। তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা শাসন ব্যবস্থা কয়েকজন বড় যালিম একনায়কের হাতে ছিল। তাদের সামনে কেউ টু শব্দটিও করতে পারত না। আল্লাহপাক এ জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন, "আর তারা জাতির সাধারণ লোকেরা এমন লোকদের কথা মত চলত, যাদের প্রত্যেকে ছিল ভীষণ যালিম" [১৪]

এ জাতিটি ছিল স্বেচ্ছাচারী। আল্লাহ পাক আদ জাতির নেতাদের সম্বন্ধে বলেন, "তোমরা কি প্রত্যেকটি উঁচু স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছ, যা কেবল অনর্থক করছ। আর তোমরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আর যখন তোমরা কাউকে আঘাত কর, তখন তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত আঘাত কর।" [১৫]

হূদ (আঃ) তাঁর জাতির বড় বড় প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণের যে সমালোচনা করতেন, তার উদ্দেশ্য ছিল না যে, তিনি এগুলোকে আপত্তিকর মনে করতেন। বরং তিনি সামগ্রিকভাবে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকৃতির সমালোচনা করতেন। তারা একদিকে অপ্রয়োজনে সুউচ্চ ও নয়নাভিরাম ইমারত

Dhaka University Institutional Repository

এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করত। আর ওসব করত তাদের শক্তি ও সম্পদের প্রদর্শনীর জন্য। অপরদিকে তাদের মনুষ্যত্বের মানদন্ড এত নীচে নেমে গিয়েছিল যে, দুর্বলদের প্রতি তাদের অন্তরে একটুও দয়ামায়া ছিল না। আল্লাহর বিধান না মানার কারণে গরীব ও অসহায়দের প্রতি ইনসাফ ছিল না। আর আশপাশের দুর্বল জাতিগুলো এবং নিজ দেশের গরীব লোকেরা যুলুম নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল।

হূদ (আঃ) চারটি বিষয়ে তাদের তাকিদ করেনঃ-

১. মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বলেন।
২. দুর্বলদের উপর যুলুম বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করতে নিষেধ করেন।
৩. নিজেদের শক্তি ও সম্পদের বড়াই করতে নিষেধ করেন।
৪. আল্লাহর বিধি মোতাবেক জীবনের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে বলেন।

কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি।

আদ জাতিতে মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ছিল। আদ জাতির সীমাহীন অবাধ্যতা, আল্লাহর নবীর প্রতি চরম অবজ্ঞা ও শত্রুতার পরিণাম সেই চরম শাস্তির দিন ঘনিয়ে এলো। "আদের লোকেরা বলল, হে হূদ! তুমি সেই আযাব নিয়ে এসো যে আযাবের ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছো। যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে নিয়ে এসো সেই আযাব।" [১৬]

হূদ (আঃ) বুঝলেন সকল দরজা এই জাতি স্বহস্তে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন এরা আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ প্রথমে তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল করলেন। একবারে গযব না দিয়ে, তাদেরকে ধ্বংস না করে তাদেরকে অবকাশ দিলেন। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আদ জাতি ভীষণ ভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। হূদ (আঃ) তাদেরকে এ সুযোগ গ্রহণ করে সত্যের পথে ফিরে আসার আহবান জানালেন। আদ জাতির লোকেরা নবীর কথায় কান দিল না। তারা আরো প্রবল ভাবে নবীর বিরোধিতা করতে লাগল। আল্লাহ পাক এমন আসমানী গযব অবতীর্ণ করলেন যে, আদ জাতি ইতিহাসের কল্প কাহিনীতে পরিণত হলো।

প্রচন্ড ঝড় শুরু হলো। সে ঝড় সাত রাত আট দিন যাবৎ অব্যাহত ছিল। প্রথম দিনের ঝড়ে আদ জাতির লোকেরা নিজেদের বাড়িঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঝড়ের বেগ আরো বৃদ্ধি হতে লাগল। প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডব লীলায় বিশাল আকৃতির মানুষগুলো পত্র পল্লবের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্প্রাণ অসাড় হয়ে পড়েছিল। অহংকারী আল্লাহদ্রোহী আদ জাতির লোকেরা আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে মৃত পশুর মতই পড়েছিল। তাদের গোটা জনপদের অবস্থা এমন আকার ধারণ করেছিল যে, মাত্র ঘন্টা কয়েক পূর্বেই যে এখানে কোন জনপদ ছিল, কোলাহল পূর্ণ মানব বসতি ছিল, তার আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। গোটা নগরী এমনভাবে ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল যে, মানুষ বসবাসের কোন চিহ্ন ছিল না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, "আর আদ জাতিকে এক কঠিন ঘূর্ণিঝড় দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। যা তিনি (আল্লাহ) সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামহীনভাবে তাদের উপর চাপিয়ে রাখেন। হে নবী (সঃ)! তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে দেখতে পেতে, তারা ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে যেন খেজুর গাছের পুরানো কান্ড।" [১৭]

কুরআনের ভাষায়," শাস্তির প্রচন্ডতা নিদর্শন রয়েছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বিধ্বংসী বায়ু, এটা যা কিছুর উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল।" [১৮]

Dhaka University Institutional Repository

আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সর্তকাবণী। ওদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম এক ঝাঙা বায়ু। এক চরম দুর্ভাগ্য দিন মানুষেকে তা উৎখাত করেছিল উন্মুলিত খেজুর কান্ডের ন্যায়। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি, সর্তকবাণী" [১৯]

"আদ জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝান্ডা বায়ুতে যা তিনি ওদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত আট দিন বিরামহীন ভাবে। তুমি তখন উপস্থিত থাকলে দেখতে ওরা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশুন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কান্ডের ন্যায়। ওদের কারো অস্তিত্ব তুমি দেখতে পাও কি। [২০]

"তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কি বলেছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি"। [২১]

ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গাটির অবস্থান

ইয়ামেন, ওমান ও হেজামের কিছু অংশ নিয়ে একটি এলাকা জুড়ে আদ জাতির অধিকাংশ লোক বাস করত। ইয়ামেনের দক্ষিণপ্রান্তে মুকাল্লা শহর। এই মুকাল্লা শহর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তরে হাজরামাওত জায়গাটি অবস্থিত। কোরআন মাজীদে আদ জাতির আবাসস্থলকে 'আহক্বাফ' বলা হয়েছে। এ জাতির কেন্দ্রস্থল ছিল আহক্বাফ কিন্তু এরা আশপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে দুর্বল জাতিগুলোকে গ্রাস করে ফেলেছিল। আল্লাহ পাক আদ জাতিকে তাদের নাফরমানির জন্য এই আহক্বাফ নামক জায়গাটি ধ্বংস করে দেন।

হাজরামাওত থেকে ঐ ধ্বংস ও সাজাপ্রাপ্ত জাতির ভয়াবহ আবাসস্থলটি দেখা যায়। বর্তমানে ওটা একটি নীচু ও বিরাট মরুপ্রান্তর, যেন একটি বালির সমুদ্র। ওখানে যেতে কেউ সাহস করে না। আরবের বেদুঈনরা পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে যেতে ভীষণ ভয় পায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, দূর থেকে কোন বালতি বা এরকম কিছু ঐ বালির উপর নিক্ষেপ করলে, কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটা আর সেখানে থাকে না। মনে হয় যেন সেখানকার বালি ঐ বস্তুটিকে গিলে ফেলেছে।

বর্ণিত আছে যে, আদ জাতির উপর আযাব আসার সময় কালে হূদ (আঃ) ও তার সঙ্গীরা একটি কুঁড়ের ঘরে আশ্রয় নেন। তাদের এবং ঐ ঘরটির কিছুই ক্ষতি হয়নি। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হূদ (আঃ) হাজরামাওতে ইন্তেকাল করেন।

এই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে যখন কোন সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায় তখন তারা কোন সাহায্য পায়না। তেমনি কিয়ামতের দিনও তারা কোন সাহায্য পাবেনা। পৃথিবীতে তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই জোটেনা। ইসলামের সাথে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার কারণে মহান আল্লাহ তাদের যে পরিণতি করেছিলেন তা পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

শাস্তির কবলে সামূদ জাতি

'হিজর নামক জায়গাটি ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রীয় আবাসস্থল। তাবূক অভিযানকালে নবী (সঃ) সাহাবীদেরকে ঐ স্থানটি দেখান। সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় খোদাই করে যেসব দালান কোঠা তৈরী করেছি, সেগুলোর নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহপাক সামূদ জাতির উদ্দেশে বলেন, তোমরা ঐ কথা স্মরণ কর, যখন তিনি আল্লাহ আদ জাতির পর তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে খলীফা অর্থাৎ প্রতিনিধি করলেন। [২২]

সামূদ জাতির কর্মকান্ড

আদ ও সামূদ জাতির কর্মকান্ড মোটামুটি একইরকম। আদ জাতির পর সামূদ জাতিও দুনিয়ার উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।

এ সময় জাতির চরিত্রহীন লোকদের নেতৃত্ব কায়েম হয়েছিল। একদিকে নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা পাথর খোদাই করে মনোরম প্রাসাদের পর প্রাসাদ তৈরী করেছিল, অপরদিকে তারা দুর্বলদের উপর যুলুম ও সন্ত্রাস করছিল। সম্পদশালী ও প্রভাবশালী লোকেরা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। সমাজের একশ্রেণীর বিত্তহীন যখন তাদের মাথা গুঁজবার এতটুকু জায়গা পেত না, তখন তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রদর্শনী মূলক স্মরণীয় অট্টালিকা তৈরী করত।

এ জাতির লোকেরা মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তাদের নবী ছালেহ (আঃ) তাদের কাছে মহান আল্লাহর দাওয়াত পেশ করলে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাতে সাড়া দিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ পাক বলেন, "শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদাররা নিম্নশ্রেণীর লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা যার উপর ঈমান এনেছ, তাকে আমরা মানি না।" [২৩]

শাস্তি প্রাপ্ত সামুদ জাতি

হযরত ছালেহ (আঃ) কে তাঁর সম্প্রদায় সামুদ, তাঁর নব্যুয়তের দলীলস্বরূপ পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করতে বলল। হযরত ছালেহ (আঃ) আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করায়, পাহাড় থেকে একটি উটনী বের হয়ে আসল। কিন্তু আল্লাহপাক একটি শর্ত আরোপ করলেন। শর্তটি হল-একটি নির্দিষ্ট কুয়ার পানি ঐ উটনী একদিন পান করবে এবং পরের দিন সেখানকার লোকেরা এবং তাদের পশুগুলো ওটার পানি পান করবে।

প্রথম দিকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত ছালেহ (আঃ)-এর ঐ মুজিয়া দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিল, তার প্রতি ভয় ও ভক্তি দেখিয়েছিল এবং তার বিধিবিধান মত তাদের কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিল।

কিন্তু কিছুদিন পর পূর্বের মত আবার তাদের দুষ্টামি ও নাফরমানি প্রকাশ পেল এবং উটনীকে মেরে ফেলার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিল। ঐ সম্প্রদায়ের নেতারা সলাপরামর্শ করে একজন হতভাগ্য নেতাকে ঐ উটনীকে হত্যা করার ভার দিল। সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদেরকে ভাল বলে মনে করা হতো, তাদের অনেকেই ঐ নেতাদের পক্ষ নিল। হযরত ছালেহ (আঃ)-এর পক্ষে অল্প লোকই থাকলেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর পক্ষের লোক সংখ্যা ছিল চার হাজার।

একদিন ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি উটনীটিকে মেরে ফেলল। তখন হযরত ছালেহ (আঃ) নেতাদের বললেন, বেশ! এখন তোমরা তিন দিন তোমাদের ঘরে বসে থাক। তারপর এর ফল দেখতে পাবে। [২৪]

তারা হযরত ছালেহ (আঃ)-এর ঐ কথা শুনে অনুতপ্ত হল না বরং এবার তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। এরূপ অবস্থায় হযরত ছালেহ (আঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে সেখান থেকে হিজরত করলেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর হিজরতের স্থান ছিল ছালেহ পাহাড়, যা মূসা পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত। আল্লাহ পাক বলেন, "অবশেষে যখন আমার ফয়সালার সময় এসে গেল, তখন আমি ছালেহ ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার করুণায় বাঁচিয়ে দিলাম এবং সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করলাম।" [২৫]

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে সামূদের সম্প্রদায়ের উপর প্রচন্ড এক ভূমিকম্প দেখা দিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই গোটা জাতি লন্ডভন্ড হয়ে গেল। তিন দিন শেষ হওয়ার পূর্বেই ঐ ঘটনা ঘটেছিল।

সামুদ জাতির ধ্বংসের চিত্র কুরআন পাকে মহান আল্লাহ পাক যেভাবে তুলে ধরেছেন-"আর দেখ হিজরের লোকজন রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল; আমি আমার নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সত্য গ্রহণ করতে বিরত থাকল। তারা পাহাড় কেটে বাড়িঘর নির্মাণ করতো যেন তারা সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু তাদের শক্তি এবং সুরক্ষিত বাড়িঘর তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। অতঃপর একদিন ভোরে এক ভয়ঙ্কর ও বিকট ধ্বনি এসে তাদেরকে গ্রেফতার করল এবং সবাই নিজের বাড়িতেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আর তারা নিজেদের চেষ্টা তদবির দ্বারা যা কিছুই উপার্জন করেছিল তা তাদের কোনই কাজে এলো না। [২৬]

ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গাটি

বর্তমান জর্দান ও তার আশপাশের এক বিরাট এলাকা জুড়ে ঐ ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটেছিল। সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাটি 'হিজর'। জায়গাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ প্রায় প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। বর্তমানে এ জায়গার লোকসংখ্যা নামমাত্র। জমির অবস্থা উর্বরহীন। দর্শকেরা যারাই সেখানে যায়, তারা বুঝতে পারে যে, এটা একটা আল্লাহর গযবের জায়গা।

আল্লাহপাক বলেন, সামুদ জাতি নিজেদের দুষ্টামির দরুন ছালেহ (আঃ)-এর কথা অবিশ্বাস করল। যখন ঐ কওমের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য লোকটি উটনীকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হল। আল্লাহর রাসূল ছালেহ (আঃ) বললেন, উটনীকে স্পর্শ করা এবং এর পানি পানে বাধা দেয়া থেকে তোমরা সাবধান থাক। কিন্তু তাঁর কথা তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং উটনীকে মেরে ফেলল। [২৭]

মুলতঃ মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত এই পৃথিবীতে কোন একটি প্রাণীর পক্ষেই এক মুহূর্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ কথা মানব জাতির নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তবু মানুষ আল্লাহর দাসত্ব করে না, করতে চায় না।

শান্তির কবলে ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি

প্রায় ২১০০ খৃস্টপূর্ব সনে উর নামক শহরে ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্ম। উর বর্তমানে ইরাকের অন্তর্ভূক্ত। পূর্বে উর শহরটি একটি বিরাট ব্যবসা ও শিল্প কেন্দ্র ছিল। তখন ইরাক ও তার আশপাশের একটি বিরাট এলাকার বাদশাহ্ ছিল নমরূদ।

ঐ দেশের লোকদের জীবনের লক্ষ্য ছিল সম্পদ উপার্জন ও ভোগবিলাসে ডুবে থাকা। তাদের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য সুদী কারবার, একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখা, পরস্পর মামলা মোকদ্দমা করা এবং দেব-দেবীর পূজা করা।

তারা আল্লাহকে কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসেবে গ্রহণ করত। আর দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করত। তাদের প্রার্থনার বিষয়গুলো ছিল, তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, দীর্ঘায়ু এবং দুনিয়ার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা লাভ করা।

প্রতিমাপূজকদের বিশ্বাস

দুনিয়ার প্রতিমাপূজকদের ধারনা হল, তারা আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে পুরোপুরি স্বীকার করে নেয় না। পুরোপুরি স্বীকার করে নেয় না। তারা একদিকে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। আল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলোর তিনিই পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক, একথাও তারা স্বীকার করে। অপরদিকে, যেহেতু মানুষ আল্লাহর খলীফা, সেহেতু দুনিয়ার কোন ব্যবসা বানিজ্য আল্লাহ বিধি-বিধান মোতাবেক চলবে বা মানুষেরা আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান নিজেদের উপর কার্যকর করবে, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তারা মানে না।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় মূর্তিপূজার সাথে সাথে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রেরও পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত যে, মানুষের জন্ম, মৃত্যু, রিযিক, লাভ-লোকসান, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, জয়-পরাজয় ইত্যাদি দেবতাদের খুশী করা ও না করার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পূজার মাধ্যমে তারা তাদেরকে খুশী করত।

নান্নার দেবতা

উর শহরের শিলালিপিতে প্রায় পাঁচ হাজার দেব-দেবীর নাম পাওয়া যায়। মাত্র একটি দেবতা 'নান্নার' সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হল।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর জামানায় প্রত্যেক শহরের একজন রক্ষক থাকত। তাকে বলা হতো 'রাব্বুল বালাদ' অর্থাৎ শহরের খোদা। এর অধীনে অনেক ছোট ছোট দেব-দেবী থাকত। দেবতাদের কাছে বাদশাহ, নেতারা এবং পূজারীরা পূজা অর্চনা করত এবং নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করত। আর তারা দেবতাদের মাধ্যমে নানাবিধ ফায়দা লুটত।

১. উর শহরের রাব্বুল বালাদ ছিল নান্নার দেবতা। তাকে চন্দ্রদেবও বলা হতো। নান্নার দেবতার মূর্তিটি উর শহরের সর্বোচ্চ একটি পাহাড়ের উপর একটি মন্দিরে স্থাপিত ছিল। মন্দিরটি ছিল একটি অত্যন্ত মনোরম রাজপ্রাসাদের মত। তার নিকটেই ছিল নান্নার দেবতায় স্ত্রী 'নানগুল' দেবীর মন্দির।

নান্নার দেবতার শয়ন কক্ষে প্রতিরাতে একজন পূজারিণী তার বধূ সাজত। এভাবে মন্দিরগুলোতে বহু স্ত্রীলোক, দেবতাদের নামে নিজেদের সতীত্ব উৎসর্গ করত। তাদের দেবদাসী Religious prostitute বা ধর্মীয় বেশ্যা বলা হতো।

ঐসব নারীকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হতো, যারা দেবতাদের নামে তাদের কুমারিত্ব উৎসর্গ করত। কোন দেবতার সামনে একজন নারীর, কোন অপরিচিত পুরুষের দেহ সঙ্গিনী হওয়াকে মুক্তির পথ মনে করা হতো। এরকম ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তি থেকে আনন্দ-সম্ভোগ অধিকাংশ পূজারীগণই করত।

২. নান্নার দেবতা দেশের শাসকের কাজও করত। দেশের বাগ-বাগিচা, জমিজমা এমনকি ঘরবাড়িও দেবতার মন্দিরের নামে ওয়াকফ করা হতো। সবরকম শস্য, সোনাদানা, দুধ ইত্যাদি মন্দিরে নজরানা স্বরূপ পাঠাতে হতো।

এখানে বিচারের কাজও চলত। দেবতার নৈকট্য লাভের জন্য পূজারীগণই এগুলো সমাধা করত। বিচারক হতো পূজারীগণ এবং তাদের রায় খোদারই রায় বলে গণ্য করা হতো।

প্রকৃত বাদশাহ ছিল নান্নার এবং দেশের শাসক তার পক্ষ থেকে দেশ শাসন করত। এজন্য দেশের লোকদেরকে নান্নার দেবতারও পূজা করতে হতো এবং বাদশাহরও পূজা করতে হতো।

এখান থেকে বুঝা যায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি কেবল যে পূজা অর্চনা ও শিরকের মধ্যেই লিপ্ত ছিল সেটাই নয়, বরং গোটা জাতির অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ঐ মুশরিকী

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসের ভিত্তিতে চলত। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির গোটা সমাজ প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ করে সেটাকে তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে সোচ্চার হলেন। অপরদিকে, তাঁর পিতা আজর, পূজারীগণ, জনসাধারণ এবং নমরূদ একত্রে তাঁর আওয়াজ স্তব্ধ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হল।

ইব্রাহীম (আঃ) এর হেদায়েত

হিদায়াতের পথে আনার জন্য সর্বপ্রথম তিনি নিজ পিতা আজরকে বুঝান। তারপর জনসাধারণের কাছে সত্যকে তুলে ধরেন। শেষে নমরূদের কাছে পেশ করেন। জাতিকে হিদায়াতের পথে আনার জন্য দীর্ঘদিন চেষ্টার পর মাত্র দু'জন ঈমান আনলেন। ১. তাঁর স্ত্রী হযরত সারা (রাঃ), ২. তাঁর ভাতিজা হযরত লূত (আঃ)। আর গোটা সম্প্রদায় তাঁকে অগ্নিকুন্ডে পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তিনি যেভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যাকে উৎখাত করার চেষ্টা করেন

তিনি ইব্রাহীম (আঃ) নিজ পিতাকে বললেন, "হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন বস্তুর পূজা করেন, যে বস্তু কিছু শোনে না, দেখে না এবং যারা আপনার কোন উপকার করতে পারে না"। [২৮]

তখন তাঁর পিতা বলল, তুমি যদি এরকম কথা থেকে বিরত না হও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলব। আর তুমি আমার নিকট থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও। [২৯]

তখন ইব্রাহীম (আঃ) ব্যর্থ হয়ে এবং ভারাক্রান্ত মনে বললেন, হে পিতা! আপনার উপর আমার সালাম রইল। এখন থেকে আমি আপনার জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। [৩০]

বর্ণিত আছে যে, এরপর তিনি নিজ শহর ছেড়ে সাত বছর যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দাওয়াতী কাজ করেন। ইতোমধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে। তিনি আবার নিজ শহরে এসে বাস করতে থাকেন।

অনেক চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও যখন তাঁর সম্প্রদায় ইসলামের দাওয়াত কবুল করল না। মূর্তিপূজা পূর্বের মত বহাল থাকল, তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের অনুপস্থিতিতে অবশ্যই আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর দুর্গতি ঘটাব। [৩১]

অতঃপর তিনি এক সময় মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে বললেন, তোমরা এসব খাদ্যদ্রব্য খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হল, কথা বলছ না কেন? অতঃপর ডান হাত দিয়ে সব মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। [৩২]

অতঃপর তিনি সেগুলোকে খন্ডবিখন্ড করলেন। কিন্তু একটি বড় দেবতাকে বাদ রাখলেন। [৩৩] তারা জিজ্ঞেস করল, হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবতাদের সাথে এরূপ আচরণ করেছ? [৩৪]

তিনি বললেন, বরং তাদের মধ্যে বড় মূর্তিটিই এ কাজ করেছে। তাকে জিজ্ঞেস কর। তাদের যদি বাকশক্তি থাকে। তবে তারা তোমাদের কথার জবাব দেবে। [৩৫]

অতঃপর তিনি নমরূদের কাছে দাওয়াত পেশ করেন। নমরূদ নিজেকে খোদা বলে মনে করত। এর মানে এ নয় যে, সে নিজেকে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করত। অর্থাৎ সে এটা মনে করত না যে, সে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে। বরং এদিক দিয়ে নিজেকে খোদা বলে মনে করত যে, সে তার রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

সর্বময় কর্তা। তার কথাই আইন। তার উপর এমন কোন শক্তি ও সত্ত্বা নেই, যার কাছে তাকে তার সমুদয় কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহপাক বলেন, "ইব্রাহীম (আঃ) যখন নমরূদকে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও। এতে ঐ কাফির নিরুত্তর হয়ে গেল। [৩৬]

নমরূদ নিরুত্তর হওয়ার অর্থ হল, সে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত। ঐ সৃষ্টিকর্তা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করছেন, এটা মেনে নিতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর বিধিবিধান মোতাবেক দুনিয়ার সবকিছুই চলতে হবে, মূর্তিপূজা বর্জন করতে হবে, তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না, এগুলো মেনে নিতে সে প্রস্তুত নয়।

নমরুদের সন্ত্রাসী কীর্তি এবং আল্লাহ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ

ইব্রাহীম (আঃ)-এর সব চেষ্টা তদবীর খতম হয়ে গেল। বাদশাহসহ দেশের সব লোক তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। নমরূদ ইব্রাহীম (আঃ) কে শাস্তি দেয়ার জন্য ইরাকের ব্যাবিলন শহরে একটি স্থান নির্দিষ্ট করল। সেখানে এমন আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হল, যেন সেখান থেকে তিনি কখনও জীবিত অবস্থায় বের হয়ে আসতে না পারেন। অতঃপর দূর থেকে তাকে ঐ আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে হেফাজত করেন। তিনি ঐ আগুন থেকে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসেন।

আল্লাহ পাক বলেন, "তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতির লোকেরা বলল-তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং সাহায্য কর তোমাদের দেব দেবীদেরকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। তখন আমি আল্লাহ বললাম, হে আগুন! ইব্রাহীমের জন্য তুমি ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা চাচ্ছিল, ইব্রাহীমের ক্ষতি করতে কিন্তু আমি তাদেরকে ভীষণভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।" [৩৭]

তিনি আগুন থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং নমরূদ ও তার দেশের লোকেরা ঐ অলৌকিক ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখল। তবুও তাদের কেউ হিদায়েত লাভ করল না। এরপর তিনি দেশ থেকে হিজরত করেন। তাঁর জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি তাঁর জাতির মধ্যে থাকাকালীন সেটা এসেছিল, না তিনি হিজরত করার পর, কোরআন মজীদে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আযাবের ফলে ঐ জাতি যে ধ্বংস হয়েছিল, এটা প্রমাণিত।

আল্লাহপাক বলেন, "তাদের নিকট কি ঐসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির লোকদের সংবাদ পৌঁছেনি, যারা পূর্বে গত হয়ে গেছে? তাদের মধ্যে ছিল নূহ, আদ, সামুদ ও ইব্রাহীমের জাতি এবং মাদইয়ানের অধিবাসীগণ ও যে জনবসতিগুলো উল্টে দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর।" [৩৮]

ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, চারজন বাদশাহ সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেন। তাদের মধ্যে দু'জন মুমিন এবং দু'জন কাফির। তারা হলেনঃ

১. হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ)।
২. হযরত যুলকারনাইন।
৩. বুখতে নছর।
৪. নমরূদ।

বর্ণিত আছে যে, নমরূদের পিতা কানাআন ইবনে কুশ একদিন একটি স্বপ্ন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাকে স্বপ্নের অর্থ বলা হল যে, তার পুত্র তাকে হত্যা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তার পুত্রের জন্ম হলে একটি সাপ তার নাকে এসে ঢুকল। সে এটাকে একটি কুলক্ষণ বলে মনে করল। সুতরাং কানাআন তার পুত্রকে হত্যা করতে মনস্থ করল। কিন্তু ছেলের মা সুলখ্যা গোপনে তাকে একটি মেষপালককে দান করল। এই কৃষ্ণবর্ণ ও চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট শিশুটিকে সে দেখে তাকে পানিতে ফেলে দেয়। কিন্তু পানির ঢেউ তাকে তীরে পৌঁছে দেয়। সেখানে একটি বাঘিনী তাকে দুধ পান করায়। বালক বেলা থেকেই সে ভয়ঙ্কর ছিল। যৌবনে পৌঁছে সে দস্যুদের সরদার হয় এবং কানাআনকে আক্রমণ করে হত্যা করে। কানাআন যে তার পিতা এটা সে জানত না। এরপর সে কানাআন এর স্ত্রী অর্থাৎ তার নিজের মাকে বিয়ে করে এবং ইরাক দেশের বাদশাহ্ হয়। পরে সে সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী দাবী করে।

ইব্রাহীম (আঃ) তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে, সে তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার সৈন্যদের প্রস্তুত করে। ঐ সময় আল্লাহ্ পাক একটি বিরাট মশার ঝাঁক পাঠান। তারা নমরূদের লোকদের রক্ত-মাংস চুষে খায়। একটি মশা নমরূদের নাক দিয়ে মস্তকে ঢুকে পড়ে।

চার'শ বছর রাজত্ব করার পর অবশেষে এই নাফরমান, ঐ মশার দ্বারা মারা যায়।

শাস্তির কবলে লুত (আঃ)-এর জাতি

হযরত লূত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাতিজা। বাইবেলের মতে, হযরত লূত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক ভাই 'হারান'-এর পুত্র। হযরত লুত (আঃ) ইরাক থেকে তাঁর চাচা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে হিজরত করেন। দীনের সহযোগিতা করবার লক্ষ্যে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর ভাতিজা লুত (আঃ) কে জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী একটি এলাকায় খলীফা অর্থাৎ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

লূত (আঃ)-এর জাতির আবাসস্থল

জর্দান ও ফিলিস্তিনের মাঝে একটি সাগর রয়েছে। এটাকে মৃত সাগর, মরুসাগর, লুত সাগর, বাহরে লূত বা ডেডসী (Dead sea) বলে। সাগরটি আকারে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এই সাগরের দক্ষিণাংশটিতে লূত (আঃ)-এর জাতির লোকেরা বাস করত।

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ সনের পূর্বে ঐ সাগরের দক্ষিণাংশটি একটি শস্য-শ্যামল উপত্যকা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এখানে পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। সেগুলো হল, সাদুম, আমুরা, আদমা, সানবুয়েম ও দুগার। এ এলাকাটির রাজধানী ছিল সাদুম। এই সাদুম শহরেই লূত (আঃ) বসবাস করতেন।

লূত (আঃ)-এর জাতির কয়েকটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

লুত (আঃ) যখন সাদুমে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি দেখেন যে, দুনিয়ার এমন কোন খারাপ কাজ নেই, যা সেখানকার লোকেরা করে না এবং দুনিয়ার যেসব ভাল কাজ রয়েছে, তারা সেগুলোর একটিও করে না। তারা আল্লাহর পুরোপুরি নাফরমান। হীন স্বভাব, মন্দ চরিত্র এবং সব রকম অশ্লীল কাজের দ্বারা তারা তাদের জীবন বরবাদ করে ফেলেছে। তারা নিজেদের কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রী লোকদের পরিবর্তে বালকদের সাথে সহবাস করে। আর এরূপ অপকর্ম ইতোপূর্বে দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

১. এ জাতির লোকেরা সম্পদশালী ছিল। তাদের উপত্যকায় তারা কয়েক মাইলব্যাপী বাগ-বাগিচা তৈরী করে রেখেছিল। এ বাগানের মধ্যে তারা প্রকাশ্য চরম নির্লজ্জভাবে কুকর্ম করত। তারা সমকামীও ছিল, ব্যভিচারীও ছিল।

২. একবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত সারা (রাঃ) হযরত লূত (আঃ)-এর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাঁর খাদেম আলী ইযারকে সাদুমে পাঠালেন। আলী ইযার সাদুমে পৌঁছে দেখল যে, একজন সাদুমী একজন মুসাফিরকে ধরে মারছে। একজন মুসাফিরকে কেন মারা হচ্ছে, আলী ইযার এরকম কথা বলাতে বাজারের লোকেরা তার মস্তক ছিন্ন করে ফেলে।

৩. তালমূদে বলা হয়েছে, একবার এক মুসাফির কোথাও যাবার সময় সাদুম শহরে পৌঁছলে তার রাত হয়ে যায়। তার সাথে পাথেয় ছিল। সে শহরের কোথায় আশ্রয় না পেয়ে একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। পরে একজন সাদুমী তাকে অনুরোধ করে তার বাড়ি নিয়ে গেল ও আশ্রয় দিল। কিন্তু সকাল হবার আগেই সে তার সমুদয় মালপত্রসহ তার গাধাকে উধাও করে নিল। মুসাফির কান্নাকাটি ও চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু কেউ কথা শুনল না। বরং তার কাছে আর যা কিছু ছিল সেগুলো সব বস্তির লোকেরা কেড়ে নিয়ে তাকে শহর থেকে বের করে দিল।

৪. আর এক বর্ণনায় পাওয়ার যায়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একটি কাজে তাঁর এক খাদেমকে সাদুমে পাঠান। খাদেম যখন সাদুমে পৌঁছল, তখন তাকে বিদেশী মনে করে এক সাদুমী তার দিকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারল। খাদেমের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তখন সাদুমী খাদেমের কাছে গিয়ে বলল, আমি যে পাথর মেরে তোমার মস্তক রক্তাক্ত করে দিয়েছি, তার জন্য আমাকে পারিশ্রমিক দাও। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হল। কিন্তু এর কোন মীমাংসা হল না। তখন ঐ সামুদী খাদেমের বিরুদ্ধে তাদের আদালতে কেস করল। উভয় পক্ষের কথা শুনে সাদুমী বিচারক রায় দিল, পাথর মারার পরিশ্রমিক অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। তখন খাদেম রাগান্বিত হল ও একটি পাথর নিয়ে সজোরে বিচারকের মাথায় নিক্ষেপ করল।

অতঃপর বিচারককে উদ্দেশ্য করে সে বলল, এই পাথর মারার জন্য আমি তোমার কাছে যে পারিশ্রমিক পাবো, সেটা তুমি ঐ সাদুমীকে দিয়ে দাও। একথা বলে সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ জাতিটি কি রকম লম্পট, যালিম, ধোঁকাবাজ, অসৎ, ছিনতাইকারী ও সন্ত্রাসী ছিল।

ধ্বংসপ্রাপ্ত লূত (আঃ)-এর জাতি

- আল্লাহপাক বলেন, তোমরা কি সেই অশ্লীল কাজ কর, যা দুনিয়ার কোন সৃষ্টজীব তোমাদের আগে কোনদিন করেনি। [৩৯]

- "তোমাদের অবস্থা কি এই যে, তোমরা পুরুষের সাথে সমকামে লিপ্ত হও, ডাকাতি কর এবং জদের মজলিসে প্রকাশ্যে জঘন্য কাজ কর।" [৪০]

- লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় জবাব এটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, "তারা বলত, এদেরকে লূত আ তাঁর পরিবারের লোকদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। কারণ নিশ্চয় এরা খুব পবিত্র লোক।" [৪১]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ গোটা জাতির লোকেরা লূত (আঃ) কে উপহাস করে বলত যে, তোমাদের মত পবিত্র লোকেরা, আমাদের মত অপবিত্র লোকদের মধ্যে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্যত্র চলে যাও।

- অতঃপর তার কওমের জবাব এটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে,"তারা বলতে লাগল, হে লূত (আঃ) তুমি আমাদের নিকট আল্লাহর আযাব নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"

- এমতাবস্থায় জাতির উপর যখন আযাব আসা জরুরী হয়ে পড়ল, "তখন আল্লাহপাক তিনজন ফেরেশতাকে সুন্দর যুবকের আকৃতিতে লূত (আঃ)-এর কাছে পাঠালেন। লূত (আঃ) মেহমানদেরকে তাঁর ঘরে বসালেন। ওদিকে লূত (আঃ)-এর স্ত্রী গোপনে এ খবরটি লোকদের জানিয়ে দিল। ফলে লোকেরা এসে লূত (আঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে লাগল। তারা বললেন, হে লূত (আঃ) আমরা আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেস্তা। আপনার কোন ভয় ও চিন্তা নেই।" [৪২]

- "অতঃপর আমি আল্লাহ তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। আর বললাম আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শনের স্বাদ গ্রহণ কর।" [৪৩]
বাইবেলে বলা হয়েছে, লোকেরা লূত (আঃ)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও দরজা ভাঙ্গার উপক্রম করে। তখন ফেরেস্তারা লূত (আঃ) কে বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দেন।ঐ সময় বাইরের সকলে অন্ধ হয়ে যায়।

- "অতঃপর আমি রক্ষা করলাম তাকে [লূত (আঃ) কে] এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে। কেবলমাত্র এক বৃদ্ধা [লূত (আঃ) এর স্ত্রী] লোকদের সাথে পিছনে রয়ে গেল।" [৪৪]

- আল্লাহ পাক বলেন, হে লূত! তারপর যখন আমার নির্ধারিত সময় এসে গেল, তখন ঐ জনপদকে ওলট পালট করে দিলাম এবং তার উপর পাকা মাটির পাথর ক্রমাগত বর্ষণ করতে থাকলাম। যার প্রত্যেকটি (কার উপর নিক্ষিপ্ত হবে সেটা) তোমার রবের নিকটে চিহ্নিত করা ছিল। [৪৫]
তিনি আরও বলেন, আর আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম একটি শাস্তিমূলক বর্ষণ। [৪৬]

সুতারাং দেখা যায়, ঐ নাফরমান লূত (আঃ)-এর জাতিকে আল্লাহ পাক তিনটি আযাব দ্বারা শেষ করেন।

১. তারা অন্ধ হয়ে যায়।
২. প্রত্যেক পাপীষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করার জন্য পাথর চিহ্নিত করা ছিল, যেগুলো তাদের উপর বৃষ্টির
মত বর্ষণ করা হয়।
৩. তাদের জনপদ ওলটপালট করে দিয়ে সেটাকে সাগরে পরিণত করা হয়।
উল্লেখ্য যে, ঐ সাগরের পানি এতই লবণাক্ত ও বিস্বাক্ত যে, সেখানে মাছ বা এ জাতীয় কিছুই বাঁচে না।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আঃ) সাদুম থেকে সপরিবারে হিজরত করে নিকটবর্তী একটি বস্তি 'যাগার'-এ চলে যান। কেবল তাঁর স্ত্রী ওয়াইলা বা হালসাকা তাঁর সঙ্গী হতে অস্বীকার করে এবং পথিমধ্যে থেকে সাদুমে ফিরে যায়। যাগার থেকে তিনি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- মৃত সাগরের পূর্বদিকে জর্দান এবং পশ্চিমদিকে ফিলিস্তিন। তখনকার ফিলিস্তিনের শহরগুলো হল রামাল্লাহ, জেরুজালেম, বেথেলহেম, নাবলুস, হেব্রন ইত্যাদি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হেব্রনে বসবাস করতেন। বাইবেলে বর্ণিত আছে, লূত (আঃ)-এর জাতির ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে তিনি যখন হেব্রন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাটি দেখতে এলেন, তখন তিনি দেখেন যে, আশপাশ থেকে এমন ধোঁয়া বের হচ্ছে, যেমন ইটের ভাটা থেকে বের হয়।

- ১৯৬৫ সালে অনুসন্ধানকারী একটি আমেরিকার টীম মৃত সাগরের পূর্বপাশে একটি কবরস্থান আবিষ্কার করেন। তারা অনুমান করে যে, সেখানে অন্তত বিশ হাজার লোকের একটি গণকবর রয়েছে। এখান থেকে অনুমান করা যায় যে, সাগরের দক্ষিণাংশের সব লোক তো সেখানেই মারা গিয়েছিল। আর আশপাশের অনেক লোক যারা মারা গিয়েছিল, তাদের এখানে কবর দেয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক বলেন, "হে নবী (সাঃ)! তুমি লোকদের বল, তোমরা যমীনে ভ্রমণ করে দেখ, যে সমস্ত লোক অতীতে গত হয়েছে, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল"।[৪৭]

তথ্যপঞ্জি

১. আল-কুরআন ১১: ১১৭।
২. আল-কুরআন ৩০:৪১।
৩. আল-কুরআন ৭১:৫-৯।
৪. আল-কুরআন ৫৪:১০।
৫. আল-কুরআন ৭১:২৬-২৭।
৬. আল-কুরআন ১১:৩৬।
৭. আল-কুরআন ৫৪: ১১-১২।
৮. আল-কুরআন ৭: ৬৯।
৯. আল-কুরআন ২৯: ৩৮।
১০. আল-কুরআন ৭:৬৯।
১১. আল-কুরআন ৮৯:৬-৮।
১২. আল-কুরআন ১১: ৫২।
১৩. আল-কুরআন ১১: ৫০।
১৪. আল-কুরআন ১১: ৫৯।
১৫. আল-কুরআন ২৬: ১২৮-১৩০।
১৬. আল-কুরআন ৭: ৭০।
১৭. আল-কুরআন ৬৯:৬-৭।
১৮. আল-কুরআন ৫১: ৪১।
১৯. আল-কুরআন ৫৪:১৮-২১।
২০. আল-কুরআন ৫৯:৬৮।
২১. আল-কুরআন ৮৯: ৬৬।
২২. আল-কুরআন ৭:৭৪।
২৩. আল-কুরআন ৭:৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. আল-কুরআন ১১: ৬৫।
২৫. আল-কুরআন ১১:৬৬।
২৬. আল-কুরআন ১৫:৮০-৮৪।
২৭. আল-কুরআন ৯১:১১-১৪।
২৮. আল-কুরআন ১৯:৪২।
২৯. আল-কুরআন ১৯:৪৬।
৩০. আল-কুরআন ১৯:৪৭।
৩১. আল-কুরআন ২১:৫৭।
৩২. আল-কুরআন ৩৭:৯১-৯৩।
৩৩. আল-কুরআন ২১:৫৮।
৩৪. আল-কুরআন ২১:৬২।
৩৫. আল-কুরআন ২১:৬৩।
৩৬. আল-কুরআন ২:২৫৮।
৩৭. আল-কুরআন ২১:৬৮-৭০।
৩৮. আল-কুরআন ৯:৭০।
৩৯. আল-কুরআন ২৯:২৮।
৪০. আল-কুরআন ২৯:২৯।
৪১. আল-কুরআন ৭:৮২।
৪২. আল-কুরআন ২৯:৩৩।
৪৩. আল-কুরআন ৫৪:৪৩।
৪৪. আল-কুরআন ২৬:১৭০-১৭১।
৪৫. আল-কুরআন ১১:৮১-৮২।
৪৬. আল-কুরআন ২৬:১৭৩।
৪৭. আল-কুরআন ৩০:৪২।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১০

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় দন্ডবিধি

সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদানের বিষয়ে জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় দন্ডবিধি সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। কেননা এ দন্ডবিধি এবং তার সফল বাস্তবায়নই সন্ত্রাস সহ সকল অপরাধ প্রতিরোধের একমাত্র হাতিয়ার। ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস মুক্ত সেই স্বর্ণ যুগের দিকে তাকালে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেধীনের যুগে কিভাবে সন্ত্রাস সহ সকল প্রকার অপরাধ দূর করে সোনালী যুগের সূচনা করেছে তা ইসলামী দন্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

অপরাধ মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সকল মানুষ না হলেও অনেক মানুষই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে মানব ইতিহাস যত পুরাতন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ইতিহাসও তেমনি পুরাতন। যে সমাজে অপরাধের যত ছড়াছড়ি সে সমাজ ততই অশান্তিতে ভরা। ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার এক মহান ব্রত নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছে। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম কোন গতানুগতিক ধর্ম নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। অন্য ধর্মে-সমাজে সংঘটিত অপরাধে অপরাধীদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা নেই। সে জন্য অন্য দর্শনাবলম্বীগণ নিজেরাই অপরাধীদের শাস্তির বিধান রচনা করে এই সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। পক্ষান্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দূত ইসলাম অরাধীচক্রের বিষদাত ভেঙ্গে দেয়ার দৃঢ় প্রতয় নিয়ে অপরাধীদের জন্য দন্ডবিধি প্রণয়ন করেছে। সে জন্যই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সমাজে অপরাধের নাম গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইসলাম মানুষের গড়া কোন মতবাদ বা জীবন ব্যবস্থা নয়। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রণীত শ্বাশ্বত সুন্দর জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করার পদ্ধতি। স্রষ্টা আল্লাহই জানেন তাঁর সৃষ্ট বনী আদমকে কোন ধরনের অপরাধের জন্য কোন ধরনের দন্ডদানের মাধ্যমে অপরাধ থেকে বিরত রাখা যাবে। কোন্ অপরাধ দমনের জন্য কোন্ ব্যবস্থা নিতে হবে তার সম্যক অভিজ্ঞতা শুধু সেই সত্তারই রয়েছে। এক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় বিধান প্রণয়ণের যোগ্য বিধানদাতা তিনিই। কেননা স্থান কাল পাত্রে ভবিষ্যত আবর্তন বিবর্তন সম্পর্কে তিনিই শুধু অবগত। যুগের সকল ভূখন্ডের সকল অপরাধীদের জন্য পরিবর্তন না করেই তার আইন বাস্তবায়ন সম্ভব। মানুষ রচিত দন্ডবিধির মাধ্যমে অপরাধ নির্মূল না হয়ে বরং প্রসারিত হয়। আর ইসলামের দন্ডবিধির মাধ্যমে অপরাধ দিন দিন উৎখাত হতেই থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধঃ ইসলামী শরীয়েতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কাজ করা আর নির্দেশিত কাজকে বর্জন করার নামই অপরাধ, কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ত্রাস বলে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণ, সমগ্র মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ, সমাজ হতে বিশৃংখলা বিলুপ্তিকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ইসলাম কোন কোন কাজকে অপরিহার্য পরিপূর্ণতায় রূপ দেয়ার লক্ষ্যে অপরাধীর জন্য দন্ডবিধিরর প্রণয়ণ করেছে। কারণ হচ্ছে অবাঞ্চিত এই অপরাধীদের সাজা দেখে অন্যরা সন্ত্রাস সহ সকল প্রকার অপরাধ সংঘটিত করার চিন্তা করতেও ভয় পাবে।

ইসলামে দন্ডপ্রদানের প্রকারঃ ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের মান অনুযায়ী সাজার স্তরও তিন্ন ভিন্নভাবে বিন্যাস করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ এই দন্ড দুই প্রকার

১. পারলৌকিক দন্ড
২. ইহলৌকিক দন্ড

পারলৌকিক দন্ড

পারলৌকিক দন্ডঃ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিশাল স্থান জুড়ে অপরাধীকে পরকালে কি কি দন্ড কি কি কারণে প্রদান করা হবে তার বর্ণনা এসেছে। বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হতেই এই দন্ড প্রদান শুরু হয়। কবরে হাশরে সীরাত, জাহান্নামে প্রভৃতি জায়গায় এই সাজা দেয়া হয়। উহাহরণ স্বরূপ এই শাস্তির বর্ণনা সম্বলিত কয়েকটি আয়াত এখানে উপস্থাপিত করা হলো।

" বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি। অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে, আর তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না- অনেক মৃত্যুকে ডাক। " [১]

"এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে, দহনশাস্তি আস্বাদন কর।" [২]

"যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তেমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে, হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।" [৩]

"যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে। যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে।" [৪]

"তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল।" [৫]

"কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোন পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।" [৬]

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" [৭]

এ ছাড়াও মিরাজের হাদীস সহ অনেক হাদীসে এই পারলৌকিক শাস্তির ভয়াবহ ও বিভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে।

ইহলোকিক দন্ড

পারলৌকিক সাজা ছুড়ান্ত ও আসল সাজা হলেও এই পৃথিবীতেও অপরাধীদের জন্য কঠোর দন্ডদানের বিধান রয়েছে। এই দন্ড দুই প্রকারঃ

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড
২. প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড

আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড

পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের জন্য কাফের বেইমানদেরকে এই পৃথিবীতেই আল্লাহ কঠোর সাজা প্রদান করে জবর শায়েস্তা করে থাকেন। বহু সম্প্রদায়কে সাজার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার বর্ণনা মহাগ্রন্থ কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো।

"আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং কত কুপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে।" [৮]

"আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার। আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। [৯]

"স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ। তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি।" [১০]

Dhaka University Institutional Repository

"আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ি। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রসুল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।" [১১]

এছাড়াও এমনি ভাবে আদ, সামুদ, ফিরাউনের সম্প্রদায়, লুত (আঃ), নুহ (আঃ) এর কওমের প্রতিও শাস্তি প্রেরনের বর্ণনা কুরআনে কারীমের আরো অনেক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড

জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দন্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দন্ডবিধি', 'বাংলাদেশ দন্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এরূপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. হুদুদ
২. কেসাস
৩. তা'যীরাত

১. হুদুদ

হুদুদ আরবী শব্দ। এর এক বচন হচ্ছে হদ। যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। পরিভাষায় কোন অপরাধের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দন্ডকে হদ বলে। আবার যেসব অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়।

শরীয়তে হুদুদ মাত্র পাঁচটিঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কেরামের এজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদুদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদুদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পুর্বে হোক অথবা পরে। সব দন্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদুদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

হুদুদের শস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্যে থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। আবার হুদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দন্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দন্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈহিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হতে পারে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্যে নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দন্ড দেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, আমি তাওরাতে তাদের প্রতি এটাই ফরজ করেছিলাম যে, প্রানের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের পরিবর্তে চোখ, নাকের পরিবর্তে নাক, কানের পরিবর্তে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট।

■ ডাকাতরূপী সন্ত্রাসীর দন্ড

যারা মানুষের সম্পদ জোর করে অপহরণ করে সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে মানুষের অধিকার ভুলুণ্ঠিত করে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, ইসলামের দৃষ্টিতে এই অপরাধ প্রমাণিত হলে অথবা অপরাধি নিজে এই স্বীকৃতি দিলে তার দন্ড হচ্ছে –

ক) হত্যাকান্ড সংঘটিত করলে হত্যা।
খ) হত্যাকান্ড সংঘটিত করার পর যদি নিহতের সম্পদও অপহরণ করে তাহলে তাদেরকে শুলে চড়ায়ে হত্যা।
গ) রক্তপাত না করে সম্পদ ছিনিয়ে নিলে ডান হাতের সাথে বাম পা অথবা বাম হাতের সাথে ডান পা কর্তন।
ঘ) সন্ত্রাস করে কিন্তু রক্তপাত ও অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়না তাকে নির্বাসন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ সাজার বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু।" [১২]

Dhaka University Institutional Repository

■ চোরের দন্ড

সোয়া গ্রাম স্বর্ণের মূল্যমানের সংরক্ষিত এ সম্পদ যা ইসলামে বিক্রয় বৈধ কোন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি সজ্ঞানে চুরি করলে এবং প্রমাণিত হলে অথবা সে নিজে স্বীকার করলে ইসলামে তার দন্ড হচ্ছে- তার হাত কেটে ফেলা।

এ প্রসংগে কুরআনে বলা হয়েছে, "যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [১৩]

■ ধর্ষণ বা ব্যভিচারের দন্ড

এই অপরাধ সামাজিক ও পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। দুশ্চরিত্রের প্রসার ঘটায় সে জন্য ইসলামে এর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর-করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [১৪]

একশ' বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা

ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চার জন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে, অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে অন্য কোন পথ করে দেন এবং তোমাদের যে পুরুষ এই অপকর্ম করে, তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু।" [১৫]

ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হল। আয়াতদ্বয়ে প্রথমতঃ ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চার জন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্যে গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্যে কষ্ট প্রদান করা উল্লেখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়- ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে।

উল্লেখিত শাস্তিকে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা করা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দন্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে সূরা নুরের উল্লেখিত ২নং আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে একশ' বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে প্রস্ত রাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে।

'রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাব যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সঃ) ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য। যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। [১৬]

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তরঃ উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে; প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ, বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ' করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রসুলুল্লাহ্ (সঃ) উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে; কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা। উল্লেখ্য যে, সমকামীর সাজাও ব্যভিচারীর সমতূল্য।

▪ ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দানকারীর দন্ড

স্বাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই কেউ কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে এবং তারা তা প্রমাণ করতে না পারলে অপবাদ দান কারীর সাজা হচ্ছে আশি বেত্রাঘাত এবং আজীবন কোন কাজে স্বাক্ষ্য দানের অযোগ্য ঘোষনা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান।" [১৭]

"এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর লানত।" [১৮]

"এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" "এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে।" [১৯]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশী কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্বদান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবী। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্যে চার জন্য ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিন জন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চার জনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবীর কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোন মোকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হাঁ তবে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

এখানে শুধুমাত্র মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদের কথা উল্লেখ হলো মূলত পুরুষরাও এর মধ্যে গণ্য। মূলতঃ একজন মুসলিম নর বা নারীর সম্ভ্রমকে ইসলাম কত গুরুত্বপূর্ণ বিচার করেছে এই সাজার ব্যবস্থাই বাস্তব প্রমাণ। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কেউ কারো সম্ভ্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ইসলাম এই সুযোগটুকুও দেয়নি। বরং এই অপবাদ কারীর জন্য কঠোর সাজার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত হারামজাদা বা হারামজাদী এই গালিটিও মূলত আলোচ্যে বিষয়ের জন্য। কেউ কাউকে এই গালি দিলে সে যদি এটা প্রমাণ করতে না পারে যে, আসলেও সে "হারামজাদা", তাহলে অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে এই সাজা তার উপর কার্যকর হওয়া উচিত।

▪ মদ্যপায়ীর দন্ড

যা মাদকতার উদ্রেক করে ইসলামে তা নিষিদ্ধ। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, প্রতিটি মাদক হারাম। অধিকাংশ ফকীহদের নিকট মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে আশি বেত্রাঘাত।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন মদ্যপায়ীকে রাসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত করা হল। তিনি দুটি খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশটি কোড়া মারলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, আবু বকর (রাঃ) ও এমনটি করেছিলেন। ওমর (রাঃ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলেন, সবচেয়ে কম হুদুদ হচ্ছে আশি। এরপর ওমর (রাঃ) আশি কোড়ার নির্দেশ দেন।

এগুলোই ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ অপরাধ যার জন্য নির্ধারিত দন্ড বা হুদুদ প্রবর্তিত হয়েছে।

২. কেসাস

যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কেসাস'। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" [২০]

'কেসাসুন' এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশীকিছু করা জায়েয নয়। সেমতে শরীয়তের পরিভাষায় 'কেসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান হয়।

হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিম্মী, না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকারঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশতঃ। অতএব, হত্যা মোট আট প্রকার (এক) মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (তিন) যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিম্মীকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (সাত) হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং (আট) হরবী কাফেরকে ভ্রমবশতঃ হত্যা।

নিম্নে তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান আলোচনা করা হলো।

প্রথমতঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা

ইচ্ছাকৃত হত্যার সাজা রোমানদের নিকট ছিল সম্ভ্রান্ত হলে নির্বাসন, মধ্যম শ্রেণীর হলে হাতকাটা, আর নিম্ন শ্রেণীর হলে প্রথমতঃ ছিল শূলে চড়ান এরপর তা পরিবর্তন করে হিংস্র পশুর খাচায় প্রবেশ করায়ে হত্যা এবং শেষে তা আবার পরিবর্তন করে ফাঁস লাগায়ে হত্যা করার নিয়মে প্রবর্তিত হয়।

ইসলামে এ ক্ষেত্রে হত্যার পরিবর্তে হত্যা অথবা রক্তপণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। শুধু এই পার্থিব সাজা নয়, আখেরাতেও রয়েছে এজন্য কঠিন সাজা। ইরাশাদ হচ্ছে, 'যে কোন মুমিনকে জেনে বুঝে হত্যা করে তার সাজা হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তার উপর রয়েছে আল্লাহর গজব ও তার অভিশাপ এবং তিনি তার জন্য কঠিন শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।

ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়- 'কেসাস' অর্থাৎ, 'জানের বদলায় জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে, তেমনি কোন ক্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হবে। অনুরূপ স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাস এর দন্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়্যত প্রদান করতে হবে।

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়্যত বা অর্থদন্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট, অথবা এক হাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দেরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দেরহাম সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সেমতে পূর্ণ দিয়্যত এর পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ' তোলা আট মাসা রৌপ্য।

কেসাস এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদন্ড মওকুফ হয়ে দিয়্যত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয়পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও, 'কেসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস' এর অংশ অনুপাতে 'কেসাস' ও দিয়্যত-এর মালিক হবে এবং দিয়্যত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কেসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাস-এর দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়্যত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়্যতের ভাগ পাবে।

'কেসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন অবস্থায় কেসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কেসাস' এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।

কেসাসের শাস্তিও হুদুদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদুদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেসাস এর বিপরীত। কেসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেসাস হিসেবে তাকে মৃত্যুদন্ডও করাতে পারে। জখমের কেসাসও তদ্রূপ। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কেসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দন্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন।

কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকান্ড শুরু হয়ে যাবে-এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

অনিচ্ছাকৃত হত্যা তথা ভ্রমবশতঃ হত্যা

অনিচ্ছাকৃত হত্যা তার শাস্তি হচ্ছে রক্তপণ ও একটি দাস মুক্ত করা অথবা দুই মাস ক্রমাগত সিয়াম পালন করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ্ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" [২১]

প্রথম প্রকার হত্যা অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত প্রকার হত্যা যা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার হত্যা মূলত অনিচ্ছাকৃত বা ভ্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভ্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই নিম্নে অনিচ্ছাকৃত তথা ভ্রমবশতঃ হত্যার বিধান বর্ননা করা হলো।

এ প্রকারের হত্যার মধ্যে গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে এ প্রকারের গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে পঁচিশটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ, শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে। ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজেব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হল, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহর দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তিও এর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তাআলা জানেন এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

- রক্ত বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক।
- রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, মুসলমান ও যিম্মীর রক্ত-বিনিময় সমান।

- কাফফারা অর্থাৎ, ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোজা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজেব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- এখানে প্রশ্ন করা উচিত হেব না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃংখল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।
- কাফফারায় বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।
- নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কোন ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।
- যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই; তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।
- চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিম্মী অথবা অভয়প্রাপ্ত)-এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয়, যখন যিম্মী কিংবা উভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল-এ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিম্মী হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিম্মী বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। নিহত ব্যক্তি যিম্মী না হলে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হবে না।
- কাফফারার রোযায় যদি রোগ-ব্যাধির কারণে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোযা ভাংতে হয় তাতে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হবে না।
- ওযরবশতঃ রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।
- ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফফারা নেই-তওবা করা উচিত।

৩.তাযিরাত

যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাযিরাত' বলা হয়।

ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছ। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্যে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদের তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়ার মতে তাযীরাতে গুনাহ যার জন্য, তার কোন নির্ধারিত দন্ড বা কাফফারাহ নেই। যেমন- রক্ত খাওয়া, মৃত কিছু ভক্ষন করা, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিচারক যাতে এই ধরনের হারাম কাজের প্রচলন বন্ধ হয় সে জন্য যে কোন দৃষ্টান্তমূলক দন্ড দিতে পারেন। মোট কথা এটাই ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামে শাস্তির বিধান। এই বিধান নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীর পক্ষ হতে অনেক অভিযোগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুরতাদের দন্ড

ইসলামে আসার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যাওয়াকে মুরতাদ বলে। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। ইরশাদ হচ্ছে, তোমাদের যে দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করবে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজকর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে। এরা জাহান্নামী এবং চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

সরাসরি ধর্ম ত্যাগের ঘোষনা দিলে অথবা তা থেকে এমন কোন কর্মকান্ড সংঘটিত হলে যা তার ধর্ম ত্যাগের স্পষ্ট প্রমাণের জন্য যথেষ্ট তাকে মুরতাদ বলে গণ্য করা হবে। যেমন হারামকে হালাল বলে ঘোষনা দেয়া, আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)- এর বিরুদ্ধে গালী, নবী হওয়ার দাবী করা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসলামে মুতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'যে তার দ্বীন পরিবর্তন করল তাকে হত্যা কর'

তার জন্য এই কঠোর সাজার বিধান এই কারণে যাতে আল্লাহর এই জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে হালকা ভাবে গ্রহণের সুযোগ না পায়। ইচ্ছা হলে মুসলমান হলাম আবার ইচ্ছা হলে ইসলাম বর্জন করলাম। ইসলামের সাথে এই হাসি-তামাসা কোন ক্রমেই গ্রহনীয় নয়।

বিদ্রোহীর দন্ড

আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করার সুযোগ ইসলামে নেই। মুমিনদের মধ্যে বিভক্ত দুই বা একাধিক দলের যারাই আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালা মেনে না নিয়ে বিদ্রোহ করবে তাদের সাজা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "মুমিনদের দুটি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যের বিভেদ মিটিয়ে দাও এরপর এদের কোন দল যদি অন্য দলের উপর সীমা লংঘন মুলক আচরণ করে তাহলে তারা যতক্ষণ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি ফিরে না আসে ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ কর।" [২২]

বিভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলামী দন্ডবিধি

কিছু জ্ঞানপাপী রয়েছে যারা বাস্তবতাকে উপলব্ধির চেষ্টা করে না। সত্যকে গ্রহণ করার মন-মানসিকতা তাদের নেই। যারে দেখতে নারি তার চলন বাকা বলে বাংলায় একটা প্রবাদ রয়েছে। তাদের অবস্থাও তাই। ইসলামী শাস্তি বিধান যে সমাজে কার্যকর ছিল সেই সমাজ যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পাপমুক্ত সমাজ ছিল ইতিহাস তার বাস্তব স্বাক্ষী। ইসলামী শাস্তি বিধানকে তারা এই বলে অভিযুক্ত করেছে যে,

ক) এ দন্ডবিধি অত্যান্ত কঠোর ও নির্মম।
খ) এ বিধান অতি প্রাচীন। আধুনিক সভ্যতার সাথে এটা মানানসই নয়।
গ) এ দন্ডবিধি অপরাধীর মানষিক অবস্থাকে মূল্যায়ন করে না। শুধুমাত্র দৈহিক শাস্তি দান করে। যা কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল অমুসলিমদের মানব রচিত দন্ডবিধি অপরাধীর প্রতি করুণা করে অসংখ্য জনসাধারণকে নির্মম ও বর্বরোচিত অবস্থায় যে ঠেলে দেয় তাদের দেশের অপরাধ চিত্র তার বাস্তব স্বাক্ষী। হত্যাকারীকে হত্যা না করে তারা তাকে অসংখ্য হত্যা করতে পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। চোরকে হাত না কেটে অসংখ্য লোককে চোরের কাছে জিম্মি বানিয়েছে। বরং চোরকে ডাকাত হওয়ার পথ খুলে দিয়েছে। ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা না করে সমগ্র সমাজকে তারা ধর্ষণকারীদের রাম রাজত্ব

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করছে। আমেরিকার মত সভ্য দেশের অপরাধ চিত্রের দিকে চোখ বুলালে এই বাস্তবতাই ফুটে ওঠে।

এ মুহূর্তে যে বিষয়টি অমীমাংসীত থেকে যায় তা হলো একজন হত্যাকারীকে হত্যা করা কি নির্মম, না তাকে বাঁচিয়ে রেখে অসংখ্য নিরীহকে হত্যা করার সুযোগ করে দেয়া বেশি নির্মম? একজন ব্যভিচারীকে হত্যা করা বেশি নির্মম না তাকে বাঁচিয় রেখে অসংখ্য সতীর সতীত্ব হরণ করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া বেশি নির্মম? উল্লেখ্য যে, চীনের মত দেশ হত্যাদন্ডের বিরুদ্ধে কদিন আগ পর্যন্তও সোচ্চার ছিল কিন্তু তার দেশের অপরাধ আনুপাতিক হারে বর্ধিত হওয়ার কারণে সেও বর্তমানে পুনরায় হত্যা দন্ড চালু করতে বাধ্য হয়েছে। এর পরেও কি ইসলাম বিদ্বেষীদের এই অবান্তর অভিযোগ অপনোদনের প্রয়োজন রয়েছে?

আধুনিকতার ধোয়া তুলে যারা ইসলামী দন্ডবিধিকে এ যুগে অনুপযুক্ত বলে প্রমাদ বকেন তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ইসলাম হচ্ছে চির আধুনিক। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বস্থানের জন্য উপযোগী হচ্ছে এ জীবন ব্যবস্থা। আধুনিক সভ্যতা যে ইসলামেরই অবদান এই শ্বাশত সত্য কি তারা অস্বীকার করবে? তাদের রুচিহীন অশ্লীল, বিশৃংখল, আল্লাহদ্রোহী কার্যক্রম বর্তমানে সন্ত্রাসের যে রাজত্ব কায়েম করেছে, তা জাহেলিয়াত যুগকেও হার মানিয়েছে। এভাবে চললে আমরা নিকট ভবিষ্যতে অন্ধকারে বা অন্ধকার যুগে চলে যাব।

অপরাধীর মানসিক অবস্থার মূল্যায়ন না করে শারীরিক সাজা দানের যে অভিযোগ ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধে উঠেছে তা অযৌক্তিক। কেননা শুধু মাত্র মানষিক দন্ডদানের মাধ্যমে কাউকে অপরাধ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা সফল হয় না। বরং এক্ষেত্রে দৈহিক ও মানষিক সাজার সমন্বয় হচ্ছে সবচেয় ফল দায়ক। যে কারণে যারা ইসলামের দৈহিক সাজার কঠোর সমালোচক ছিল তারাই তাদের সংবিধানে দৈহিক সাজার প্রবর্তন করেছে। সুতরাং ইসলামী দন্ডবিধিকে কেন্দ্র করে যেসব বিভ্রান্তি ও সমালোচনার উৎপত্তি হয়েছে এগুলো অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

পরিশেষে বলা যায়, আসলে দন্ড দানের ইসলামী বিধান মতে দশজন চোরের হাত জনসম্মুখে কেটে দেখুন, দশজন ব্যভিচারীকে পাথর মেরে জনসম্মুখে হত্যা করে দেখুন, দশজন হত্যাকারীকে হত্যা করুন দেখবেন সমাজে চোর ব্যভিচারী হত্যাকারী খুঁজে পাবেন না। ইসলাম চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে চায়, আধুনিকতার নামে যে অপরাধীর প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা দেখান হয় তা মূলত অপরাধ প্রবণতাকে আরো সম্প্রসারণ করে। পক্ষান্তরে মহান স্রষ্টা আল্লাহ প্রণীত বাস্তব ধর্মী, নিখুঁত এই ইসলামী দন্ডবিধি কার্যকর করলেই এই সমাজকে অপরাধ মুক্ত সমাজ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তা না করে অপরাধ নির্মূলের যত অত্যাধুনিক টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করি না কেন তাতে কোন কাজ হবে না। এ জমিনে আল্লাহর বিধানই সামঞ্জস্য পূর্ণ। তারই বিধান এখানে সবচেয়ে মানানসই ও ফলদায়ক। সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ বিনির্মাণে তারই বিধান সবচেয়ে কার্যকর।

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন ২৫: ১১-১৪
২. আল কুরআন ২২:১৯-২২
৩. আল কুরআন ৬৭:৬-১০
৪. আল কুরআন ৪০:৭০-৭২
৫. আল কুরআন ২৪: ৫৭
৬. আল কুরআন ৩৯: ৭১-৭২
৭. আল কুরআন ৪: ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৮. আল কুরআন ২২: ৪৫
৯. আল কুরআন ২৯: ৩৬-৪০
১০. আল কুরআন ২৭: ৫৪-৫৮
১১. আল কুরআন ২৮: ৫৮-৫৯
১২. আল কুরআন ৫: ৩৩-৩৪
১৩. আল কুরআন ৫: ৩৮-৩৯
১৪. আল কুরআন ২৪: ২
১৫. আল কুরআন ৪: ১৫-১৬
১৬. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদিস নং- ৬৩৭০, পৃষ্ঠা- ১০০৭
১৭. আল কুরআন ২৪:৪
১৮. আল কুরআন ২৪:৬-৭
১৯. আল কুরআন ২৪: ৮-৯
২০. আল কুরআন ২: ১৭৮-১৭৯
২১. আল কুরআন ৪: ৯২
২২. আল কুরআন ৪৯:৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১১

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মহানবী (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে গোটা আরব ছিলো জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। নিকৃষ্ট ধরনের গোমরাহীতে ছিলো তারা লিপ্ত। সেখানে ছিলো না কোন অনুসরণযোগ্য নিয়ম-নীতি বা আইন-কানুন। ছিলো না কোন জীবন-পদ্ধতি। সেখানে চালু ছিলো এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা। গোটা জাতি, চাপা পড়েছিলো অন্ধকারের এক শক্ত আবরণের নীচে যা ভেদ করে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো প্রবেশ করা ছিলো খুবই দুরূহ। কোনরূপ দ্বীনি বা ধর্মীয় নিয়ম-নীতি থেকেও তারা ছিলো বঞ্চিত। সেখানে চলতো শক্তির দাপট। যদিও শক্তিধর ব্যক্তিরা অবস্থান করতো সত্য থেকে বহুক্রোশ দূরে। আর দুর্বলরা বঞ্চিত হতো ন্যায়-বিচার থেকে, যতই হোক সে সত্যের অতি নিকটবর্তী।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তারা ছিলো এক অদ্ভুত চিন্তার অধিকারী। কল্পনার জগতে ছিলো তাদের বিচরণ। আর এ কল্পনার বশবর্তী হয়েই তারা তৈরী করেছিলো অসংখ্য দেবদেবী ও উপাসনালয়। প্রতিটি উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদের নিকট ধরা দিত খোদার প্রতিভূরূপে। কখনো তারা পাথর খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ করতো এবং বিনয়াবনত হয়ে তার উপাসনা করতো। আবার কখনো তারা পাথর ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারাও তাদের মা'বুদ বা উপাস্য তৈরী করতো। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি খেজুর দিয়ে একটি মূর্তি তৈরী করেন। ক্ষিধে পেলে তার থেকে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতেন। খোদ কাবাগৃহে তারা তৈরী করেছিল ৩৬০ টি মূর্তি। এমনকি কা'বার চারদিকে নারী-পুরষ একত্রে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করাকে তারা অশেষ পূণ্যের কাজ বলে মনে করতো। এ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে ধর্মীয় দিক থেকে আরবরা গোমরাহীর কতটা অতলে নিমজ্জিত ছিল।

রাজনৈতিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সত্য ও সঠিক চিন্তার সাথে তাদের কোন সম্পর্কও ছিলো না। বাপ- দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রীতি-নীতিকেই তারা অনুসরণ করতো। তারা ছিলো চরম জিঘাংসা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিশোধ স্পৃহা তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, কথায় কথায় এক গোত্র অপর গোত্রের ওপর হামলা করে বসতো, লুটতরাজ চালাতো। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়তো। ব্যক্তিগত বা সামাজিক বন্ধনের কোন গুরুত্ব তাদের নিকট ছিলো না। মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো তাদের চালিকা শক্তি। লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত পুতে ফেলতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতো না।

প্রতিশোধ স্পৃহা ও হত্যার নেশা যখন তাদেরকে পেয়ে বসতো মূল্যবান জীবনগুলো তখন তাদের নিকট অতি তুচ্ছ মনে হতো। অবস্থা যখন এতটা নাজুক পর্যায় অতিক্রম করছিল এবং গোটা বিশ্ব যখন প্রতীক্ষা করছিলো এক মহান সংস্কারকের, তখনই স্রষ্টার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপ নিল। তিনি পাঠালেন মক্কায় মরু-বিয়াবানে এক আহ্বানকারীকে। যিনি ডাক দিলেন আরব-অনারব নির্বিশেষে গোটা মানবজাতিকে। আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি অধিষ্ঠিত করলেন ধ্বংসোন্মুখ মানবতাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে। তিনি মুক্ত করলেন মানব জাতিকে শিরক ও পৌত্তলিকতার ঘৃণ্য অভিশাপ থেকে। অবসান ঘটালেন যাবতীয় কুসংস্কারের। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এমন এক ইনসাফপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা, সেখানে ধনী-নির্ধন, আমীর-গরীব আর আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কোন পার্থক্য ছিলো না। সেই বিচার ব্যবস্থার অধীনে যালিমকে পেতে হতো তার যুলুমের শাস্তি। আর মযলুম সুবিচার পেয়ে লাভ করতো মানসিক শান্তি।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা এবং গুরুত্ব

যে ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী ফায়সালা বা মিমাংসা করা যায়, তা-ই ইসলামী বিচার ব্যবস্থা।

বিচার ব্যবস্থা কতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কুরআন, সুন্নাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদিই তার স্বাক্ষী। গোটা মুসলিম জাতি এর আবশ্যকতা সম্পর্কে একমত। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিচার কায়েম করা ফরজে কিফায়া।

বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে আল কুরআনের ভাষ্য

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু স্রষ্টা সুতরাং সৃষ্টি তার হুকুমেই চলবে। সৃষ্টি ও অন্যান্য কার্যক্রমে যেমন কেউ তার শরীক নেই, তেমনি হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রেও কাউকে তিনি শরীক করেন না। আল্লাহতায়ালা বলেন, "শুনে নাও, সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই, আর তিনিই একমাত্র হুকুম দেয়ার মালিক।" [১]

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলতে পারে না। তিনি তাঁর হুকুমে অপর কাউকে শরীক করেন না।" [২]

নবী, আল্লাহতায়ালা ও আলেমদের নীতি ছিলো আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক বিচার-ফায়সালা করা, কেননা তাঁরা ছিলেন আল্লাহর কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আল্লাহতায়ালা বলেন, "আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিলো পথ নির্দেশ ও আলো। আল্লাহর অনুগত নবীগণ, অনুরূপভাবে রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) এবং আহবার (আলেমগণ) এরই ভিত্তিতে ইয়াহুদীদের যাবতীয় বিষয়ের বিচার-ফয়সালা করতো, কেননা তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এবং তারা ছিলো তদারকীর কাজে নিয়োজিত। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করো না। আমাকে ভয় কর।" [৩]

বিচাররর ক্ষেত্রে কারো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা যাবে না

হযরত দাউদ (আঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, "হে দাউদ, আমি তোমাকে যমীনের বুকে খলীফা নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়সালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" [৪]

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিও নির্দেশ ছিল, যেন তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী মানুষের যাবতীয় বিরোধ মীমাংসা করেন। আল্লাহ বলেন, "আমি তোমার প্রতি সত্য গ্রন্থ নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।" [৫]

আরো বলা হলো, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে উপেক্ষা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটা অবাধ্যতার শামিল, আর আল্লাহর ফায়সালাই সর্বোত্তম। এরশাদ হচ্ছে, " আর আমি আদেশ করছি যে, তুমি তাদের পাস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা কর, তাদের প্রবৃত্তির অনুস্মরণ করো না, এবং তাদের থেকে সতর্ক থেকো যেন তারা তোমাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে নাও আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি তাদের কৃত পাপের শাস্তি দিয়েই ছাড়বেন। আর লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নাফরমান। তারা কি জাহেলী যুগের বিচার ফায়সালা কামনা করে অথচ মুমিনদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী কে হতে পারে? [৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিচার -ব্যবস্থা একটি আমানত

বিচার-ফায়সালা একটি অন্যতম আমানত। তাই সত্য ও ন্যায়পরায়ণতাকেই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, " হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার প্রাপকদের নিকট পৌছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফায়সালা করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন। [৭]

আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুসারে ফায়সালা করতে হবে

মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং দায়িত্বশীল বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের হুকুম মেনে চলে, আর নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তারা যেন আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের এটাই দাবী। আর এতেই রয়েছে কল্যাণ ও সুন্দর পরিণতি। আল্লাহতায়ালা বলেন, " হে ঈমাণদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের আর সে সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এরপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা (নিষ্পত্তির জন্য) আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম। [৮]

আরো আদেশ করা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। কারো খেয়াল-খুশীর অনুস্মরণ করা যাবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, " হে নবী! অতঃপর আমি তোমাকে একটি সুস্পষ্ট শরীয়তের (দ্বীনি পথ) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি এ শরীয়ত মেনে চল এবং অজ্ঞ লোকদের খেয়াল -খুশির অনুসরণ করো না।" [৯]

" তোমরা অনুসরণ কর যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না।" [১০]

মুমিনগণ তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর রাসূলকেই (সাঃ) ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে এবং তিনি যে ফায়সালা দেবেন সন্তুষ্ট চিত্তে তার সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেবে। এরশাদ হচ্ছে, " না, (হে মুহাম্মদ) তোমার রবের কসম, তারা কখনো মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের সকল বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকেই একমাত্র ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয় এবং তোমার দেয়া ফায়সালা সম্পর্কে অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় পোষণ না করে বরং সন্তুষ্টচিত্তে তোমার দেয়া ফায়সালা মেনে নেয়।" [১১]

যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার দিকে আহবান করা হয় তখন তার সামনে শুধু একটি পথই খোলা থাকে। আর তাহলো উক্ত আহবানে সাড়া দিয়ে আনুগত্যের প্রতি মস্তক অবনত করে দেয়া। এটাই হলো সফলতার পথ। আল্লাহতায়ালা বলেন, "মুমিনদের কাজই হচ্ছে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে দেয়ার জন্য, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এ ধরনের লোকেরাই হবে সফলকাম।" [১২]

আল্লাহ-প্রদত্ত শরীয়তই হবে ফায়সালা বা মীমাংসার ভিত্তি। তা না করা হলে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ হুমকী ও কঠোর সতর্কবাণী। কুরআন এসে কুফর, যুলুম এবং নাফরমানী বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, " যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা কাফির।" [১৩] যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা যালিম। " [১৪] " যারা আল্লাহ-প্রদত্ত আইন মুতাবিক বিচার-ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক।" [১৫]

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে ইমানের দাবী করা হবে, অপরদিকে উপেক্ষা করা হবে আল্লাহ ও রাসুলের আইনকে- কুরআন কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, "(হে নবী) তুমি কি তাদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি, যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। তারা নিজেদের বিভিন্ন বিরোধপূর্ন বিষয়ে ফায়সালার জন্য তাগুতের দিকে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিল তাগুতকে অস্বীকার করার। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দুরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।"[১৬]

"যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়।"[১৭]

বিচার হতে হবে ইনসাফ-ভিত্তিক

বিচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে তা হচ্ছে আদল ও কিস্ত অর্থাৎ ন্যায় ও সুবিচার। যেমন, " হে ঈমানদানগণ, তোমরা ইনসাফের উপর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক ও আল্লাহার স্বাক্ষী হয়ে যাও, যদি তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়।"[১৮]

"আর যদি বিচার ফায়সালা কর তাহলে ন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন।" [১৯]

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় স্বাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়গত শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায় থেকে বিরত না রাখে। সুবিচার কর, এটাই খোদাভীতির অধিকতর নিকটবর্তী।"[২০]

"আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"[২১]

সুন্নাহর আলোকে বিচার-ব্যবস্থা

বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করা যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে চলা অপরিহার্য। রাসুলকে অমান্য করা মানেই আল্লাহকে অমান্য করা। আমীর বা নেতার আনুগত্য রাসুলের আনুগত্যের শামিল।

নবী' করীম (সাঃ) বলেন, " যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। যে আমার নাফরমানী করলো, সে আল্লাহর নাফরমানী করলো। যে আমীরের আদেশ অমান্য করলো সে যেন আমার নাফরমানী করলো।"[২২]

শরীয়াতের ফায়সালা মনপুত হোক বা না হোক তা মেনে নেয়া মুমিনদের জন্য অপরিহার্য। নবী করীম (সাঃ) বলেন, " শরীয়তের নির্দেশ শুনা ও আনুগত্য করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য, তা পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ না কোন অন্যায়ের আদেশ করা হয়। যদি অন্যায়ের আদেশ করা হয়, তবে তা শুনা ও মানা যাবে না।"[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

নবুওয়ত যুগে বিচার-ব্যবস্থা

নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং রায় প্রদান করেন। যেমন হযরত হামযা (রাঃ) এর কন্যার লালন-পালনের ব্যাপারে হযরত আলী, হযরত জা'ফর ও হযরত যায়েদ (রাঃ) এর মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে পেশ করা হল। তিনি তিন জনেরই দাবী এবং দাবীর সপক্ষে যুক্তিসমূহ শ্রবণ করলেন। অতঃপর এই বলে জা'ফরের পক্ষে রায় দিলেন যে, "খালা মায়ের সমতুল্য।"

আরদ বিন যাম'আ ও হযরত সা'দ (রাঃ) এর মধ্যে বংশ পরিচয় প্রমাণের এক মোকদ্দমা পেশ করা হলে নবী করীম (সাঃ) " বিছানা যার সন্তান তার, ব্যভিচারীর শাস্তি পাথর।"-- এই বলে আরদ বিন্ যাম'আর পক্ষে রায় দেন। [২৪]

একবার হযরত যোবায়ের (রাঃ) এবং এক আনসারীর মধ্যে পানি নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। নবী করীম (রাঃ) তার মীমাংসা করে দেন।

হযরত বারা'আ ইবনে আযেব ও জনৈক আনসারীর মধ্যে চারণভূমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। নবী করীম (সাঃ) তাতে এভাবে ফায়সালা প্রদান করেন যে, ক্ষেতের মালিকের দায়িত্ব হলো সে দিনের বেলা তার ফসলের হেফাযত করবে। আর পশুর মালিকের দায়িত্ব সে রাতের বেলা তার পশু বেঁধে রাখবে।

নবী করীম (সাঃ) কেবল নিজেই বিচার-ফায়সালা করেননি, বরং বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন এলাকার বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) কে তিনি ইয়েমেনের কাজী নিযুক্ত করেন। আলী (রাঃ) স্বীয় অপরিণত বয়সের উল্লেখ করে আপত্তি জানালে তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাকে পথ দেখাবেন। যখন দু'পক্ষ (বাদী-বিবাদী) তোমার সামনে উপস্থিত থাকবে তখন উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোন একজনের পক্ষে রায় দেবে না। কেননা সুষ্ঠু ফায়সালার জন্য এটাই সঠিক পন্থা।

নবী করীম (সাঃ) হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে যখন ইয়েমেনের শাসনকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত করেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন নীতির ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করবে? তিনি জবাব দেন, আমি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রাখবো। যদি তাতে সমাধান খুঁজে না পাই তবে ইজতিহাদ করবো। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুক্তিসংগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ন্যায়বিচার করবো। নবী করীম (সাঃ) মু'আযের বুকের উপর হাত রেখে খুশী হয়ে বলেন, "আল্লাহর শোকর, যিনি তার রাসূলের দূতকে সেই কাজটি করার যোগ্যতা দান করেছেন, যা তার রাসুলের পছন্দনীয়।"

এমনিভাবে নবী করীম (সাঃ) আলী ইবনে হাযরামীকে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্ত করেন। এক দীর্ঘ চিঠিতে তিনি তাঁকে লেখেন, "বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে আলী ইবনে হাযরামী ও তার সাথী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে।

"হে মুসলমানগণ, আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করে চলো, আমি আলী ইবনে হাযরামীকে তোমাদের বিচারক নিযুক্ত করেছি এবং তাকে এ নির্দেশ দিয়েছি, সে যেনো আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং তোমাদের সাথে সদয় আচরণ করে। সব বিষয় নিষ্ঠার সাথে উত্তমরূপে সম্পাদন করে। তোমাদের ও অন্যদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা করে। আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি। যদি সে ন্যায় বিচার করে, ইনসাফের ভিত্তিতে বন্টন করে, দয়া চাওয়া হলে দয়া করে, তাহলে তার আদেশ মানবে, তার কথা শুনবে, উত্তম পন্থায় তার সহযোগিতা করবে। মনে রেখো তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে বড় অধিকার হলো, তোমরা আমার নির্দেশ পালন করবে।"

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সাঃ) কোনো কোনো সাহাবীকে তাঁর উপস্থিতিতেই বিচারকার্য পরিচালনার আদেশ দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল বিচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা। হযরত আমর ইবনুল আস বলেন, একবার দু'ব্যক্তি এসে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করলো। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আমর, এদের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দাও। আমি বললাম, আমার পরিবর্তে আপনি ফায়সালা করে দেওয়াটাই উত্তম হবে। তিনি বললেন, তবুও আমার উপস্থিতিতে তুমিই ফায়সালা করে দাও। আমি বললাম, এতে আমি প্রতিদান পাবো? তিনি বললেন, যদি তোমার রায় সঠিক হয় তবে তুমি দশটি নেকী পাবে। আর সঠিক রায় প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুল হয়ে যায়, তবে তুমি একটি নেকী পাবে।

এমনিভাবে হযরত ওমর ফারুক, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, দাহিয়ায়ে কালবী, আবু মুসা আল আশ'আরী, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবীগণ নবী করীম (সাঃ) এর যুগে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

নবী করীম (সাঃ) এর নিয়ম ছিল, কোন গোত্র ইসলাম গ্রহন করলে সেখানে তিনি একজন সাহাবাকে পাঠিয়ে দিতেন। উক্ত সাহাবী তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের মধ্যে কোন বিবাদ সৃষ্টি হলে ফায়সালা করে দিতেন।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে বিচার-ব্যবস্থা

মহানবী (সাঃ) এর অবর্তমানে খোলাফায়ে রাশেদীন এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে এবং বিচার-ব্যস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বয়ং লোকদের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করেন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিচারকও নিযুক্ত করেন।

তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিককে বাহরাইনের বিচারক নিযুক্ত করেন। এও জানা যায় যে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ) কে বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। অবশ্য এক বছর তাঁর আদালতে কোন মামলা দায়ের হয়নি।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজেও মামলা -মোকদ্দমার ফায়সালা দিয়েছেন এবং আবু মুসা আল আশ'আরী (রাঃ) কে বসরার বিচারক আর আলদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে কুফা নগরীর বিচারক নিযুক্ত করেন।

বিচারকার্য সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) আবু মূসা আল আশ'আরীকে একটি ফরমান পাঠান। ফরমানটি ছিল নিম্নরুপ।

" আল্লাহর বান্দাহ ওমর ইবনুল খাত্তাব আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আবু মূসা আল আশ'আরীর নামে-

আসসালামু আলাইকুম।

অতঃপর বিচার একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও চির অনুসৃত পন্থা। সুতরাং তোমার নিকট কোন মোকদ্দমা পেশ করা হলে ভালোভাবে বিষয়টা বুঝে নেবে। কারণ সত্য প্রকাশ করে কোনো লাভ হয় না যদি বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়। তোমার দরবারে এবং লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে। যাতে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের আশা না করে এবং কোন দুর্বল শক্তি তোমার সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা না করে। কোন অসহায় যেনো তোমার ভয়ে ভীত না হয়। ফরিয়াদীর ওপর প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারী আসামীর জন্য শপথ গ্রহণই যথেষ্ট। মুসলমানদের আপোষ মীমাংসা বৈধ। কিন্তু এমন মীমাংসা নয় যা বৈধকে অবৈধ

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং অবৈধকে বৈধ করে। গতকাল যে বিষয়ে তুমি বিচার করেছ তার পুনর্বিচারে কোন দোষ নেই। আজ আবার নতুন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যদি তুমি সত্যে উপনীত হও তাহলে নির্দ্বিধায় সত্যের দিকে ফিরে যেতে পার। কারণ সত্যই শাশ্বত। কোন বস্তুই তাকে বাতিল করতে পারে না। মনে রেখ, মিথ্যাকে আঁকড়ে থাকার চেয়ে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই অধিক শ্রেয়।

যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোন দিক নির্দেশনা নেই এবং তোমার অন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে থাকে সে বিষয়ে ভাল করে বুদ্ধি খাটাও এবং চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাও, অতঃপর জেনে নাও কুরআন-হাদিসে অনুরূপ কোন দৃষ্টান্ত মেলে কিনা। অতঃপর বিষয়টিকে ঐ দৃষ্টান্তের ওপর অনুমান কর। তারপর, তোমার মতে যে সমাধান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল তা গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি তোমার নিকট এসে দাবী করে যে, তার অবস্থানের সপক্ষে সত্যতা রয়েছে তবে ঐ মুহূর্তে প্রমাণ পেশ করতে সে অক্ষম। এমতাবস্থায়, তাকে এতটুকু অবকাশ দাও যাতে সে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে। ইতিমধ্যে সে যদি প্রমাণ উপস্থিত করে তবে তার ভিত্তিতে সে তার হক আদায় করে নেবে।

অন্যথায় তার বিরুদ্ধে রায় দিতে তোমার কোন অনুবিধা নেই। এতে করে তার আপত্তি পেশ করার কোন সুযোগ থাকে না, বরং তার অদূরদর্শিতাই সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে।

মুসলমানরা ন্যায়পরায়ণ, তাদের একের স্বাক্ষী অপরের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য। অবশ্য শরীয়তের বিধান মত শাস্তিপ্রাপ্ত, মিথ্যা স্বাক্ষ্য দানে অভ্যস্ত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম।

মানুষের গোপন বিষয়গুলোর দায়-দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজের ওপর রেখেছেন। তোমার দায়িত্ব শুধু উপস্থিত প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করা। স্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তিমুলক শপথ ব্যতীত হদ (বিধিবদ্ধ দন্ড) জারী করা যায় না। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদেরকে হদ জারীর কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

(আদালত কক্ষে) ক্রোধ, সংকীর্ণতা ও অস্থিরতা থেকে নিজকে রক্ষা কর। লোকেরা মামলা নিয়ে এলে কষ্ট ও বিরক্তিবোধ করো না। কেননা এটাইতো সত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার স্থান। এ কাজে তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট বিরাট পুরস্কার আর পরকালের উত্তম সঞ্চয়।

নাফে বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যায়েদ ইবনে সাবিতকে বিচারক পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর বেতন নির্ধারণ করেন।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) ও উবাই ইবনে কা'বের মধ্যে একটি বাগান নিয়ে বিরোধ দেয়া দেয়। তাঁরা উভয়ে যায়েদ ইবনে সাবিতের নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর বললেন, " উভয় পক্ষকেই বিচারকের দরবারে হাজির হওয়া জরুরী। যায়েদ ইবনে সাবিত তাঁর জায়গা থেকে সরে গিয়ে হযরত ওমরকে সেখানে বসতে অনুরোধ জানালেন। হযরত ওমর বলেন, " যায়েদ, তুমি তো শুরুতেই অবিচার করলে। তুমি আমাকে আমার সঙ্গীর সাথে বসাও। অতঃপর উভয়ে যায়েদ ইবনে সাবিতের সামনে বসলেন। হযরত উবাই স্বীয় দাবী পেশ করলেন। ওমর (রাঃ) অস্বীকার করলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত হযরত উবাই এর নিকট স্বাক্ষী তলব করলেন। তিনি বললেন, আমার কোন স্বাক্ষী নেই। হযরত যায়েদ ওমর (রাঃ)কে বললেন, আপনাকে শপথখ করতে হবে। অতঃপর হযরত উবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উবাই, আমীরুল মু'মিনীনকে শপতের জন্য বাধ্য করো না। হযরত ওমর (রাঃ) যায়েদ

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সাবিতকে বললেন, তুমি কি সবার মোকদ্দমা এভাবে ফায়সালা কর? তিনি বললেন, না। তাহলে অন্যদের মাঝে যেভাবে ফায়সালা কর আমাদের মধ্যেও অনুরূপভাবে ফায়সালা কর। তখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত ওমর (রাঃ) কে শপথ করার আদেশ দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সেই আল্লাহর কসম যার মালিকানায় আমার প্রাণ, এ বাগানে উবাই এর কোন অধিকার নেই। এভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রাঃ) একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেন যা বিচারকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি উত্তম উদাহরণ। উক্তিটি হলো, " যায়েদ ততক্ষণ বিচারক পদের যোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ না ওমর ও একজন সাধারণ মুসলমান তার দৃষ্টিতে সমান বলে বিবেচিত হয়। "

হযরত উসমান (রাঃ) এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে বিচার-ব্যবস্থারও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। উসমান (রাঃ) নিজেও মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, যখন দু'পক্ষ তাঁর নিকট কোন মোকদ্দমা দায়ের করতো, তখন এক পক্ষকে তিনি বলতেন," যাও হযরত আলীকে ডেকে নিয়ে এসো। আর দ্বিতীয় পক্ষকে পাঠাতেন হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আউয়াম ও আবদুর রহমান ইবনে আউফকে ডেকে আনার জন্য। সবাই উপস্থিত হবার পর উভয় পক্ষকে তাদের নিক নিজ বক্তব্য পেশ করতে বলতেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর হযরত উসমান (রাঃ) উপরোক্ত সাহাবীদের মতামত জানতে চাইতেন। তাঁদের রায়ের সাথে উসমান (রাঃ) একমত হতে পারলে তদানুযায়ী ফায়সালা করে দিতেন। অন্যথায় পুনর্বিচারের জন্য স্থগিত রাখতেন। এ ছাড়াও হযরত শুরাইহ্ কে তিনি কুফা নগরীর বিচারক হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

হযরত আলী (রাঃ) স্বয়ং বহু মোকদ্দমায় ফায়সালা প্রদান করেন। মূলতঃ বিচারকার্যে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন এক বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সব চাইতে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, 'আলী না হলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেতো।'

তাঁর আমলেও বিভিন্ন এলাকার বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে তিনি বসরার বিচারক নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া কাজী শুরাইহ্ এর আদালতে হাজির হয়ে এক ইহুদী হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা এবং এক মামলায় কাজী শুরাইহ কর্তৃক আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী বিরুদ্ধে ইহুদীর পক্ষে রায় প্রদানের ঘটনাটি সর্বজনবিদিত।

প্রকৃত অর্থে মহানবী (সাঃ) এর বাণীসমূহ, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে স্বয়ং তাঁর ফায়সালা প্রদান, বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্তকরণ এবং এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের পদক্ষেপ গ্রহণ বিচার-ব্যবস্থার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং এর শারয়ী মর্যাদার সুস্পষ্ট দলীল।

বিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধির রায়

মানব প্রকৃতিতে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রবণতা বিদ্যমান। কোন বস্তু যদি কারো নিকট পছন্দনীয় বা লোভনীয় হয়, সে তা লাভ করার চেষ্টা করে। যদি অপর কোন ব্যক্তিও উক্ত বস্তুটি লাভ করার আকাংখা পোষণ করে তখনি দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশ্বস্রষ্টা ক্ষমতা ও অধিকার নির্ধারণ করার সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষ জন্মগত ভাবে স্বাধীনতাপ্রিয়। দায়িত্ব পালন থেকে সে মুক্ত থাকতে চায়। এ স্বাধীনচেতা মানুষ যদি নির্ধারিত সীমার হেফাযত না করে, একে অন্যের অধিকার আদায়ে ব্রতী না হয়, নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে বিশ্ব-মানব কিছুতেই শান্তির মুখ দেখতে পারে না। এ মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজন যেন কোথাও ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়। অথচ মানুষের স্বভাবে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতাই বিপর্যয়ের মুল কারণ। বিপর্যয় রোধ করে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে কায়েম রাখার নামই 'আদল' বা সুবিচার। সুতরাং সুবিচার প্রতিষ্ঠা মানব জীবনের এমন একটা অপরিহার্য দিক যা ব্যতীত

Dhaka University Institutional Repository

গত্যন্তর নেই। বিচার ব্যবস্থা সেই বিভাগের নাম যা সুবিচার প্রতিষ্ঠার জিম্মাদার। এ কারণেই বিচার ব্যবস্থা মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত প্রয়োজন যা উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই।

উল্লেখ, মতবিরোধ ও কলহ- বিবাদ যা মানব প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, শুধুমাত্র অসততা বা অসাধুতার কারণে তা সৃষ্টি হবে এমনটা জরুরী নয়। কখনো এমন হয় যে, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তিও কোন বস্তুর ওপর তার অধিকার রয়েছে মনে করে বিরোধে লিপ্ত হয়। আর কখনো কোন অসাধু ও অসৎ প্রকৃতির লোক শুধুমাত্র লোভ কিংবা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কোন বস্তুর ওপর তার অধিকারের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। উভয় অবস্থায়ই এমন একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ ফায়সালার প্রয়োজন দেখা দেয় যা সন্দেহ কিংবা প্রতিহিংসার কারণে সৃষ্ট বিরোধের অবসান ঘটাতে সক্ষম।

শরীয়তের অনেক বিষয় অকাট্য প্রমাণ তথা কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে জানা যায়। আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে যাতে ইজতিহাদ বা গভীর জ্ঞান-গবেষনার অবকাশ থাকে। ইজতিহাদের ফলে মতের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় বিভিন্ন হুকুম কার্যকর করার ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখা দেয়। আবার যেসব কারণে হুকুমটি কার্যকর করা হয় সে সব কারণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় একথাটি সুস্পষ্ট যে, এসব মতবিরোধের অবসান কল্পে একটা সিদ্ধান্তকারী ফায়সালা এবং অকাট্য নির্দেশ অপরিহার্য।

মৌলিকভাবে বিচার-ব্যবস্থার অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট অনস্বীকার্য। যে কোন আকারেই হোক, সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাটা এমন একটি কাজ, যে ব্যাপারে সব শরীয়ত একমত। দুনিয়ার যেখানেই মানববসতি রয়েছে, এমনকি সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত উপজাতিগুলোও কোন না কোন আকারে নিজেদের মধ্যে বিচার-ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

যেহেতু এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির অপরিহার্য একটি দিক, তাই গোটা মানব বিশ্বে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের জীবনে বিশেষ করে তাদের সামাজিক সমস্যাবলীর মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার সমাধান একমাত্র কাজীর বিচারের মাধ্যমেই হতে পারে। যেমন কোথাও বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার কারণ প্রকাশ পেলো অথবা বিয়ের পর উভয়ের মধ্যে দুধপানজনিত সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেল। আর উভয় অবস্থায়ই স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে রাজী নয়, অথবা স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্কা হিসেবে স্বাধীন মতামতের অধিকার প্রয়োগ করতে চায়।

এসব ক্ষেত্রে কাজীর ফায়সালা ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা নেই। অন্যথায় গোটা সমাজ অবৈধ কর্মকান্ড ও নিকৃষ্ট পাপের আবাসস্থলে পরিণত হবে। এমনকি এমতাবস্থায় বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ব্যতীত শরীয়ত প্রতিষ্ঠাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতএব, কুরআন, সুন্নাহ, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামী বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য।

পরিশেষে বলা যায়, মূলত ইসলামী বিচার-ব্যবস্থা একমাত্র কল্যাণকর ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য এ ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। এটা কোন থিওরী সর্বস্ব ব্যবস্থা নয়। নবী করীম (সাঃ) মদীনায় একটি ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র কায়েম করার পর পরই ইসলামী বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং তৎকালীন জাহেলী যুগেও একটি সুশীল ও অপরাধমুক্ত সমাজ উপহার দেন। পরবর্তীকালে আব্বাসীয় ও উমাইয়া খলীফাগণসহ অধিকাংশ মুসলিম শাসক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে পরিবর্তন সাধন করলেও ইসলামী বিচার-ব্যস্থা অক্ষুন্ন রাখেন, কয়েক শ' বছর আগেও মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

রাজা-বাদশাহগণ ভারতবর্ষ জয় করার পর ভারতবর্ষেও ইসলামী বিচার-ব্যস্থা প্রবর্তন করেন এবং প্রায় ছয়শ' বছর পর্যন্ত ইসলামী বিচার-ব্যবস্থা এখানে কায়েম ছিল।

এমনকি মুসলমান সম্রাটদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার ইংরেজ জাতি হস্তগত করার সাথে সাথেই ইসলামী বিচার-ব্যবস্থার কার্যকারিতা ভারতবর্ষ থেকে শেষ হয়ে যায়নি। বরং প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত সংশোধিত আকারে হলেও ইংরেজরা এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু রেখেছিল। উইলসনের মতে, বিভিন্ন রেগুলেশন জারীর মাধ্যমে ইসলামী বিচার-ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ইংরেজদের বিচার-ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা হলেও ১৮৬২ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি ও ১৮৭২ সালে সাক্ষ্য আইন চালু করার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী আইনের উপাদান বিচার-ব্যবস্থায় অবশিষ্ট ছিল।

অতএব, বলা যায়, বর্তমান অশান্ত ও অপরাধপ্রবণ বাংলাদেশেও যদি ইসলামী বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, তাহলে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও অপরাধের হার যে বহুলাংশে হ্রাস পাবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন ৭: ৫৩
২. আল কুরআন ১৮: ২৬
৩. আল কুরআন ৫: ৪৪
৪. আল কুরআন ৩৮: ২৬
৫. আল কুরআন ৫: ৪৮
৬. আল কুরআন ৫: ৪৯
৭. আল কুরআন ৪: ৫৮
৮. আল কুরআন ৪: ৫৯
৯. আল কুরআন ৪৫: ১৮
১০. আল কুরআন ৭: ৩
১১. আল কুরআন ৪: ৬৫
১২. আল কুরআন ২৪: ৫১
১৩. আল কুরআন ৫: ৪৪
১৪. আল কুরআন ৫: ৪৫
১৫. আল কুরআন ৫: ৪৭
১৬. আল কুরআন ৪: ৬০
১৭. আল কুরআন ২৪: ৪৮
১৮. আল কুরআন ৪: ১৩৫
১৯. আল কুরআন ৫: ৪২
২০. আল কুরআন ৫: ৮
২১. আল কুরআন ৫৭: ২৫
২২. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৬৫২, পৃষ্ঠা- ১০৫২
২৩. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৬৫৯, পৃষ্ঠা- ১০৫৪
২৪. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৩৬১, পৃষ্ঠা- ১০০৬ এবং হাদীস নং- ৬৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১০৬০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১২

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর যুগে সন্ত্রাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জন্মের পূর্বে জাহেলিয়াত কালের সামাজিক চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলেই গা শিউরে উঠে। যখন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি এবং ছিনতাই ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যেখানে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিতে সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেজে উঠত যুদ্ধের দামামা। সেই সমাজেই আগমন করেছেলেন মহানবী (সাঃ)। তিনি সামগ্রিক কলহের মূলোচ্ছেদ করে উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বকে একটি সোনালী সমাজ। ফলে যারা মনুষ্য রক্ত দিয়ে অবগাহন করত, দিনান্তে তারাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ হলো রাসূল (সাঃ)-এর উত্তম আদর্শ ও পুণ্যময় সান্নিধ্যের পরশে। যার ফলে সর্বোত্তম আদর্শ রূপে গড়ে উঠেছিল তাঁদের জীবন। মহানবী (সঃ) বলেছেন, আমি প্রেরিত হয়েছি চারিত্রিক উৎকর্ষের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য। সুতরাং সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব স্থাপনে মহানবীর আদর্শই অনুসরণ করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অসামান্য প্রচেষ্টা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে সমাজ থেকে সকল প্রকার সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মদ্যপান, হত্যা, রাহাজানি প্রতিরোধ করে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

If all the world was united under one leader. Then muhammad (S.M) would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds. dog mas and ideas to peace and happiness.'যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হতো, তবে একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা করতে পারতেন।' [১]

সত্য কথা বলতে কী, নবী (সাঃ)-এর সার্বিক অবদান বিশ্ববাসীর নিকট অনস্বীকার্য বিধায় সন্ত্রাস প্রতিরোধে তাঁর অবদান ছিল বিরল।

সন্ত্রাস প্রসংগে "হযরত আবু মুসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল (সঃ) বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। [২]

সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমনের লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রথম সংগঠন হিলফুল ফুযুল

আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে সন্ত্রাস দমন করার লক্ষ্যে কৈশোরেই নিজ উদ্দ্যেগে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) হিলফুল ফুযুল বা শান্তি সংগঠন গঠন করেন। যার প্রধান লক্ষ্যে ছিলঃ

- মযলুম মানবতার সেবা করা
- দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার দমন করা
- সমাজ ও দেশের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা
- সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা
- সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা

Dhaka University Institutional Repository

- অত্যাচারী ও অত্যাচারের হস্ত হতে জনগণকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করা
- প্রতি কার্যের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সঃ) কে মান্য করা

হিলফুল ফুযুলের উক্ত পদক্ষেপগুলো সন্ত্রাস দমনে সফল ভূমিকা রেখেছিল বলে আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় এটাই ছিল সর্বপ্রথম সন্ত্রাস দমনে কল্যাণময়ী সেবা সংঘ। প্রাথমিকভাবে সমাজের সাধারণ মানুষকে সন্ত্রাসের বিভীষিকাময় যন্ত্রনা থেকে রেহাই দিতে এ কমিটির অবদান ছিল অবিস্মরণীয়।

সন্ত্রাস নিরসনে প্রথম প্রমাণ হাজরে আসওয়াদ প্রতিষ্ঠা

হিলফুল ফুযুল গঠনের পর থেকে সন্ত্রাসীদের তৎপরতা অনেকটা হ্রাস পায়। ৬০৫ খৃস্টাব্দে কাবা গৃহ সংস্কারের সূত্র ধরে মক্কাবাসী হাজরে আসওয়াদকে কেন্দ্র করে এক তুমুল সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। গোত্রপতিগণ এই মর্মে শপথ করল যে, প্রয়োজনে আমরা নিজেদের জান উৎসর্গ করবো, তবু এই কৃষ্ণ প্রস্তর অন্য কোন গোত্রকে সংস্থাপন করতে দেব না। কুরাইশদের বর্ষীয়ান নেতা আবু উমাইয়া বিন মুগিরা স্বজাতিকে এই আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য বললেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল প্রত্যুষে সর্বপ্রথম কাবা চত্বরে প্রবেশ করবেন তিনিই এ ঝগড়ার মীমাংসা করবেন। সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং উদ্বিগ্ন হৃদয়ে আগন্তুকের অপেক্ষায় কাবার দরজার প্রতি লক্ষ্য রাখল। ভোর হতে না হতেই দেখা গেল সকলের আগে এসেছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। তাঁকে দেখেই অস্ফুটে সকলের মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো, এই তো মোদের আল-আমীন, এই তো মোদের বিশ্বাসী। এর পরেই সকলের মন সুপ্রসন্ন হয়। কবির ভাষায়,

সকল গোষ্ঠী উঠে আনন্দে চিৎকারি
সম্মত তবে মানিতে সালিস আমীন এ ব্রতচারী।

রাসূল (সঃ) সকল গোত্রের দলপতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে জাতিকে হিফাযত করেন। এ ঘটনাটিকে 'ওয়াকিয়া ই তাহকীম' বলা হয়। এ-তো ছিল নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপক প্রস্তুতি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ায় জেনেশুনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরাতো মীমাংসার পথ অবলম্বন করছি। সাবধান! নিশ্চয় এরাই সন্ত্রাস তথা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী। অথচ তারা এ ব্যাপারে উপলব্ধি করতে পারছে না।"[৩]

তাইতো দেখা যায়, মহানবী (সঃ) আল্লাহর নির্দেশিত পথে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদেরকে অন্যায়-অত্যাচার পরিহার করে চির সত্য ধর্ম ইসলামের শাশ্বতবাণীর দিকে আহবান করতে লাগলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। তারা শুরু করে মহানবীর (সঃ) ওপর নানা প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন। কিন্তু রাসূল (সঃ) তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জবাব সন্ত্রাস দ্বারা না দিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য, সাহসিকতা ও জিহাদের মাধ্যমেই দিয়েছিলেন।

অন্যায়ভাবে অস্ত্র ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে এবং প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়"।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক হাদীসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, হুযুর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেমন তার ভাইয়ের প্রতি কোন ধারালো অস্ত্র প্রদর্শন করে তখন ফিরিস্তাগণ তার প্রতি অভিসম্পাত দিতে থাকেন, যতক্ষণ না সে তার অস্ত্র গুটিয়ে নেয়, যদিও সে তার সহোদর ভাই।

হিজরত সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশল

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবেই হিজরত বা অভিবাসনের প্রসংগটাও এসে পড়ে। কেননা বিবদমান গোষ্ঠী সমূহের সাথে আচরণ ও তাদের পরস্পরিক উত্তেজনা প্রশমনে ওটা একটা উপায় ও বিকল্প। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় হিজরত দ্বারা মূলত জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর এটা সংঘটিত হয় তখনি, যখন জন্মভূমির সাথে সংশ্লিষ্টিতা বা তার প্রতি আসক্তি ও আকর্ষণ কমে যায় বা ফুরিয়ে যায়, অথবা প্রচারক ও নিপীড়িতদের ওপর নির্যাতন, যুলুম, আগ্রাসন ও সংঘাতের মাত্রা এত বেড়ে যায় যে, তাদের পক্ষে সহ্য করা আর সম্ভব হয়না। এ হিজরত পর্যটন বা অর্থনৈতিক হিজরত থেকে আলাদা জিনিস। যা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সংঘটিত হয়ে থাকে, আর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগী ও স্বার্থের নীরিখেই তার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

এ প্রসংগেই রসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যেই হয়েছে। আর যার হিজরত সংগটিত হয়েছে কোন পার্থিব স্বার্থের তাগিদে বা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশে, তার হিজরতও সে উদ্দেশেই হয়েছে।" [৫]

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হিজরত কখনো কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এটা মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে হয়ে থাকে। এটা সংঘটিত হয় নির্যাতন ও নিপীড়ন যখন ধৈর্য্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং মজলুম ব্যক্তির পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। এটা পলায়নী হিজরত। যখন কোন নিরীহ ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এর শিকার হয়, তাকে রক্ষা করা বা সাহায্য করার মত কেউ থাকেনা, এবং সেই অত্যাচার প্রতিহত করার শক্তি ও কৌশল কোনটাই তার আয়ত্বে থাকনো, তখন ইসলামও হিজরত করার নির্দেশ দেয়। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দরুন নিপীড়নের শিকার ব্যক্তিবর্গের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। আশঙ্কা দেখা দেয় তাদের মানবাধিকার, মানবীয় স্বাধীনতা ও সম্মান ক্ষুণ্ন হবার।

আল্লাহ বলেন, "ফেরেশতারা তাদেরকে এমন অবস্থায় প্রাণ সংহার করবে যে, তারা নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেলেছে। তাদেরকে ফেরেশতারা বলবে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, 'আমরা পৃথিবীতে খুবই দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহর প্রথিবী কি এতটা প্রশস্থ ছিলনা যে, তোমরা সেখানে হিজরত করতে পারতে? বস্তুত তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, এবং তা প্রত্যাবর্তন স্থল হিসাবে খুবই খারাপ। তবে সেই সব দুর্বল পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুর কথা আলাদা, যাদের কোন কৌশলও আয়ত্বে নেই এবং কোন বিকল্প পথেরও সন্ধান পায় না। [৬]

এ ধরনের হিজরত যদিও আত্মরক্ষামূলক, কিন্তু ধর্ম, জীবন, ও মানবাধিকার রক্ষার্থে কখনো কখনো এটা ইসলামের দাবীতে পরিণত হয়ে থাকে। অধিকারের প্রতি উদাসিনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন এবং সংস্কার সংশোধন ও অত্যাচার প্রতিরোধের চেষ্টা থেকে পিচটান দেয়া কখনো হিজরতের উদ্দেশ্য হওয়া চাই না। কখনো কখনো স্বদেশে অনুকূল পরিস্থিতিতে হিজরত জালেম ও স্বৈরাচারী নিপীড়কদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মজলুমদের প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অত্যাচারীদের প্রতাপ ও দৌরাত্ম্যের প্রভাবাধীন এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপাততঃ নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পাওয়া, ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রোধ করা, সম্ভাব্য সুদিন ফিরে আসা ও অপেক্ষাকৃত উত্তম পরিবেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ

Dhaka University Institutional Repository

চূড়ান্ত পর্যায়ে যুলুমের অবসান ঘটানো ও সত্যের জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের হিজরতের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এ ধরনের হিজরত বর্তমানে প্রচলিত রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের নিকটতম অবস্থা। মক্কার মুসলমানদের ওপর কোরাইশ নেতাদের পক্ষ থেকে নির্যাতন পরিচালনার পর্যায়ে হাবশা অভিমুখে মুসলমানরা প্রথম ও দ্বিতীয়বার যে হিজরত করে, সেটাও ছিল এ ধরনের হিজরত। মোশরেক নেতা ও মোশরেক জনতার অধিকাংশ তখন অনুভব করেছিল যে, মুসলমানরা ও তাদের পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন তাদের স্বার্থ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীবন ব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে তাদের প্রতি মোশরেকদের মমত্ববোধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের ওপর নানা রকমের নিষ্ঠুর নির্যাতন পরিচালনায় প্ররোচিত হয়।

আবার কখনো কখনো হিজরত চিরতরে জন্মভূমি ত্যাগের নামান্তর হয়ে থাকে। জন্মভূমিতে পরিচালিত যুলুম নিপীড়ন এবং অধিকার ও স্বাধীনতা হরণের কর্মকান্ডকে বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের বাইরে গিয়ে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহন ও তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করার নিমিত্তে এ ধরনের হিজরত করা হয়। মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরত এ ধরনেরই হিজরত ছিল। মুসলমানরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে তাদেরকে মেনে নেয়ার আর কোনই আশা নেই এবং স্বজাতি সুলভ মমত্ববোধ সহকারে তারা আর কখনো তাদেরকে আপন জন হিসাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবে না। এ কারণেই তারা হিজরত করলেই এবং মদিনাতে তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও কোরাইশ শত্রুদের মোকাবিলার জন্য ঘাঁটি হিসাবে গ্রহণ করেছে।

শেষ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় এল। এ দ্বারা দেশ, জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলো। স্বৈরাচার ও সন্ত্রাসী যুগের অবসান ঘটলো। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এরপর সেই পরিস্থিতি উদ্ভব হলো, যার সম্পর্কে রসূল (সা) বলেছেন, "বিজয়ের পর আর হিজরত থাকবে না। তবে জেহাদের নিয়ত থাকবে।"[৭]

আধুনিক যুগে আমরা বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অহরহ হিজরত করতে দেখে থাকি। তাদের মধ্যে থেকে অনেকে পলায়নী হিজরত করে। আবার কেউ কেউ করে সাময়িক হিজরত। কিন্তু সকলেই যে দেশে আশ্রয় নেয়, সেই দেশের সরকারের মাধ্যমে স্বদেশের সরকারের ওপর তার নিপীড়নমূলক কর্মকান্ডের সীমিত করার জন্য চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। অনুরূপভাবে ঐ সব সংখ্যালঘু ও প্রবাসী সম্প্রদায় নিজ নিজ জনগণের সেবার লক্ষ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে থাকে। এ সব চাঁদার অর্থ দিয়ে তারা তাদের নিজ দেশে নানা ধরনের সংস্কারমূলক ও ত্রাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এইসব সংখ্যালঘু প্রবাসে সংখালঘু হওয়ায় প্রাপ্ত আবাসিক সুবিধা ও সহায় সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে এবং তাদের নিজ দেশে সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও তার সহানুভূতি অর্জনের নীতির আলোকে মোহাজেরদের কর্তব্য হলো, আশ্রয় দাতা দেশে বসবাসকালে ভেতর থেকে সহিংসতা উস্কে দেয়ার চেষ্টা করবে না এবং তার কারণও ঘটাবে না। বরঞ্চ অন্য কেউ উস্কানি দিলে তারা তা প্রতিহত করবে। কিন্তু যারা চিরতরে হিজরত করেছে, তাদের ব্যাপারটা ভিন্নতর। কেননা এ ধরনের হিজরতের ফলে মক্কা ও মদিনার মত বৈরী রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। এ ধরনের বৈরী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসেরই শামিল এবং স্বাধীন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র সমূহের ওপর যে ধরনের নিয়মবিধি প্রযোজ্য, এদের ওপরও অবিকল সেই ধরনের নিয়মবিধি প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী হিজরত কোন অবস্থায়ই আত্মসমর্পণ নয়। অনুরূপভাবে তা অধিকার ও স্বাধীনতার দাবি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ারও নাম নয়। এটা হলো জুলুম প্রতিহত করা, ঈমান রক্ষা করা, মানবাধিকার রক্ষা করা ও দুর্বলদেরকে সাহায্য করার লক্ষ্যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী সাধ্যমত পদক্ষেপ গ্রহণের একটা কৌশল। অনুরূপভাবে, তা আইসংগত পন্থায় ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অথবা প্রয়োজনে ও পরিস্থিতির আনুকুল্য সাপেক্ষে যুদ্ধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সত্যের সংগ্রামের তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা মাধ্যম। তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা এমন দেশ ছাড়া হতে পারেনা যেখানে হিজরতকারী মুসলমানরা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবে এবং তাদের ঈমান, মানবাধিকার ও ইসলাম সম্মত স্বাধীনতাগুলোকে রক্ষা করতে পারবে।

মদীনার হিজরতকে আমরা যদি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, নিজ মাতৃভুমির বাইরের যে দেশটিতে মুসলমানরা হিজরত করে আশ্রয় নেয় প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে, যেখানেই হোক না কেন; সেখানে বর্তমান সময়ে ইসলামের দাওয়াত দিলে ঐ দেশটি তাদের পরিত্যক্ত দারিদ্র পীড়িত বা নির্যাতন-পীড়িত স্বদেশের বিকল্প একটি শান্তি ও আরামের দেশে পরিণত হতে পারে। আশ্রিত দেশে অবস্থানকালে সেখানে ইসলামের দাওয়াত দেয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য। মুসলিম মোহাজের যে দেশেই হিজরত করুক এবং যে অবস্থায়ই থাকুক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে কিছু লোক দাওয়াত গ্রহণ করলে তা নিশ্চিতভাবেই তার সেই দেশের চাইতে উত্তম দেশে পরিণত হবে, যেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে। মোহাজের হিজরতকৃত দেশের জনগণের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হবে এবং তাদেরকে হেদায়াত করার মাধ্যমে তাদের সাহায্য ও ভ্রাতৃত্ব অর্জন করতে পারবে।

হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে (সঃ) সন্ত্রাস দমনের প্রয়োজনে জিহাদের নির্দেশ দেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে, যে পর্যন্ত ফিৎনা সন্ত্রাস দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। [৮]

মদীনার সনদঃ সন্ত্রাস দমনে অভিনব পদক্ষেপ

সন্ত্রাস বন্ধ এবং রাজনৈতিক কৌশল এর অংশ হিসেবে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে মদীনায়। সেখানে তিনি সর্ব প্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তাতেও আমরা সন্ত্রাস দমনের কার্যকরী ব্যবস্থা দেখতে পাই। মহান আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন, "ফিৎনা ফ্যাসাদ তথা সন্ত্রাস হচ্ছে হত্যার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ।" [৯] এ আয়াতের আলোকে রাসূল (সঃ) মদীনায় সন্ত্রাসমুক্ত ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল একটি সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সেখানের মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও মূর্তি উপাসক খৃস্টান, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

তিনি অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতিও অবলম্বন করেন। মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সনদ তৈরী করেন যা বিশ্বের ইতিহাসে মদীনার সনদ বা Charter of madina নামে পরিচিত। এই সনদে ৫৩টি শর্ত ছিল। এর মধ্যে বিশেষত সন্ত্রাস দমনের নিমিত্তে গৃহীত শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

- মদীনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল, এখানে রক্তক্ষয় এবং অন্যায় অনাচার নিষিদ্ধ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

- কোন সম্প্রদায়ই কুরাইশদের কিংবা বাহিরের অন্য শত্রুর সাথে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।
- অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।
- মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ব অনুমতি ছাড়া কেউই কারো বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
- মুসলমান এবং অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

এ সনদ নবী (সঃ)-এর উদারতার এক মহান আদর্শ ও জাতি গঠন প্রণালীর এক প্রশস্ত পন্থা।

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেন-

"It reveals the man (the prophet) in his real greatness a master mind, not only of his ownage but of all agess. মদীনার সনদ শুধু সে যুগের নয় বরং সর্বযুগে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরাট মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। ঐতিহাসিক মুয়ার বলেন, এ মদীনা সনদ রাসূল (সাঃ)-এর প্রকৃত মহত্ত্ব ও উদারতাকে প্রকাশ করে। তিনি শুধু মহানায়কই ছিলেন না, তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসী কাফির মুনাফিকদের হীন কার্যকলাপকে স্বহস্তে কঠোর ভাবে দমন করেছেন। যার দৃষ্টান্ত বদর, ওহুদ, খন্দক সহ প্রভৃতি যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে হৃদয়ঙ্গম করা যায়"। [১০]

কোরান ও হাদীসের আলোকে মোহাম্মদ (সঃ) এর সময়কার সন্ত্রাস দমন ও তাৎপর্য

আমরা যদি নবী যুগের সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগের ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত, হাদীস, নীতিমালা ও উপদেশমালার মাঝে সম্পর্ক খুঁজতে চাই, তাহলে এসব আয়াত ও হাদীসের উপর একটা ব্যাপক, সর্বাত্মক ও সুশৃঙ্খল পর্যালোচনা ও গবেষণা চালানো জরুরি হয়ে পড়ে। যাতে এ ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট নীতিগত দৃষ্টিভংগী গড়ে তুলতে পারি। অনুরূপভাবে আয়াতগুলো ও হাদিসগুলোর মর্মোপলব্ধি ও এই সব জটিল সামাজিক বিষয়গুলোর সাথে ওগুলোর সম্পর্কে উপলব্ধি করার জন্য যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হলো শুধুমাত্র আয়াত ও হাদিসগুলোকে অধ্যয়ন করে ক্ষান্ত থাকা নয়, বরঞ্চ রসুল (সঃ) এর অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

আমরা সবাই জানি যে, রসূল (সঃ) এর সংস্কার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তিক্ত। তিনি প্রাণান্তকর লড়াই এবং অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। লড়াইয়ে এবং সেই সব ধাপ ও স্তর নবী আদর্শকে সুসমন্বিত ও সুশৃংখল করেছে এবং এই সব পটভূমিতে মানানসই করেছে। তারপর এগুলোকে এমন একটা সমন্বিত দৃষ্টিভংগী দিয়েছে, যা নবীর সংস্কার আন্দোলনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার রূপ দিয়েছে। এভাবে এই সুসমন্বিত আয়াত ও হাদিসগুলো মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সমাধান ও সংস্কারমুখী লড়াই পরিচালনা করার সন্ধান দেয়। সন্ধান দেয় জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ও শাসক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সন্ত্রাস নিরসনের শান্তিপূর্ণ উপায়ের। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত ও দলগত পর্যায়ে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ প্রতিরোধে পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার পথ প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন গোলযোগপূর্ণ ও নির্যাতনমূলক অবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য করে।

সর্বপ্রথম যে জিনিসটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে শেষ জামানার গোলযোগপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত হাদীস সমূহ যা "ফেতনার হাদিস" নামে পরিচিত। রসূল (সঃ) তাঁর ওফাতের প্রাক্কালে এগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়ে গেছেন। এ সব হাদিস তিনি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন গোলযোগপূর্ণ ঘটনাবলীতে সশস্ত্র লড়াইতে, সশস্ত্র অবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে। এসব হাদিসে রসূল (সঃ) মদিনায় তাঁর সাহাবীগণকে সেইসব রাজনীতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধান কল্পে সহিংস পন্থা অবলম্বন করতে

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধ করেছেন, যা সমাজের অভ্যন্তরে নেতৃস্থানীয় শীর্ষ ব্যক্তিবর্গের মাঝে সংঘটিত হয়ে থাকে। তিনি বরঞ্চ পরিপূর্ণ আত্মসংযমের নির্দেশ দেন। যদিও তারা প্রতিপক্ষ থেকে আগ্রাসনের শিকার হয়।]

এখানে কোরআনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করছি।

"তুমি তাদেরকে আদমের দুই ছেলের সত্য কাহিনী শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন যখন কোরবানী দিল, তখন তাদের একজনের কাছ থেকে তা গৃহীত হলো। কিন্তু অন্য জনের কাছ থেকে গৃহীত হলো না। সে (যার কুরবানী গৃহীত হলো না) বললো, 'আমি তোমাকে হত্যা করবো।' সে (যার কুরবানী গৃহীত হলো) বললো, 'আল্লাহতো শুধু সংযতদের কাছ থেকে কুরবাণী গ্রহণ করে থাকেন।' তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও। তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই, তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপের দায় ঘাড়ে নাও, অতঃপর দোজখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হও। এটাই হত্যাকারীদের কর্মফল। অতপর তাঁর প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করলো। তাই সে তাকে হত্যা করলো ও ক্ষতিগ্রস্থ হলো।" [১১]

"হে আমার ছেলে, তুমি নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে, তাতে ধৈর্য ধারন কর। এটা হচ্ছে, দৃঢ় সংকল্পের কাজ। [১২]

কোরআনের এই আয়াতগুলোর মতই কতগুলো হাদীসও উদ্ধৃত করছি।

"হযরত উসামা (রা) বলেন, মদিনার একটা টিলার ওপর আবির্ভূত হয়ে হুজুর (সঃ) বললেন, "আমি যা দেখি তা কি তোমরা দেখতে পাও? আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের বাড়ীর ভেতরে এমনভাবে ফেতনা বর্ষিত হচ্ছে, যেভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।" [১৩]

ইমাম বুখারী হযরত আহনাফ বিন কায়েস থেকে বর্ণনা করেন "আমি এই লোকটিকে (সংঘর্ষে লিপ্ত একজনকে) সাহায্য করতে রওনা হলাম। সহসা আবু বকরের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, 'অমুককে সাহায্য করতে।' তিনি বললেন, 'ফিরে যাও।' কারণ আমি রসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছি! যখন দুজন মুসলমান তাদের তরবারী নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দুজনই দোজখবাসী হবে। আমি বললাম, হে রসূল, হত্যাকারীর ব্যাপারটা বুঝলাম। নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী? তিনি বললেন, সে তার সাথীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল"। [১৪]

ইমাম বুখারী সূরা আনফালের ৩৯ তম আয়াত "তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ কোন ফেতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়"। এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "ফেতনার বিরুদ্ধে লড়াই সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? তিনি বললেন, তুমি কি জান ফেতনা কী? রসূল (সঃ) মোশরেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আসলে তাদের সামনে যাওয়াই ছিল ফেতনা। ওটা শাসকের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করার মত কোন ব্যাপার নয়। [১৫]

ইমাম বুখারী হযরত ইবনে ওমর থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, "ইবনে যুবাইরের ফেতনার (বিদ্রাহ) সময় তার কাছে দুই ব্যক্তি এসে বললো, জনগণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আপনি হযরত ওমরের ছেলে ও রসুল্লাহর (সঃ) সাহাবী। আপনি কোন কারণে বিদ্রোহ করছেন। তিনি বললেন, কারণ আল্লাহ আমার ওপর আমার ভাই এর রক্ত ঝরানো হারাম করেছেন। তারা উভয়ে বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, যতক্ষণ ফেতনা অবশিষ্ট না থাকে, ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাও?" তিনি বললেন, আমরা লড়াই করেছি, অবশেষে ফেতনা দূর হয়েছে এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়েছে। আর তোমরা লড়াই করতে চাইবে, যাতে ফেতনার সৃষ্ট হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হয়"। [১৬]

Dhaka University Institutional Repository

আবু দাউদ হযরত আবুযর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সঃ) আমাকে বললেন, "হে আবু যর। আমি বললাম হে রসূল, আমি উপস্থিত। তখন তিনি বললেন, তোমার কেমন লাগবে যদি কখনো মানুষের উপর এমনভাবে মৃত্যু আসে যে, তার বাড়ীই তার কবরে পরিণত হবে। অথাৎ পাইকারী হারে মৃত্যু বা হত্যাকান্ড ঘটবে, যার ফলে গোটা পরিবার মৃত্যুবরণ করবে। অথবা, যুলুম চলবে যে, লাশ বাড়ী থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র দাফন করার সুযোগ থাকবেনা, ফলে বাড়ীর ভেতরেই লাশ দাফন করতে হবে। আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। অতপর রসূল (সঃ) বললেন, তোমার কর্তব্য হবে ধৈর্য্য ধারণ করা।" [১৭]

তারপর পুনরায় আমাকে বললেন, "হে আবু যর! আমি বললাম, হে রসূল, আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, তোমার কেমন লাগবে, যখন দেখবে যে, তেলের পাথরগুলো রক্তের নীচে ডুবে গেছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য যা পছন্দ করবেন, তাই হবে। তিনি বললেন, তুমি কি তখন অন্যেরা যা করে, তাই করবে? আমি বললাম, তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলেন? তিনি বললেন, তুমি ঘরে বসে থাকবে। আমি বললাম, যদি তা আমার ঘরে ঢোকে? তিনি বললেন, তোমার যদি আশংকা হয় যে, তরবারীর চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে কাপড় দিয়ে তোমার মুখ ঢেকে নাও। আক্রমণকারী তোমার ও তার দু'জনেরই পাপে পাপী হবে।" [১৮]

সন্ত্রাস দমনে আমাদের শিক্ষা

প্রথমতঃ রসূল (সঃ) এর মক্কায় অবস্থানকালীন রিসালাতের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে মদিনায় যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই সময় পর্যন্ত তার নবুয়তের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কোরআন-সুন্নাহর প্রতি আমরা যদি সামগ্রিক, সর্বব্যাপী ও সুগভীর দৃষ্টি দেই, তাহলে আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো যে, মুসলমানরা মক্কায় নিদারুন অত্যাচার ও আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। অথচ কোরআন ও নবুয়তের শিক্ষা ছিল এই যে, সত্যের পথে দাওয়াত দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে এবং সন্ত্রাসী পন্থায় জবাব দেয়া চলবে না। চাই কোরায়েশ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যত নির্যাতন ও আগ্রাসনই মুসলমানদের ওপর চালানো হোক না কেন। মুসলমানদের ওপর তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে দৈহিক নিপীড়ন চালাতে ও হত্যা করতেও কুন্ঠিত হচ্ছিল না।

এটা সুস্পষ্ট যে, এই অবস্থায়ও অহিংস পন্থায় দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সৎকাজের আদেশ দান, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করণ, আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত এবং রাজনৈতিক আদর্শিক পর্যায়ে যুলুম ও শেরক প্রতিহত করার শামিল ছিল। এটা ছিল সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী কোরায়েশী নেতৃত্বের মাঝে ও মুসলিম সংস্কারবাদ নেতৃত্বের মাঝে দুর্দান্ত লড়াই।

মক্কায় মুসলমানদের ওপর কোরায়েশের অত্যাচারের জবাবে পাল্টা সহিংস পন্থায় আশ্রয় নেয়ার অনুমতি না দেয়ার ব্যাপারে কোরআন ও নবুয়তের শিক্ষা হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব ও ওমর ইবনুল খাত্তাবের মত দুঃসাহসী বীর পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও পরিবর্তিত হয়নি। সংস্কারবাদী সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমানদের দলভূক্ত হয়ে এই দু-সাহসী বীরদ্বয় কোরায়েশ নেতাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিতে চেয়েছিলেন। তারা কোরায়েশদের অত্যাচার প্রতিহত করা, সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাসীদের জবাব দেয়া, এবং শক্তি দিয়ে শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রসূল (সঃ) এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। অথচ কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহর এই আদেশ ও রসূলের এই নীতি আদর্শের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, ঐ অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ ধৈর্য্য ধারণ করা যখন অসম্ভব পর্যায়ে পৌঁছে এবং শত্রুপক্ষ যদি ধৈর্য্য ধারণকে দুর্বলতা ভাবে তখন রুখে দাড়াবার পথ অবলম্ভন করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে (সঃ) রুখে দাড়াবার লক্ষ্যে প্রয়োজনে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই সমাজ থেকে সন্ত্রাস উচ্ছেদ করতে হলে মহানবী (সঃ) পথ অনুসরণ করা উচিত।

এই নীতি ও আর্দশ নিম্মের আয়াতগুলোতে লক্ষণীয়

প্রথমতঃ "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমি তোমার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাও,এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা কর সকালে ও সন্ধ্যায়"। [১৯]

"আর তুমি তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকে এবং একাগ্র চিত্তে তারই প্রতি রুজু হয়ে থাক। তিনিই উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। কাজেই তাকে ব্যবস্থাপক রূপে গ্রহণ কর। তারা যা বলে, তার ওপর ধৈর্য্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল। আর আমার উপর সম্পদশালী, সত্য প্রত্যাখানকারীদেরকে ছেড়ে দাও, আর তাদেরকে আরো কিছুকাল অবকাশ দাও'। [২০]

"আর আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকারের উদাহরণ দিয়েছি। তুমি যদি তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শনাবলীও নিয়ে এস, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই বলবে যে, তোমরা বাতিলপন্থী ছাড়া আর কিছু নও। এভাবেই আল্লাহ অজ্ঞ লোকদের হৃদয়ের ওপর সিল মেরে দিয়েছেন। অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা অবিশ্বাসী, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে"। [২১]

"হে আমার ছেলে, নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং তুমি যে সব বিপদে আক্রান্ত হও, তার ওপর ধৈর্য্য ধারণ কর। এ হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ"। [২২]

"বল, হে মানব জাতি, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে জেনে রাখ, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না। বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহর। যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন। আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুমীনদের অন্তর্ভুক্ত হই। আর যেন তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত না হও। আল্লাহ ছাড়া অন্য এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার উপকারও করে না। অপকারও করেনা। তুমি যদি তা কর, তবে তুমি যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা আর কেউ প্রতিহত করতে পারে না। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তবে তার অনুগ্রহ, রদ করারও কেউ নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ দান করেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তুমি বলে দাও, হে মানব জাতি, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সুপথে চলেছে, সে কেবল নিজের কল্যাণেই সুপথে চলেছে। আর যে ব্যক্তি বিপথগামী হয়েছে, সে নিজের অকল্যাণের জন্যই বিপথগামী হয়েছে। আর আমি তোমাদের জন্য দায়িত্বশীল নই। আর তুমি তোমার কাছে যা কিছু ওহি আসে তার অনুসরণ কর, এবং ধৈর্য্য ধারণ কর, যতক্ষণ আল্লাহ নিষ্পত্তি না করে দেন। তিনি সর্বোত্তম নিষ্পত্তিকারী"। [২৩]

"আমার বান্দাদের একটা দল বলতো, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের ওপর দয়া করুন, আপনি তো সর্বোত্তম দয়ালু। কিন্তু তোমরা

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে উপহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ করেছ, শেষ পর্যন্ত তারা তোমাদের স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে এবং তোমরা তার প্রতি বিদ্রুপ করতে। তারা ধৈর্য্য ধারণ করেছিল বিধায় আমি তাদেরকে আজ কর্মফল দেব। কেননা তারা সফলকাম"। [২৪]

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখতে পাই, মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করা ও সেখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর কিভাবে রসূল (সঃ) ও মুসলমানদের নীতি পাল্টে গেল, কোরায়েশ নেতৃত্বাধীন আগ্রাসী হানাদারদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রয়োগের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এ সময়ে কোরআন মুসলমানদেরকে তাদের জানমাল ও আন্দোলন রক্ষার্থে সশস্ত্র লড়াই এর শুধু অনুমতি নয় বরং হুকুম দিল। রসূল (সঃ) কোরায়েশ ও কোরায়েশ ছাড়া অন্যান্য সেই সব গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন, যারা তার ও তার সংস্কারবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। এই প্রতিরোধের উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা করা, সমাজের দুর্বল লোকদের ওপর থেকে যুলুম প্রতিহত করা এবং মানুষকে তার আকীদা বিশ্বাস ও জীবন বিধান নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রদান করা। রসূল (সঃ) ঐ সব আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সর্বপ্রকারের শক্তি ও সহিংসতার উপকরণ ব্যবহার করেন। তাদের কোন কোন আগ্রাসী কুচক্রী নেতাকে তাদের বাড়িতে গোপনে হত্যা করে ফেলেও ছিল।

"যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা নির্যাতিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে সম্পুর্ন অন্যায়ভাবে। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, তারা বলেছেন "আমাদের প্রভু আল্লাহ"। আর যদি আল্লাহ কতক মানুষকে দিয়ে কতক মানুষকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে তাদের সেই সব উপসানালয়সমূহ ও মসজিদ সমূহকে ধ্বংস করে ফেলা হতো, যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। যাদেরকে আমি দেশে ক্ষমতাসীন করলে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, বস্তুত আল্লাহর হাতেই সব কিছুর শেষ ফল।"[২৫]

"তোমাদের ওপর লড়াই ফরয করা হলো, অথচ সেটা তোমাদের অপছন্দ। হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করবে। অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে পছন্দ করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ। বস্তুত আল্লাহই জানেন। তোমরা জাননা। তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ কেন? তুমি বলো, নিষিদ্ধ মাসে লড়াই করা একটা মারাত্মক ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে ফেরানো, তাকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখা, এবং সেখান থেকে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে আরো মারত্মক। আর যুলুম নির্যাতন করে ইসলাম থেকে জোরপূর্বক ফেরানো আরো মারাত্মক। তারা সম্ভব হলে তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে লড়াই করেই চলেছে। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ ধরনের লোকেরাই দোযখবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমত আশা করে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল। [২৬]

"আর তোমরা মোশরেকদের সাথে সবাই মিলে লড়াই কর। যেমন তারা তোমাদের সাথে সবাই মিলে লড়াই করে। জেনে রেখ, আল্লাহ সংযমীদের সাথে থাকেন"। [২৭]

"তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাদের বিরুদ্ধে। তবে সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা

Dhaka University Institutional Repository

কর। আর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে, সেখান থেকে তাদেরকেও বহিস্কার কর। আর মানুষকে নির্যাতন করে ধর্মচ্যুত করা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। আর তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে মসজিদুল হারামে লড়াই না করে, ততক্ষণ তোমরাও সেখানে তাদের সাথে লড়াই করোনা। তারা যদি তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। কাফেরদের শাস্তি এরকমই। অতঃপর তারা যদি লড়াই থেকে নিবৃত্ত হয়, তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যতক্ষণ ফেতনা (অত্যাচারের মাধ্যমে স্বাধীনতা হরণ) অবশিষ্ট না থাকে, এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে না যায়, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। অতঃপর তারা যুদ্ধ বিরত হলে অত্যাচারীরা ছাড়া আর কারো ওপর আক্রমণ চালানো যাবে না। নিষিদ্ধ মাসের (যুদ্ধের বিনিময়) বিনিময়ে নিষিদ্ধ মাস। আর প্রত্যেক নিষিদ্ধ জিনিস লংঘনের বিনিময়ে কিসাস তথা শাস্তি। যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করবে, তোমরাও তার ওপর অবিকল বাড়াবাড়ি করবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সৎ লোকদের সাথে থাকেন।" [২৮]

"হে মুমীনগণ, তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন মাটির সাথে লেগে যাও। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেলে? আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সামগ্রী খুবই সামান্য। তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন, তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতিকে আনবেন এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান"। [২৯]

"যে জাতি তাদের শপথ ভংগ করেছে, রসূলকে বহিস্কার করতে উদ্যত হয়েছে, এবং তোমাদের সাথে প্রথম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, তাদের সাথে কি তোমরা যুদ্ধ করবে না? তোমরা কি তাদের ভয় পাও! আল্লাহই ভয় পাওয়ার অধিকতর যোগ্য, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের হাত দিয়ে শাস্তি দেবেন, অপমানিত করবেন, তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করবেন এবং মুমিনদের পক্ষকে রোগমুক্ত করবেন।" [৩০]

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পার্শ্ববর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং তারা যেন তোমাদের ভেতরে কঠোরতা পায়। আর জেনে রেখ, আল্লাহ পরহেজগারদের সাথে থাকেন।" [৩১]

"তারা আল্লাহর জ্যোতিকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তার জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করতে বদ্ধপরিকর। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রসূলকে (সঃ) হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে অন্য সকল দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করে দেন, যদিও মোশরেকরা তা অপছন্দ করে। হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের খবর দেবনা, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের (সঃ) ওপর ঈমান আনবে, এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করবে।

এটাই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা জানতে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর প্রবেশ করাবেন চিরস্থায়ী জান্নাতের পবিত্র বাসস্থান সমূহে। এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। আরো একটা জিনিস যা তোমরা পছন্দ কর, তা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মোমেনদেরকে সুসংবাদ দাও।[৩২]

"সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি। তোমরা এ ছাড়া এমন কিছু লোকও পাবে যারা তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে চায় এবং নিজেদের কওমের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়। যখনই তাদের ফিতনার দিকে আকর্ষণ করা হয়, তখনই তারা

Dhaka University Institutional Repository

তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতএব তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং যেখানেই তাদেরকে পাবে হত্যা করবে। আর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করেছি"। [৩৩]

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহলে তুমিও সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৩৪]

মুলত, মক্কার জীবনে রসূল (সা) এর অনুসৃত নীতি এবং মদিনার জীবনে মাদানী সমাজের অভ্যন্তরে উদ্ভুত রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘাত নিরসনের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রয়োগ তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘর্ষকে সর্বব্যাপী রাজনৈতিক গোলযোগ বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হতে ও এতটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে দেয়না, যাতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তার সমাধান ও মীমাংসা করা বা তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামের এই স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী মক্কা ও মদিনা উভয় জায়গায় সমগ্র নবী জীবন ব্যাপী তাঁর অনুসৃত নীতিতে প্রতিফলিত হয়। এ নীতি ও আদর্শ থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন রাজনৈতিক মূলনীতি উদ্ভাবন করতে পারি।

সে মূলনীতি হলো, একটা অখন্ড ও একক সমাজে কোন রাজনৈতিক বিরোধের উদ্ভব ঘটলে অবশ্যই তার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। আগ্রাসী রাষ্ট্রদ্রোহীকে তার রাষ্টদ্রোহী কর্মকান্ড বর্জনে বাধ্য করতে হবে। জাতির বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দ ও সমগ্র জাতির কর্তব্য উগ্রতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উৎস যেখানেই থাক না কেন, তা এবং আগ্রাসী পক্ষের হাতকে থামানো চাই। তা অসহযোগিতার মাধ্যমেই হোক অথবা তাকে তার আগ্রাসন বন্ধ করতে বাধ্য করার জন্য শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই হোক।

সবশেষে এ সংকটময় মুহূর্তে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য একমাত্র আদর্শ হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁরই আদর্শকে জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে বাস্তবায়ন করা। তাই, যুগের এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের স্মরণ করে দেয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রবর্তিত নীতিমালা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করলে নিঃসন্দেহে বর্তমানে বিরাজমান নানা প্রকার সন্ত্রাসের প্রতিরোধ করে একটি সুখী সুন্দর সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ বা পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তথ্যপঞ্জি

১. মাসিক মদীনা, জুন- ২০০২, পৃষ্ঠা- ২০
২. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৫৯১, পৃষ্ঠা- ১০৪৪
৩. আল কুরআন ২:১১-১২
৪. সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ১১৯, পৃষ্ঠা- ৬৪
৫. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪৭০৪, পৃষ্ঠা- ৭৭৭
৬. আল কুরআন ৪: ৯৭-৯৮
৭. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ২৫৯২, পৃষ্ঠা- ৩৯০ এবং হাদীস নং- ২৮৬০, পৃষ্ঠা- ৪২৮
৮. আল কুরআন ২: ১৯৩
৯. আল কুরআন ২: ১৯১
১০. মাসিক মদীনা, জুন- ২০০২, পৃষ্ঠা- ২০
১১. আল কুরআন ৫: ২৭-৩০
১২. আল কুরআন ৩১: ১৭

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৫৮২, পৃষ্ঠা- ১০৪৩
১৪. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৬০৩, পৃষ্ঠা- ১০৪৫
১৫. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪২৯৫, পৃষ্ঠা- ৭০০
১৬. ড. আঃ হামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান, "ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রন" অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা- ২৫।
১৭. ড. আঃ হামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান, "ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রন" অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা- ২৫।
১৮. ড. আঃ হামীদ আহমাদ আবু সুলায়মান, "ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রন" অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা- ২৬।
১৯. আল কুরআন ৪০: ৫৫
২০. আল কুরআন ৭৩: ৮-১১
২১. আল কুরআন ৩০: ৫৮-৬০
২২. আল কুরআন ৩১: ১৭
২৩. আল কুরআন ১০: ১০৪-১০৯
২৪. আল কুরআন ২৩: ১০৯-১১১
২৫. আল কুরআন ২২: ৩৯-৪১
২৬. আল কুরআন ২: ২১৬-২১৮
২৭. আল কুরআন ৯: ৩৬
২৮. আল কুরআন ২: ১৯০-১৯৪
২৯. আল কুরআন ৯: ৩৮-৩৯
৩০. আল কুরআন ৯: ১৩-১৪
৩১. আল কুরআন ৯: ১২৩
৩২. আল কুরআন ৬১: ৮- ১৩
৩৩. আল কুরআন ৪: ৯০-৯১
৩৪. আল কুরআন ৮: ৬১

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সন্ত্রাস দমন

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ইন্তেকালের পর যে চারজন প্রধান সাহাবী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন, ইতিহাসে তাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন নামে অভিহিত করা হয় এবং তাদের পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'। 'খুলাফায়ে রাশেদুনে'র শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী না থাকলেও বিশ্বের ইতিহাসে তা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম, এমন কি মুসলিম দুশমনগণও খুলাফায়ে রাশেদুনের শাসন আমলকে মানব ইতিহাসে 'স্বর্ন যুগ' বলে অভিহিত করেছেন।

মূলতঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফত হতে শুরু করে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত, ইতিহাসে তা হচ্ছে 'খিলাফতে রাশেদা'র যুগ। আর ৬৩২ খৃষ্টাব্দ হতে ৬৬১ খৃষ্টাব্দ (১১ হিজরী হতে ৪০ হিজরী) পর্যন্ত মুসলিম জাহানে যাঁরা রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, তাদেরকেই 'খুলাফায়ে রাশেদুন' বলে অভিহিত করা হয়। এদের সংখ্যা চার এবং তাদের খিলাফত কাল ত্রিশ বৎসর মাত্র। অবশ্য উমার ইবনে আব্দুল আজীজ (রাঃ) ইসলামী খিলাফতের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়ায় তিনিও 'খুলাফায়ে রাশেদ' রূপে গন্য।

বস্তুতঃ ইসলামের খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও চারিত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে থাকে।

খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনাকে গভীর ও ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার জন্য উহার রাষ্ট্র রূপকে যাচাই করা অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্ব প্রশ্নটি আলোচনা করা যাক। ইসলামে সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। এখানে আইন রচনা ও নির্দেশ দানের মৌলিক অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাই। কাজেই খূলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মৌলিক ও প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হলঃ

- ❑ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পরিবার, শ্রেণী, দল কিংবা গোটা রাজ্যের সকল অধিবাসী বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে না। ইহা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

- মৌলিকভাবে আইন রচনার যাবতীয় অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। অর্থাৎ আল্লাহর নাজিল করা বিধান হচ্ছে মৌলিক আইন। সমগ্র মুসলমান মিলিত হয়ে নিজেদের জন্যও মুলগতভাবে কোন আইন রচনা করতে পারে না, আল্লাহর প্রদত্ত আইনেও কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে পারে না।

- ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে নবীর উপস্থাপিত আল্লাহর আইনের উপর। এ রাষ্ট্রের শাসক বা সরকার আল্লাহর আইনের অনুসারী ও উহার বাস্তবায়নকারী হলেও ইসলামী জনতার নিকট আনুগত্য পাবার অধিকারী হবে।

  পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে জমিনের বুকে খলিফা বানাবেন, যেমন করে তাদের পূর্ববর্তী এই ধরনের লোকদিগকে তিনি খলীফা বানিয়েছেন। [১]

খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বৎসর কাল শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সমুহ গোটা মানবজাতিকে আকৃষ্ট ও বিমোহিত করে।

- খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিশ্ব নবীর পবিত্র জীবনাদর্শ উজ্জ্বল অর্নিবাণ প্রদীপে পরিনত হয়েছিল এবং সমগ্র পরিমন্ডলকে উহার নির্মল আলোকসজ্জায় উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। খলিফাদের প্রতিটি কাজ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চিন্তা চেতনার উপর গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন হযরতের বিশ্বস্ত সহচর এবং তার উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গকৃত প্রাণ। একমাত্র হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত আর তিনজন খলিফাই নবী করিম (সঃ) দ্বিতীয় কর্ম কেন্দ্র ও শেষ শয্যাস্থল মদিনায় রাজধানী রেখে খেলাফতের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন।

- খিলাফতে রাশেদার অন্তর্ভূক্ত বংশ, গোত্র কিংবা পরিবার ভিত্তিক অধিকার, উত্তরাধিকার বা প্রাধ্যনের কোন অবকাশ ছিলনা। চারজন খলিফা তিনটি স্বতন্ত্র পরিবার হতে উদ্ভুত ছিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিলেন গোটা ইসলামী জনতার সর্বাপেক্ষা অধিক আস্তাভাজন। ক্রমিক পর্যায়ে তাদের নির্বাচনে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বের মৌলিক ভাবধারা কিছু মাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। বরং উহাই রক্ষিত হয়েছে সর্বত্রভাবে। আধুনিক কালের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও কেবল মাত্র তারাই সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হতেন। তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

- খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন রচনার ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। যে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যেতনা, সে বিষয়ে ইজতেহাদ পদ্ধতিতে রাসুলের আমলের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও অনুরূপ ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সমাধান বের করা হত এবং এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিস পারদর্শী প্রতিটি নাগরিকেরই রায় প্রকাশের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। কোন বিষয়ে সকলের মতৈক্যের সৃষ্টি হলে, সে সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হত। ফিকাহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় একে বলা হয় ইজমা। আর কোন বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হলে খলিফা কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে নিজস্ব রায় অকুন্ঠিতভাবে প্রকাশ করতেন এবং তদানুযায়ী কার্য সম্পাদন করতেন।

- খুলাফায়ে রাশেদুন অধিকাংশ ব্যাপারেই দায়িত্বশীল সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। সাধারন ব্যাপারে তাঁরাই মনোনয়ন অনুযায়ী মজলিসে শূরার সদস্য নিযুক্ত করতেন। কিন্তু রায়দানের অধিকার কেবলমাত্র নিযুক্ত সদস্যদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলনা।

- খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে রাজকীয় জাঁকজমক ও শান-শওকতের কোন স্থান ছিল না। সাধারন নাগরিকদের ন্যায় অতি সাধারন ছিল খলিফাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা। তাঁরা প্রকাশ্য রাজপথে একাকী চলাফেরা করতেন। কোন দেহরক্ষীতো দুরের কথা নামে মাত্র পাহারাদারও কেউ ছিলনা। প্রতিটি মানুষেই অবাধে খলিফার নিকট উপস্থিত হতে পারত। তাদের ঘরবাড়ি ও সাজ সরঞ্জাম ছিল সাধারণ পর্যায়ের।

- খুলাফায়ে রাশেদুন বায়তুলমালকে রাষ্ট্রের অর্থ ভান্ডার, জাতীয় সম্পদ ও আমানতের ধন মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মজুরী ব্যতীত নিজের জন্য এক পয়সা পর্যন্ত খরচ করতে পারতেন না। এতদ্ব্যতীত নিজেদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের জন্য তাদের নিজের ক্ষমতা ও পদাধিকার বলে বায়তুল মাল হতে কিছুই ব্যয় করতেন না।

- তারা নিজেদেরকে জনগনের খাদেম মনে করতেন। কোন ক্ষেত্রেই তারা নিজদিগকে সাধারণ লোকের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না। তারা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই জননেতা ছিলেন না, নামাজ ও হজ্ব প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারে যথারীতি তারাই নেতৃত্ব দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ধর্মীয় কাজের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কাজের কর্তৃত্ব বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত ছিলনা; বরং এ উভয় প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই একজন খলিফার ব্যক্তিস্বত্তায় কেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত ছিল।

খুলাফায়ে রাশেদার যুগে উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় তারা যেমন চারিত্রিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছেন তেমনি আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন। কাজেই তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও সৎভাবে জীবন যাপন সহ যাবতীয় কর্মকান্ড সন্ত্রাস দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সন্ত্রাস দমনে খুলাফায়ে রাশেদার বিচার ব্যবস্থা

খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিবাদমান দুইপক্ষের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার নিশ্চত করা খলিফার অন্যতম দায়িত্ব মনে করা হত। এজন্য প্রথম দিকে তারাই প্রায় সব বিচার কার্য নিজেরাই সম্পন্ন করতেন। অবশ্য দুরবর্তী স্থান সমুহের জন্য নিজেদের তরফ হতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। প্রথম খলিফার আমলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিযুক্ত শাসন কর্তাই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা তার খিলাফত আমলে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করেছিলেন। এজন্য প্রত্যেক শহরে স্বতন্ত্র মর্যাদ সম্পন্ন বিচারপতি বা কাজী নিয়োগ করা হয়েছিল। বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদা সম্পন্ন ছিল। বিচারপতি রায় দানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খলিফার পক্ষ হতে তাদেরকে এই নির্দেশ দান করা হত যে, তারা বিচারের যে রায়ই দান করবেন, তাহা যেন সর্বত্র ভাবে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। কোন দিক দিয়েই যেন কুরআন ও সুন্নাহ্ লংঘন করা না হয়। সংশ্লিষ্ট এলকার শাসনকর্তা বিচারপতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে কিংবা প্রভূত্ব খাটাতে পারতেন না। কাজী বা বিচারপতি সরাসরি খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সংশ্লিষ্ট শহরের শাসনকর্তাকে অনেক সময় বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা দান করা হত, কিন্তু তাহা সত্বেও কাজী বা বিচারপতি কখনই শাসনকর্তার অধীন হতেন না। তাছাড়া বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা হত। চতুর্থ খলিফার সময়ের একখানি নিয়োগ পত্রের কিছু অংশ হতে এর বাস্তব প্রমান পাওয়া যায়। "লোকদের মামলা মোকদ্দমা নিস্পত্তি করার জন্য এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ কর, যাদের রায় জনগণ অকুন্ঠ চিত্তে মেনে নিবে এবং কেহ উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন সাহস বা প্রয়োজন বোধ করবেন না। তারা হবেন সকল লোভ-লালসা ও মোহ-মাৎসর্য হতে পবিত্র। তারা কারো বিশেষ মর্যাদার কারণে সন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত হবেন না। সকল ব্যাপারে তাদেরকে গভীর, সুক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রত্যুৎপন্নমতি হতে হবে। সন্দেহ-সংশয় পূর্ণ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হবেন। পক্ষদ্বয়ের উপস্থাপিত যুক্তিপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ ও স্বাক্ষ্য দানে মোটেই বিচলিত হবেন না। প্রতিটি ব্যাপারের গভীরভাবে জানার জন্য পরিপূর্ণ সতর্কতা ও চিন্তা গবেষণা সহকারে কাজ করবেন। এভাবে তাঁরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে তা পুরাপুরি দৃঢ়তার সহকারে কার্যকর করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। কোন প্রকার সুপারিশ ও কোনরূপ পদ মর্যাদাকে তারা ফয়সালা কার্যকর করার পথে বাধা হয়ে দাড়াতে দিবেন না। যদিও এ ধরণের লোকদের সংখ্যা বেশী হয় না কখনো, কিন্তু তাহা সত্বেও বিচারপতিকে অবশ্যই উল্লেখিত গুনে ভূষিত হতে হবে। তোমরা যখন কাহাকেও বিচারপতি নিযুক্ত করবে, তখন তার যথেষ্ট পরিমাণে বেতন ধার্য করবে, তা হলে তাহার জীবন যাত্রা নির্বাহের দাবি তাকে ঘুষ নিতে বাধ্য করবে না। উপরন্তু তোমাদের সমাজে তাঁর মর্যাদা উন্নত হওয়া বাঞ্চনীয়, যেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার সাহস কারো না হয়।" [২]

"বিচারকগণ ছাড়াও প্রত্যেক শহরেই ইসলামী আইন সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন একটি গোষ্ঠি সব সময়ই মওজুদ থাকত। কোন ব্যাপারে বিচারকদের অসুবিধা দেখা দিলে তাদের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করা হত।" [৩]

"এ সময় নবী করিম (সঃ) এর হাদীস সমুহ গ্রন্থবদ্ধ ছিল না, তা ছিল লোকদের স্মৃতিপটে রক্ষিত। কেহ একটি হাদীস জানত আর কাহারো স্মরণ ছিল অন্য একটি হাদিস। সমস্ত হাদিস একক ভাবে বিশেষ কাহারো স্মরণ ছিল না আর উহা ছিল সেকালের একটি কঠিন সমস্যা। বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত ব্যাপারের মীমাংসা করার জন্য কোন হাদীসের প্রয়োজন হলে তাহারা বিভিন্ন লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলে করীম (সঃ) এর নির্দেশ বা কর্মনীতি জানতে চেষ্টা করতেন। ফলে তারা রাসূলের যে হাদীসই পেতেন, সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতেন; কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন হাদীস পাওয়া না গেলে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা ও উহার ধারাকে সম্মুখে রেখে তারা ইজতিহাদ করতেন। এ কারণে অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে বিচারকদের রায় বিভিন্ন প্রকার হত। বিচারকদের ফয়সালাসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখা তখনো শুরু হয়নি। ফলে পরবর্তীকালের লোকেরা তাহা হতে কিছুমাত্র ফায়দা লাভ করবার সুযোগ পেত না।" [৪]

"এ যুগের যাবতীয় বিচারকার্য কেবলমাত্র ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেবলমাত্র শরীয়াতের খুঁটিনাটি আইন জানবার ও যুগের বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার উপর তাকে প্রয়োগ করার ব্যাপারেই ইজতিহাদ-নীতি ব্যবহার করা হত। স্মর্তব্য যে, ইসলামী আইনসমুহ ছিল কতকগুলি মূলনীতির সমষ্টি; উহার খুটিনাটি বিধান তখনো রচিত হয়নি। বস্তুত চিরকাল ও সমগ্র মানবতার জন্য প্রদত্ত আইন-বিধান এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কালের প্রতিটি পর্যায়ে ও পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলেই এর বাস্তব প্রয়োগ কেবলমাত্র এ ভাবেই সম্ভব।" [৫]

Dhaka University Institutional Repository

"বিচারক নিয়োগের পরও জনগনের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করার ব্যাপারে খলীফাদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে কোন বাধা ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই অনেক ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করতেন। সেই সব ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিচারকগন শুধু খলীফাদে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন মাত্র।" [৬]

সন্ত্রাস দমনে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)। ইসলামের ইতিহাসে রাসুলে কারীম (সঃ) এর পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর স্থান। ইসলামী ঐতিহ্যের দিক দিয়াও রাসূলের পর তিনিই সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। নবী করীম (সঃ) তার তেইশ বৎসরকালীন সাধনার মাধ্যমে যেখানে ইসলামের পুর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আরবের কঠিন জাহিলিয়াতের প্রাসাদ চুরমার করে উহার ধ্বংসস্তুপের উপর বিপ্লবী শক্তির উত্তোলিত মস্তক চূর্ণ করে দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)।

মুসলমানদের সাধারণ পরিষদে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। এ সময় খলীফা নির্বাচিত হয়ে তিনি যে মূল্যবান ভাষণ দান করেন, বিশ্ব মুসলিমের নিকট তা যেমন এক ঐতিহাসিক বিষয়, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শনের ক্ষেত্রে উহা চিরন্তন পথ নির্দেশক। তার এ ভাষণের পূর্ণাঙ্গ রূপ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। তিনি সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে যা বলেছিলেন তা সন্ত্রাস দমনসহ সকল প্রকার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। তিনি বলেছিলেন ,

" হে মানুষ! রাষ্ট্রনেতা হওয়ার বাসনা আমার মনে কোন দিনই জাগ্রত হয়নি। আমি নিজে কখনও এ পদের আকাংক্ষী ছিলাম না। ইহা লাভ করার জন্য আমি নিজে আল্লাহর নিকট গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কখনও প্রার্থনা করিনি। আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি কেবলমাত্র এই জন্য যে, দেশে যেন কোন প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হতে না পারে। সরকারী ক্ষমতায় আমার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ও স্বস্তি নেই। আমার উপর এত বড় দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য না পেলে আমি তাহা সুসম্পন্ন করতে পারব না। আমাকে তোমাদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নহি। আমি যদি সোজা ও সঠিক পথে চলি, তবে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগীতা করিও। আর আমি যদি

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়পথ পরিত্যাগ করি, তবে তোমরা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিও। সত্যতা হচ্ছে আমানত আর মিথ্যা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা"। [৭]

"তোমাদের মধ্যে প্রভাবহীন ব্যক্তি হবে আমার দৃষ্টিতে প্রভাবশালী; তার সকল প্রকার অধিকার আমি আদায় করে দিব। আর যে ব্যক্তি খুব প্রভাবশালী, আমার নিকট তার কোন প্রভাব থাকবে না, তার উপর দূর্বল ব্যক্তির কোন হক থাকলে তাহা পুরাপুরি আদায় না করে আমি ক্ষান্ত হব না।"

"যে জাতির মধ্যে অন্যায়, পাপ ও নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করে, সে জাতির উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। আমি যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করব ততক্ষন তোমরা ও আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ এবং তার রাসুলের নাফরমানী করি, তবে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য হবে না"। [৯]

উল্লেখিত ভাষণ ও পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি সন্ত্রাস দমন সহ সব রকমের অন্যায় অনাচার প্রতিহত করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের জন্য যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, বিশ্বের মুসলিম ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। প্রকৃতপক্ষে তারই খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয় এবং উহা বিশ্বের বিশাল অংশে সম্প্রসারিত হয়। এ বিরাট রাষ্ট্র এশিয়ার ভারতবর্ষ ও চীন পর্যন্ত এবং আফ্রিকার মিশর, তিউনিসিয়া ও মরক্কো পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মোটকথা, এ রাষ্ট্রই মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর শাসন ও বিচার ব্যবস্থা

সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই হযরত আবু বকর (রাঃ) এর শাসন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা উন্নত করার লক্ষ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরব উপদ্বীপকে কয়েকটি প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেছিলেন। মদীনা, মক্কা, তায়েফ, সানায়া, নাজরান, হাযারামওত, বাহরাইন ও দওমাতুল জান্দাল প্রভৃতি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে কর্মাদক্ষ বা গভর্ণর নিযুক্ত করেন। সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন তাহার কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। খিলাফতকালে প্রত্যেক বিভাগের একজন করে প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত করেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারে, হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) সিরিয়ার সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে উজির পদে অভিষিক্ত ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন বিচারপতি। আর হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত যায়িদ বিন সাবেত (রাঃ) তাঁর সেক্রেটারী পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন।

শাসনকর্তা ও অফিস নির্বাচনে হযরত আবু বকর (রাঃ) সবসময় নবী করিম (সঃ) এর যুগের অনুরূপ পদাধিকারী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতেন এবং যিনি পূর্বে যে কাজ করেছেন, তার দ্বারা সেই কাজ করাতে চেষ্টা করতেন। ফলে কোন বিভাগে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ লোক নিয়োগ জনিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন কাউকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করতেন, তখন সাধারণতঃ তাকে উপস্থিত করে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিতেন এবং অত্যান্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাকওয়া, ন্যায়-নীতি ও সর্বক্ষেত্রে সুবিচার অবলম্বনের জন্য উপদেশ দান করতেন। এখানে আমর বিন আশ ও অলীদ বিন আকাবা (রাঃ) কে যাকাত আদায়কারী নিয়োগকালীন প্রদত্ত উপদেশের অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

"প্রকাশ্যে ও একাকীত্বে আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য এমন একটি পথ ও রিযিক লাভের উপায় সৃষ্টি করে দেন, যাহা কারো ধারণায় আসতে পারে না। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার নেক কাজের ফল দ্বিগুন ও ততোধিক পরিমান দান করেন। জনগণের কল্যাণ কামনা ও খেদমত নিঃসন্দেহে উত্তম তাকওয়ার কাজ। এমন গুরুত্বপূর্ণ পথে তোমার যাত্রা শুরু হচ্ছে যেখানে দিনের প্রতিষ্ঠা ও খিলাফতের দৃঢ়তা সাধনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফলতি ও অবহেলার কোন অবকাশ নেই। কাজেই অবসাদ ও উপেক্ষার কদর্য অভ্যাস পরিত্যাগ কর"। [১০]

ইয়াজিদ বিন সুফিয়ানকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্তির সময় তাকে সম্বোধন করে বলেছেন-

" হে ইয়াজিদ! তোমার বহু সংখ্যক নিকট আত্মীয় আছে; তোমার রাষ্ট্র ক্ষমতার দ্বারা তাদেরকে অনেক স্বার্থোদ্ধারের সুযোগ করে দিতে পার। কিন্তু জেনে রাখো ইহাই আমার সবচেয়ে বড় ভয়। নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "মুসলামানদের শাসনকর্তা যদি কারো বিনা অধিকারে শুধুমাত্র প্রীতি হিসাবে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অফিসার নিযুক্ত করে, তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়। আল্লাহ তার কোন ওজর কিংবা প্রায়শ্চিত্ত কবুল করেন না। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"। [১১]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর (রাঃ) মহানবীর (সঃ) অনুসারণে তাঁর সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হে যায়িত, নিশ্চিত হয়ো যেন তোমার নিজের লোকদের উপর উৎপীড়ন না কর, তাদের প্রতি অস্বস্তিও ঘটাবে না, বরং তোমরা সকল ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে, আর যা ন্যায়সঙ্গত ও বিচারসম্মত তা করতে যত্নবান হবে, কারণ যারা অন্যথা করে তাদের উন্নতি হবে না। যখন শত্রুর সম্মুখীন হবে; তখন তোমরা মানুষের মত নিজেদের পরিচয় দিবে, আর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আর যদি তোমরা বিজয়ী হও, তাহলে ছোট শিশুদেরকে হত্যা করবে না, বৃদ্ধদেরকেও না, নারীদেরকেও না। খেজুর গাছ নষ্ট করবে না, শস্যের ক্ষেত পোড়াবে না। ফলের গাছ কাটবে না, শুধু খাদ্যের প্রয়োজনে যা তোমরা হত্যা করবে তার বাইরে গবাদি পশুর কোন অনিষ্ট করবে না। যখন তোমরা কোন সন্ধি বা চুক্তি কর তা পালন করবে এবং তোমাদের কথা রক্ষা করে চলবে। তোমরা চলার পথে দেখবে কিছু ধর্মপরায়ণ লোক মঠের মধ্যে সংসারত্যাগী অবস্থায় বাস করছে। যারা এ প্রকারে আল্লাহর সেবায় নিযুক্ত তাদেরকে হত্যা করবে না কিংবা তাদের মঠ ধ্বংস করবে না।" [১২]

কমকর্তা কর্মচারীদের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি

সরকারের আইন-কানুন যতই উত্তমভাবে রচিত ও বিধিবদ্ধ হোক না কেন, দায়িত্ব প্রাপ্ত শাসকদের উপর যদি কড়া দৃষ্টি রাখা না হয় এবং জনগণের সমালোচনার সুষ্ঠু ও অবাধ ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে গোটা শাসন ব্যবস্থা চুর্ণ-বিচুর্ণ ও জনগণের আশা-আঙ্খাকা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ কারণে প্রথম খলিফার স্বাভাবিক বিনয়, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মহৎ গুনাবলী থাকা সত্ত্বেও স্থান বিশেষে তাকে বিশেষ কঠোরতা, পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে খাঁটি, ভেজাল নির্ণয়ে দুঃসাধ্য কাজ করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যাপার সমুহে অতিশয় নম্রতা, বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ ছিল তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট; কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বীনী, প্রশাসনিক ও খিলাফত সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ত্রুটি অবহেলাকে কঠোর ভাবে দমন করেছেন। এ কারণে শাসনকর্তাদের মধ্যে যখন কোন অবাঞ্ছনীয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হত তখন অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেই তিনি তার শাস্তি বিধান করতেন।

শাস্তি প্রদানে ক্ষমাশীলতা

হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীদের প্রতি নম্র ও সহানুভূতিসুচক ব্যবহার করতেন। নবী করিম (সঃ) এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা তার নিকট স্বীকার করে। তিনি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে তওবা করতে এবং এ অপরাধের কথা বলে না বেড়াতে উপদেশ

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন। কিন্তু অপরাধী সে রাতে নির্দিষ্ট দন্ড বিধান হতে আত্মরক্ষা করতে প্রস্তুত না হওয়ায় নবী করিম (সঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে নিজ ইচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করে দন্ড গ্রহন করেন।

খিলাফতের আমলেও হযরত আবু বকর (রাঃ) এর এ প্রকৃতিই বর্তমান ছিলো। নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবীদার আসওয়াস বিন কায়স গ্রেফতার হয়ে তার দরবারে আনীত হয়। শেষ পর্যন্ত সে তওবা করে প্রাণ ভিক্ষা চায়। হযরত আবু বকর (রা) তাকে কেবল মুক্তিদানই করেননি, নিজের সহদরা ভগ্নির সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করেন।

বস্তুতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে খলীফার প্রধান দায়িত্ব হল জনগনের নৈতিক চরিত্র ও জান মালের সংরক্ষন। এ দিক দিয়ে যদিও তখন পর্যন্ত কোন পুলিশ বিভাগ স্থায়ীভাবে কায়েম ছিলনা, তথাপি এ বিভাগটি তখনো নবী করিম (সঃ) এর স্থাপিত ব্যবস্থা অনুযায়ীই পরিচালিত হচ্ছিল। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কে পাহারাদারী ও নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাকে ইসলামী পার্লামেন্টের মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবা সম্মেলনে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে পরামর্শ গ্রহন ও ইজতিহাদ করতে হয়েছে।

মোটকথা, জনজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান এবং রাজপথ সমুহকে সকল প্রকার বিপদ হতে মুক্ত ও নিরাপদ রাখার দিকে প্রথম খলীফা বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করতেন। এ কাজে কেহ বিন্দু মাত্র বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলে তাকে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান করতেন। কোথাও শরীয়তের দন্ড বিধানের সীমা লংঘন করা হতো না। ফলে প্রথম খলিফার আমলে সন্ত্রাস তো দুরের কথা, কোন প্রকার সামান্য অপরাধও সংঘঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা।

সন্ত্রাস দমনে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা)

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর দশ বৎসরকালীন শাসন আমলে ইসলামী খিলাফত চরম উৎকর্ষ ও অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করে। রোম ও পারস্যের ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্বয় এ সময় মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। বস্তুতঃ মুষ্টিমেয় মরুবাসী অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, ইতিহাস তার দৃষ্টান্ত। আলেকজান্ডার দি গ্রেট, চেংগীজ খান ও তৈমুর লং সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়েছিল এবং ভূ-পৃষ্ঠকে তারা তছনছ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফার আমলে দেশ জয় ও রাজ্যাধিকারের সাথে তার কোন তুলনা হতে পারে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ এক সর্ব বিধ্বংসী ঝড়ের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

একদিক হতে উত্থিত হয়ে অত্যাচার নিষ্পেষন ও রক্তপাতের মাধ্যমে অন্যদিকে চলে গিয়েছেন। আলেকজান্ডার সিরীয় রাজ্যের 'ছুর' নগর অধিকার করে এক সহস্র নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করেন। সেই সঙ্গে তিনি ত্রিশ সহস্র নাগরিককে দাসীতে পরিণত করে বিক্রয় করে দেন।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর আমলে যে সব দেশ ও শহরে ইসলামী খিলাফতের পতাকা উত্তোলিত হয়, সেসব স্থানে জুলুম ও নির্যাতনের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামী সৈন্যবাহিনীর উপর বিশেষ নির্দেশ ছিল যেন তারা শিশু, বৃদ্ধ কিংবা নারীর উপর কোন প্রকার নির্যাতন না করে। ব্যাপক ও সাধারণ নরহত্যা তো দুরের কথা সবুজ শ্যামল বৃক্ষরাজি পর্যন্ত কর্তন করা নিষেধ ছিল। তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যের যে অপুর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা প্রত্যক্ষ করে সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হত। ফলে ইসলামী খিলাফতী শাসনকে তারা অপূর্ব রহমত বলে মনে করত এবং এ রহমত অবিলম্বে তাদের দেশ ও জাতির উপর এ রহমত বর্ষিত হবার জন্য তারা রীতিমত প্রার্থনা করত। এমনকি তারা কৃতজ্ঞতায় বিজয়ী মুসলমানদিগকে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগীতা করতে কুণ্ঠিত হত না। সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে স্বয়ং সিরিয়ার অমুসলিম জনগণই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলমানদের পক্ষে সংবাদ সরবরাহ ও খোঁজ খবর দেওয়ার কাজ করেছেন। ইরাক বিজয় কালে তথাকার অনারব জনতা ইসলামী সৈনিকদের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুল নির্মাণ এবং প্রতিপক্ষের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত থাকবার সুযোগ করে দেয়। এ সকল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর সাথে আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও চেংগীজ খানের মত রক্তপাতকারীদের যে কোন তুলনাই হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে তাঁর শাসন শাসন ব্যবস্থা

সিরিয়া ও ইরাক দখলে আসার পর বিজিত অঞ্চলের কৃষি জমি বিজয়ী সৈন্যদের মাঝে বন্টন করার দাবি উঠলে খলীফা তা অস্বীকার করেন। মজলিসে শুরার অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনার পর উমর ফারুক (রাঃ) এর মতের অনুকুলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতের আমলে ইরাকের বিরাট এলাকার জরিপ গ্রহণ করা হয। সেখানকার চাষোপযোগী সমস্ত জমি জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করা হয়। তাদের নিকট হতে উশর ও খারাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। সিরিয়া ও মিসরে রাজস্ব আদায় শুরু করা হয়। ব্যবসায় শুল্ক আদায় খলীফা উমর ফারুক (রাঃ) এর আমলেই সর্বপ্রথম সুচনা করা হয়। মূলতঃ ইহা ইসলামের অর্থ বিজ্ঞানের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খলীফা সমগ্র মুসলিম জাহানের আদমশুমারী গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে জেলাসমূহে রীতিমত আদালত ও ফৌজদারী কোর্ট স্থাপিত হয়। বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। বিচারকদের জন্য উচ্চহারে বেতন নির্ধারণ করা হয়, যেন ঘুষকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিন্দুমাত্র কারন না ঘটে। তা ছাড়া বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তখন ফতোয়া বিভাগ খোলা হয়।

দেশের আভ্যন্তরীন শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি পুলিশ বিভাগ স্থাপন করেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কে বাহরাইনের সর্বোচ্চ পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠাবার সময় তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে জনগণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। দোকানদারগণ যেন পরিমাপ ও ওজনের দিক দিয়ে ক্রেতাকে বিন্দুমাত্র ঠকাতে না পারে, রাজপথের উপর যেন কেহ ঘর-বাড়ী নির্মাণ না করে, ভারবাহী জন্তুর উপর দুর্বহ কোন বোঝা যেন চাপানে না হয় এবং শরাব উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় হতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ জনস্বার্থ ও শরীয়াতের নির্দেশ যাতে কোন রকম বাধা প্রাপ্ত হতে না পারে, সেদিকে পুরাপুরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই ছিল পুলিশের মৌলিক দায়িত্ব।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর পূর্বে আরব জাহানে কারাগারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তিনি প্রথমবার মক্কা শরীফে কারাগার স্থাপন করেন। উত্তরকালে জেলাসমূহের কেন্দ্র-স্থলে অনুরূপ কারাগার স্থাপন করা হয়।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) খিলাফতের পূর্বে সরকারী ধন-সম্পদ সঞ্চিত রাখার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। যা কিছুই আমদানী হত, সঙ্গে সঙ্গে তা প্রয়োজনীয় কাজে কিংবা অভাবগ্রস্থদের সাহায্যার্থে ব্যয় হয়ে যেত। হযরত আবূ বকর (রাঃ) যদিও একখানি ঘর বায়তুলমালের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন; কিন্তু তাহা প্রায় সময় বন্ধ থাকত। তাহাতে সঞ্চয় করে রাখার মত কোন সম্পদ ছিল না। তার ইন্তেকালের পর বায়তুলমালে তল্লাসী চালানো হলে তাতে একটি মাত্র মুদ্রা অবশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। হযরত উমর (রাঃ) ১৫ হিজরী সনে সর্বপ্রথম বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। মজলিসে শু'রার মঞ্জুরীক্রমে মদীনা শরীফে বিরাট আকারে বায়তুলমাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজধানীতে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জেলার কেন্দ্রসমূহে অনুরূপ বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি স্থানেই এ বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র অফিসার নিযুক্ত করা হয়। বায়তুলমালসমূহের শাখা হতে স্থানীয় খরচ নির্বাহ করার

Dhaka University Institutional Repository

পর যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, তা কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল মদীনায় প্রেরণ করা হত। বায়তুলমালের হিসাব রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ ও হিসাবের জন্য খাতাপত্র যথাযথভাবে চালু করা হয়েছিল।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক তার নিরপেক্ষতা, সুবিচার ও পক্ষপাতহীন বিচার ব্যবস্থা। তাঁর শাসন আমলে এক বিন্দু পরিমান অন্যায়-অবিচার অনুষ্ঠিত হতে পারত না।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর এ ঐতিহাসিক বিচার ব্যবস্থা কেবল মুসলমান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সুবিচারের দ্বার ইয়াহুদী, খৃষ্টান, প্রভৃতি অমুসলিম নাগরিরদের জন্যও অবারিত ও চির উন্মুক্ত ছিল। হযরত উমর (রাঃ) জনৈক অমুসলিম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে বলল, "আমার উপর জিজিয়া ধার্য করা হয়েছে, অথচ আমি একজন গরীব মানুষ"। হযরত উমর (রাঃ) তাহাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন ও কিছু নগদ সাহায্য করলেন এবং বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্তকে লিখে জানালেন, এ ধরনের আরও যত যিম্মি গরীব লোক আছে, তাদের সকলের জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেও। আল্লাহর কসম, এদের যৌবনকালে কাজ আদায় করে বার্ধক্যে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা কিছুতেই সু-বিচার হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফত চিরদিনের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ ।

উপরোক্ত আলোচনায় সন্ত্রাসসহ সকল প্রকার অপরাধ দমনে হযরত উমর (রাঃ) যে অনুপম দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

সন্ত্রাস দমনে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ)

হযরত উসমান (রাঃ) খুলাফায়ে রাশেদা'র তৃতীয় খলীফা। তিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার প্রথম বৎসরের মধ্যেই ত্রিপলি, আলজিরিয়া ও মরক্কো অধিকৃত হয়। এর ফলে স্পেনের দিকে মুসলমানদের অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। হযরত উমর ফারুক (রা) এর খিলাফত আমলে সাইপ্রাসে কয়েকবার সৈন্য অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। ২৮ হিজরী সনে হযরত আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে ভূ-মধ্য সাগরে অবস্থিত এ গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপটির উপর মুসলিম বিজয়ের পতাকা উড্ডীন হয়। এভাবে হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাজ্য সীমার বিপুল বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ হয়। কাবুল, হিরা, সিজিস্তান ও নিশাপুরে এ সময় ইসলামী খিলাফতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত উসমান (রাঃ) এর দ্বাদশতম খিলাফত আমলের প্রথম ছয়টি বৎসর পূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। বহু দেশ নিয়ে গঠিত বিশাল এলাকা ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভূক্ত হয়। বায়তুলমালে সম্পদের পরিমান বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষি, ব্যবসা ও প্রশাসন ব্যাবস্থায় আসাধারণ উন্নতি জন-জীবনে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি এনে দেয়। হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফতের উল্লেখযোগ্য অবদান হল ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হয় এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, নির্ভূল

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা ও উত্তম কর্মনীতির সাহায্যে বিজিত জাতি সমূহের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা ও তৎপরতা দমন করে শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলীফা হিসাবে হযরত উসমান (রাঃ) কে বহু সংখ্যক বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছে। তার আমলে মিশরের বিদ্রোহের ঝান্ডা উত্তোলিত হয়, আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান অঞ্চলের অধিবাসীরা 'খারাজ' দেওয়া বন্ধ করে দেন, খোরাসানবাসীরাও বিদ্রোহের মস্তক উত্তোলন করে। এসব বিদ্রোহ ছিল বিজিত জাতি সমূহের মনে ধুমায়িত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসামূলক বিষ বাষ্পের বিস্ফোরনের পরিণতি। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) বিশেষ সর্তকতা ও বিচক্ষনতার সাহায্যে উহা দমন করতে সক্ষম হন। কঠোরতা ও কোমলতা সমন্বিত কর্মনীতির ফলে এ সমস্ত এলাকার জনগণ ইসলামী খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

খিলাফতের রাশেদার শাসন পদ্ধতি পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে শুরু হয়েছিল। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এ ব্যবস্থাকে অধিকতর সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করে তোলেন। হযরত উসমান (রাঃ) ও তাঁর প্রাথমিক আমলে এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। তবে শেষ পর্যায়ে বনু উমাইয়্যাদের অভ্যুত্থানের ফলে অনেক বিপর্যয় সূচিত হয়। হযরত উসমান (রাঃ) উহা প্রতিরোধ করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাতে থাকেন এবং এ উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল লোকদের দেয়া যে কোন কল্যাণমূলক পরামর্শ তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন।

প্রসংঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও শাসকদের কর্মনীতি ও কার্যাবলীর প্রকাশ্য সমালোচনা করার নিরংকুশ অধিকার লাভ করেছিলেন। এ অধিকার এতটুকু হরণ করার ইখতিয়ার স্বয়ং খলীফাকেও দেয়া হয়নি। ইহা অনস্বীকার্য যে, হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফতের শেষ পর্যায়ে পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থায় কিছুটা ফাটল ধরতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গণ-অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হতে দেয়া হয়নি।

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সাধারণতঃ দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকতর উত্তম ও নির্ভূল মতামত প্রকাশে সক্ষম হয়ে থাকেন। এ কারণে বর্তমান কালেও বিভিন্ন সভ্য ও উন্নত দেশে এধরণের পরামর্শমূলক সংস্থা গঠন করা হয়ে থাকে। হযরত উসমান (রাঃ) চৌদ্দশত বছর পূর্বে এ প্রয়োজন অনুভব করে দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শ মজলিস গঠন করেছিলেন। এসংস্থার সদস্যদের নিকট হতে সাধারণতঃ লিখিত প্রস্তাব চাওয়া হত। কুফা অঞ্চলে সর্ব প্রথম যখন শাসন শৃঙ্খলায় সন্ত্রাস ও বিপর্যয় দেখা দেয় তখন তা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মজলিস সদস্যদের নিকট হতে লিখিত প্রস্তাব চাওয়া হয়। চব্বিশ হিজরী সনে সমগ্র দেশের সার্বিক অবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে রাজধানীতে এ মজলিসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে এ পর্যায়ে অভিমত দানে সক্ষম অধিকাংশ দায়িত্বশীল কর্মচারীরা যোগদান করেছিলেন।

প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর সক্রিয় ও সুদৃঢ় করে তুলবার উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশের প্রদেশ ও জেলা ভিত্তিক বিভাজন ও পূর্নগঠন ছিল অত্যন্ত জরুরী কাজ। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলকে দামেস্কো, জর্ডান ও ফিলিস্তিন এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) এ সমস্ত অঞ্চলে একজন গভর্ণরের অধীন করে একটি বিশাল বিস্তীর্ণ প্রদেশ বানিয়েছিলেন। প্রদেশের এই পুর্নগঠন শাসন শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। শেষকালে সমগ্র দেশ যখন সন্ত্রাস ও অরাজকতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল তখন সিরিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহ এ বিপর্যয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উসমান (রাঃ) দেশের প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রন ও দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় "অনুসন্ধান কমিটি" গঠন করেছিলেন এবং রাজধানীর বাইরে সর্বত্র তাদেরকে পাঠিয়ে দিতেন। কমিটি সমগ্র অঞ্চল ঘুরে ঘুরে প্রশাসন কর্মকর্তাদের কাজ কর্ম ও জনগণের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করতেন। এতদ্ব্যতীত দেশের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে অবহিত হবার জন্য হযরত উসমান (রাঃ) জুমা'র দিন মিম্বরে দাড়িয়ে খুৎবা শুরু করার পূর্বে উপস্থিত জনতার নিকট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। উপস্থিত লোকদের কথা তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনতেন। উপরন্তু দেশ বাসীর নিকট সাধারণ ভাবে ঘোষনা করে দেয়া হয়েছিল যে, কোন প্রশাসকের বিরুদ্ধে কারো কোনরূপ অভিযোগ থাকলে হজ্বের সময় তা যেন খলিফার সম্মুখে পেশ করা হয়। কেননা এসময় ইসলামী খিলাফতের সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে মক্কা শরীফে বাধ্যতামূলক ভাবে উপস্থিত থাকতে হত। এভাবে লোকদের নিকট হতে সামনা-সামনি অভিযোগ শ্রবন ও উহার প্রতিকার সাধনের একটি সুষ্ঠ ব্যবস্থা হযরত উসমান (রাঃ) এর আমলে কার্যকর ছিল।

কাজেই সন্ত্রাসসহ অন্যান্য অপরাধ দমনে উপরোক্ত কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের মূল কর্মনীতিই ছিল অপরাধ প্রতিরোধের পূর্ব শর্ত।

সন্ত্রাস দমনে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)

হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর তিন দিন পর্যন্ত খিলাফতের আসন শুন্য থাকে। এ সময় পরবর্তী খলিফার জন্য হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বহুলোক তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। প্রথম দিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। শেষ পর্যন্ত মহাজীর ও আনসার সাহাবীদের পৌনপুনিক অনুরোধে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি সম্মত হন।

হযরত আলী (রাঃ) যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নেন তখন সমগ্র মুসলিম জাহান সন্ত্রাস ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের লীলা ভূমিতে পরিণত হয়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সময়ে অনুরূপ এক সন্ত্রাস ও বিদ্রোহ-বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এ দুটি অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে যে বিপদের সম্মুখীণ হতে হয়েছিল তা কাফের, ইসলাম ত্যাগী ব্যক্তিদের এবং ইসলামের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ ছিল। সমস্ত ইসলামী জনতা এ সংঘর্ষে খলিফার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরত আলী (রাঃ) যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে তারা শুধু মুসলমানই ছিলেন না, বহু সংখ্যক সাহাবী এবং রাসুলে করীম (সঃ) এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) পর্যন্ত এদের মধ্যে শামিল ছিলেন। এটাকে ভাগ্যের চরম পরিহাস বলা যায়।

দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রন এবং তাদের কার্যাবলী ও আচার-ব্যবহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ। হযরত আলী (রাঃ) এ বিশেষ বিষয়টির উপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাউকে নিয়োগ দান করার সময় অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ প্রদান করতেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে এসব কর্মকর্তাদের কার্যাবলী ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে খোজ খবর নিতেন। একবার হযরত কাযাব ইবনে মালিক (রাঃ) কে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে নিম্নোক্ত ভাষায় তাকে নির্দেশ দেন, "তুমি তোমার সঙ্গীদের একটি দল নিয়ে রওয়ানা

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যাও এবং ইরাকের প্রতিটি জেলায় ঘুরে ঘুরে কর্মচারীদের কাজ কর্ম ও তাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে খোজ খবর নাও"।

তিনি সরকারী কর্মচারীদের অপচয় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যপারে অনিয়মতান্ত্রিকতা কঠোর হস্তে দমন করেন। বায়তুলমাল হতে গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায় করার জন্য কর্মচারীদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন। এ ব্যপারে তিনি তার নিকটাত্মীয়তের প্রতিও নমনীয়তা প্রদর্শন করতেন না।

হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন জন মানুষের জন্য আল্লাহর অপার রহমতের বাস্তব ও জলন্ত প্রতীক। তাঁর খিলাফত আমলে সমাজের সাধারণ, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের দ্বার ছিল সদা উন্মুক্ত। বায়তুলমালে যা কিছু সঞ্চিত থাকত তা অভাবগ্রস্থ লোকদের মধ্যে অনতিবিলম্বে ও উদার হস্তে বন্টন করে দিতেন। দেশের অমুসলিম নাগরিকদের সহিত তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতেন। এমনকি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অতীব ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করতেন।

সমাজের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে হযরত আলী (রাঃ) সর্বদা সচেতন থাকতেন। বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারকে তিনি জঘন্য অপরাধ বলে মনে করতেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। এ ব্যপারে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। জনৈক ইহুদি আমিরুল মোমিনীন হযরত আলী (রাঃ) লোহ বর্মটি চুরি করে নেয়। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যপারে কোন পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না; বরং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আদালতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন। আদালতের বিচারক তাঁকে অভিযোগের স্বপক্ষে দুইজন স্বাক্ষী হাজির করার আদেশ দেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে স্বাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করলেন। কিন্তু বিচারক স্বাক্ষীগণকে অভিয়োগকারীর নিকটাত্মীয় বলে তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করে অভিযোগটি খারিজ করে দেন। এ ঘটনায় অবিভূত হয়ে ইহুদি নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করেন এবং পবিত্র কালেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

হযরত আলী (রাঃ) ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করেন। দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও তিনি বিচলিত হননি। সময় ও সুযোগমত দিন মজুরী করে জীবিকা সংগ্রহ করতে তিনি বিন্দুমাত্র সংকোচ করেননি। খলিফার আসনে বসেও তার এই কৃচ্ছ্রতা সাধনায় সামান্য পার্থক্য সূচিত হতে পারেনি। তাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ খাবার দেখে লোকেরা স্তম্বিত ও হতবাক হয়ে যেত। লোকদের তিনি বলতেন, "মুসলমানদের খলিফা বায়তুলমাল হতে মাত্র দুইটি পাত্র পাবার অধিকারী। একটি নিজে ও নিজের পরিবারবর্গ মিলে খাবে। আর অপরটি জনগণের সামনে পেশ করবে।

তাঁর ঘরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাড়তি কোন লোক ছিলনা। নবী করিম (সঃ)-এর তনয়া স্বহস্তেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতেন। বৈষয়িক ধন-সম্পত্তির দিক দিয়ে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন শুন্য পাত্র। কিন্তু আত্মার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অনেক সম্পদের অধিকারী। কোন প্রার্থী তাঁর দুয়ার হতে খালি

Dhaka University Institutional Repository

হাতে ফিরে যায়নি। এমনকি নিজেদের জন্য তৈরি করা খাদ্য তিনি অবলীলা কর্মে ক্ষুধার্তদের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না।

মূলতঃ খুলাফায়ে রাশেদার যুগে খলিফাদের অনুপম চরিত্র ও আদর্শ মানুষকে বিমোহিত করে তুলেছিল। পরকালের ভয় এবং তাদের মহান আদর্শের দ্বারা তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসসহ সকল প্রকার অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন যা আজকের সমাজ ব্যবস্থার জন্য অনুকরণীয়।

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন ২৪: ৫৫
২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, খিলাফতে রাশেদা, পৃষ্ঠা- ৬৩।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, খিলাফতে রাশেদা, পৃষ্ঠা- ৬৩।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৩।
৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, খিলাফতে রাশেদা, পৃষ্ঠা- ৬৪।
৬. ঐ
৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, খিলাফতে রাশেদা, পৃষ্ঠা- ৭২।
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, খিলাফতে রাশেদা, পৃষ্ঠা- ১০২।
১১. ঐ , পৃষ্ঠা- ১০৩
১২. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামের বিশ্বজনীন মানবতাবোধ: সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, পৃষ্ঠা নং- ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৪

আল কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্ত্রাস দমনে

জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী ও আইনবিরোধী কার্যকলাপকে সন্ত্রাস বলা হয়। সন্ত্রাস সমাজ জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে। নিরীহ জনতার বিড়ম্বনার দুঃখজনক পরিণাম ডেকে আনে সন্ত্রাস। সরকারের দায়িত্ব হল নাগরিকদের জীবন-যাপন নিষ্কন্টক করা। দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন রাষ্ট্রীয় বিধানের মূল লক্ষ্য। এজন্যে জনগণ সরকারকে কর প্রদান করে থাকেন। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিপুল পুলিশ বাহিনী ও নিরাপত্তা খাতে অর্থ ব্যয় করা হয় । সন্ত্রাসবিরোধী আইন করা হয় লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে। তবু সন্ত্রাস নির্মূল করা যাচ্ছে না। যেন সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্য অর্জনে সরকারী বাহিনী পদে পদে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার অসহায় বলে প্রমাণিত হচ্ছে। অন্যকথায় মানব রচিত ঢিলেঢালা আইন সন্ত্রাস দমনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

সন্ত্রাস দমনে কুরআনের বিধান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে সন্ত্রাসী আরব-বেদুইনরা যে কুরআনী বিধানের পরশে এসে সন্ত্রাস, লুট-পাট, হানাহানি ছেড়ে দিয়েছিল এবং সভ্য মানুষে পরিণত হয়েছিল আজও আল-কুরআনে সে বিধান বিদ্যমান রয়েছে। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সুরা মায়েদার নিম্ন লিখিত পাঁচটি আয়াত পর্যালোচনা করা যায়। মহান আল্লাহ পাক বলেন- "এ কারণেই আমি বণি ইসরাঈলদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নির্দেশনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।"[১]

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। অথবা শুলীতে চড়ানো হবে। অথবা তাদের হস্ত পদ সমুহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে। অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[২]

"কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে, জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দায়ালু।" [৩]

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" [৪]

"যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরো তদানুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রান পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [৫]

আলোচ্য আয়াত সমুহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্নিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে খোদাভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সুক্ষভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দন্ডবিধির মত কুরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে খোদাভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ'তায়ালা ও আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কুরআন পাকের এ বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

যারা পরের ধন চুরি করে তারা গোপনে তা করে। প্রকাশ্যে আক্রমনাত্মক ভূমিকা রাখে না। তারা মালিকের উপর আঘাত করে না। সেজন্যে তাদের শাস্তি সন্ত্রাসীদের অপেক্ষা কম। যারা সন্ত্রাসী, তারা ডাকাতের ভূমিকাবলম্বন করে। জোরপূর্বক মালিকের ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি হাতিয়ে নেয়। মালিক এরূপ সন্ত্রাসীদের সামনে অসহায় হন। মালিকের ধন-সম্পদের উপর তাঁর ন্যায্য অধিকার আছে বলে বাধা দিলে তাঁকে আঘাত করে, তাঁর জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। ক্ষেত্র বিশেষে হত্যাও করে। কাজেই সন্ত্রাসীরা অন্যায়ের পথে চরম অবস্থায় চলে যায়। তারা দেশের আইন ব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। সেজন্যে বিজ্ঞানময় কুরআনে তাদের জন্য মহান আল্লাহ কঠোরতম শাস্তির বিধান দিয়েছে। (১) ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করতে হবে। (২) শূলবিদ্ধ করে সন্ত্রাসীদের লাশ লোকজনের চলাচলের পথের ধারে পরিদর্শনের জন্য টানিয়ে রেখে দিতে হবে। (৩) বিপরীত দিক থেকে সন্ত্রাসীদের হাত-পা কেটে দিতে হবে। (৪) অথবা সন্ত্রাসীদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। (৫) অন্য দেশ তাদেরকে গ্রহণ না করলে তাদেরকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে।

উল্লেখিত পাঁচ প্রকার শাস্তি কখন প্রয়োগ করা হবে তা নির্ণয় করা কোর্টের বিবেচনায় রাখা হয়েছে। তবে ইসলামী ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস, হলেন বিজ্ঞানময় কুরআনের আইন বিশ্লেষণকারী বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আহকামুল কুরআনে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে সন্ত্রাস করে, মালামাল লুট করে এবং হত্যা করে-তার ব্যাপারে ইমাম তথা রাষ্ট্রপতির অধিকার রয়েছে, তিনি চাইলে এরূপ সন্ত্রাসীর হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করে দিতে পারেন। তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেন। তাকে শূলবিদ্ধ করতে পারেন। আর রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা হলে তিনি এরূপ সন্ত্রাসীর বিপরীত দিক থেকে হাত-পা না কেটে শুধু শূলবিদ্ধ করতে পারেন। আর তিনি চাইলে তাকে শূলবিদ্ধ না করে শুধু মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন। যদি সন্ত্রাসী ব্যক্তি মালামাল লুণ্ঠন করে কিন্তু হত্যা না করে তবে বিপরীত দিক থেকে তার হাত-পা কেটে দিবেন। যদি মালামাল লুণ্ঠন না করে থাকে আর হত্যাও না করে থাকে, তাকে তিনি তাযীর আইন (ফৌজদারী লঘু আইন) মোতাবেক শাস্তি দিবেন। আর তাকে দেশান্তরিত করে দেবেন বা তাকে কয়েদ করে দেবেন"। [৬]

ইমাম শাফিয়ী বলেন, সন্ত্রাসী যদি হত্যাকান্ড ঘটায়, মালামাল লুট করে, তাকে কতল করা হবে, শূলবিদ্ধ করা হবে। আর যদি হত্যাকান্ড ঘটিয়ে থাকে কিন্তু মালামাল লুণ্ঠন না করে তাকে কতল করতে হবে কিন্তু শূলিতে চরানো হবে না। যদি মাল লুট করে থাকে কিন্তু হত্যা না করে থাকে তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দিতে হবে। আর যদি পথে-ঘাটে ভীতির সৃষ্টি করে দেশান্তরিত করা হবে বা কয়েদ করা হবে। এরূপ সন্ত্রাসীরা যদি পালিয়ে যায় তাদেরকে তালাশ করে গ্রেপ্তার করতে হবে। আর তাদের প্রতি আইন প্রয়োগ করতে হবে।" [৭]

ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের শাস্তি উল্লেখপূর্বক বিধান গ্রন্থ হিদায়াতে বলা হয়ঃ যদি ডাকাত/সন্ত্রাসীদের একজন হত্যাকান্ড ঘটায় তাহলে দলভূক্ত সকলকে হত্যা করা হবে। কেননা তাদের সমষ্টিগত আইনবিরোধী তৎপরতার কারণে পরস্পর শক্তি পায়। তাদের যেকোন একজনের দ্বারা হত্যাকান্ড সংঘটিত হলেই 'হত্যার বদলে হত্যা করার' দন্ডবিধি প্রযোজ্য হবে।" [৮]

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে সূরা মায়েদার ৫টি আয়াত দ্বারা । ৩৩ নং আয়াতের প্রথমাংশেই বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য-করিয়া বেড়ায়-অর্থাৎ বাক্যাংশের তরজমা করা হয়েছে "দুনিয়াতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা" দ্বারা। কাজেই আল্লাহ এবং তার রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করাকে এখানে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর গণ্য করা হয়েছে। কোরআনের মতে "ফাসাদ ফিল আরদি" তথা পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টি করা জঘন্যতম অপরাধ।

তাছাড়া সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করা যায়।

"কাতাদা (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, 'উকল ও ওরায়ানা' গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় নবী করীম (সঃ) এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহন করে। কিছু দিন অবস্থান করার পর তারা বলল, হে আল্লাহর নবী! আমরা দুধেল পশু পালন করতাম। কৃষি কাজ করতাম না। তারা মদীনার আবহাওয়া নিজেদের অনুকূল মনে করেনি। নবী করীম (সঃ) তাদেরকে একজন রাখালসহ কয়েকটি উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে নির্দেশ দিলে তারা চলে গেল।

হাররা নামক স্থানে পৌছে তারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফের হয়ে যায় এবং করীম (সঃ) এর রাখাল 'ইয়াসের'কে হত্যা করে উটগুলোসহ পালিয়ে যেতে থাকে। নবী করীম (সঃ) এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য লোক পাঠান। তাদেকে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হলে কেসাস স্বরূপ তিনি লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চক্ষুগুলো উৎপাটিত করতে এবং হাত কাটতে নির্দেশ দেন। অতঃপর হাররা এলাকার একপ্রান্তে ফেলে রাখা হয়। এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" [৯]

ব্যভিচার জঘন্যতম সন্ত্রাস। এ ব্যাপারে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত, হিলাল ইবনে উমাইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে শারীক ইবনে সাহামার সাথে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নবী (সঃ) বললেন, স্বাক্ষী হাযির কর নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যখন আমাদের কেউ স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সেকি স্বাক্ষী তালাশ করতে যাবে? তখন নবী করীম (সঃ) বলতে লাগলেন, সাক্ষী নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে। হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করবেন। তারপর জিব্রাইল (আঃ) এলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর উপর নাযিল করা হল, "যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে", থেকে নবী (সঃ) পাঠ করলেন, " যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে" পর্যন্ত। তারপর নবী (সঃ) ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হিলাল এসে স্বাক্ষী দিলেন। আর রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলছিলেন, আল্লাহ'তায়ালাতো জানেন যে, তোমাদের দুজনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? স্ত্রী লোকটি দাড়িয়ে স্বাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চমবারের কাছে পৌছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার উপর অবশ্যম্ভাবী। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্থ হল এবং ইতস্তত করতে লাগল। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠল, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করব না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করল। 'নবী (সঃ) বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখ, যদি সে কাল ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে ও সন্তান শারীক ইবনে সাহমার। পরে সে অনুরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী (সঃ) বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কার্যকর না হত, তা হলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে কী ব্যাপার যে ঘটত।" [১০]

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস বা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকান্ড থেকে প্রতিবিধান পাবার ক্ষেত্রে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ কর যায়।

ইবনে আবূ মূলায়কা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, দু'জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুঁই বিদ্ধ হয়ে তাদের একজন বেরিয়ে পড়ল এবং অপর জনের বিরুদ্ধে সুঁই ফুটিয়ে দেয়ার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি শুধুমাত্র দাবির উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবী পুরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবেন না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদের আল্লাহর নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত কারীমা তার সম্মুখে পাঠ কর (সুরা আল-ইমরানের একটি আয়াত)। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, শপথ করা বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য। [১১]

দুর্নীত তথা ঘুষ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

আবু হুমায়দ সাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) ইবনে লুতাবিয়্যাকে বনী সুলায়ম-এর সাদাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে ফিরে আসল এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে জবাদিহি করলেন, তখন সে বলল এ অংশ আপনাদের। আর এ গুলো হাদিয়ার মাল যা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকলে না, যাতে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে আসে? এরপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) উঠে দাড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রসংশা ও গুনগান করলেন। তারপর তিনি বললেন, এরপর আল্লাহতায়ালা আমার উপর যে সব দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন তার মধ্য হতে কিছু কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতিপয় লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে বলে এই অংশ আপনাদের, আর এ অংশ হাদিয়া যা আমকে প্রদান করা হয়েছে। যদি তার কথা সত্য হয়, তাহলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকলনা, যাতে তার হাদিয়া তার কাছে আসে। আল্লাহর শপথ ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহন না করে। অন্যথায় সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহর কাছে আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চিৎকার করতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে অথবা বক্‌রী নিয়ে আসবে, যে বক্‌রী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি হস্তদ্বয় এতটুকু উপরের দিকে উত্তোলন করলেন যে, আমি তাঁর বগলের উজ্জ্বল শুভ্রতা দেখতে পেলাম এবং বললেন শোন! আমি কি আল্লাহর বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি? [১২]

ঘুষ এক ধরণের অর্থনৈতিক সন্ত্রাস। এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করেনা, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মুলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ বা উৎকোচ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারো জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলাম একে 'সুহ্‌ত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎস মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও ছহীহ্ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

আবার সন্ত্রাস করে কারো শারীরিক ক্ষতিসাধন করলে ইসলাম তার প্রতিবিধানের লক্ষ্যে কিসাসের বা মুক্তিপণের বিধান দিয়েছেন। এ ব্যাপারে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রুবাঈ যিনি আনাস (রাঃ) এর ফুফু, এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাত ভেঙ্গে ফেলেছিল। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবী করে। তারা নবী করীম (সঃ) এর নিকটে এল, নবী করীম (সঃ) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। আনাস ইবনে মালিকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আল্লাহর শপথ, রুবাঈ এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবতো বদলার বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধী পক্ষ রাজি হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহন করল। এরপর রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের শপথ সত্যি পরিণত করেন। [১৩]

জুলুম বা সন্ত্রাস দমনে নিম্নের হাদীসগুলো উল্লেখযোগ্য।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের ইজ্জত সম্মান বিনষ্ট করে কিংবা কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী, সে যেন আজই তার কাছ থেকে অত্যাচারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়। সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন তার কোন অর্থ সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থাকলে তা হতে জুলুমের দায় পরিমান নেক আমল কেটে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে তাহলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে সমপরিমান পাপ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। [১৪]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে নিজে কারো উপর জুলুম করবে না এবং জুলুমের জন্য কাউকে অপরের হাতে সোপর্দও করবেনা। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পুরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের বিপদ দুর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বিপদ সমুহের মধ্যে বড় কোন বিপদ দুর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। [১৫]

আবূ সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর ও কয়েকজন লোকের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এ ব্যাপারটা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, হে আবূ সালমা! জমিন থেকে বেঁচে থাক, কেননা, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক আঙ্গুল পরিমান জমিন অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে, কেয়ামত দিবসে সাততবক জমির শৃঙ্খল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। [১৬]

বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে যেভাবে হত্যাকান্ড সংঘটিত হচ্ছে তা প্রতিরোধ কল্পে নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্ব প্রথম কাসামা হত্যাকারী গোত্রের লোকের শপথ গ্রহন জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের হাশেম গোত্রে। কুরাইশের কোন একটি শাখা গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের একজন মানুষকে মজুর হিসাবে নিয়োগ করল। ঐ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করল। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্য ভর্তি বস্তার বাধন ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য কর, যেন তা দিয়ে আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যাতে পালিয়ে যেতে না পারে। মজুর তাকে রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করল তখন একটি ব্যতিত সকল উট বেঁধে রাখা হল। নিযুক্তকারী ব্যক্তি মজুরকে জিজ্ঞাসা করল, সকল উট বাঁধা হল কিন্তু এ উটটি বাধা হল না কেন? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। তখন সে বলল, এ উটটির রশি কোথায়? রাবী বলেন, একথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে, শেষ পর্যন্ত এ আঘাতে তার মৃত্যু হল। আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছিল,

Dhaka University Institutional Repository

তখন ইয়ামেনের একজন লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এবার হজ্জে যাবেন? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি। আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার সংবাদটি জীবনের যে কোন সময় পৌঁছে দিতে পারেন? ইয়ামেনী লোকটি উত্তরে বলল, হ্যাঁ তা পারব। তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় উপস্থিত হবেন তখন হে কুরাইশের লোকজন বলে ঘোষনা দিবেন, যখন তারা আপনার ডাকে সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রেকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবূ তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি (উটের মালিক) একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটি মৃত্যু বরণ করল। মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তিটি যখন মক্কায় ফিরে এল। তখন আবূ তালিব তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের ভাইটি কোথায়? তার কি হয়েছে? এখনও ফিরছে না কেন? সে বলল, আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মারাই গেল। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি। আবূ তালিব বললেন, তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ঐ ইয়ামেনী ব্যক্তি যাকে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি অসিয়ত করেছিল, হজ্জব্রত পালনে মক্কায় উপস্থিত হল এবং পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী হে বনু হাশিম, বলা হল; এ যে বনু হাশিম। সে জিজ্ঞাসা করল, আবু তালেব কোথায়? লোকজন আবু তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামেনী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাকে অসিয়ত করেছে যে, অমুক মাত্র একটি রশির কারণে তাঁকে হত্যা করেছে। সে ঘটনাটিও সবিস্তারে বর্ণনা করল। এ কথা শুনে আবু তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির নিকট গমন করে বলল, তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছ। কাজেই আমাদের তিনটি প্রস্তাবে যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি হয়ত হত্যার বিনিময় স্বরূপ একশ উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশ জন লোক হলফ করে বলবে তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এসব করতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি ও গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করলে ঘটনা বর্ণনা করলে ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা হলফ করে বলল। তখন বনু হাশিম গোত্রের জনৈক মহিলা যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল, আবু তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবু তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশজন হলফকারী থেকে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং ঐ স্থানে তার হলফ নিবেন না যে স্থানে হলফ নেয়া হয়। (অর্থাৎ রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে) আবু তালিব তার আবদারটি মঞ্জুর করলেন। তাররপর হত্যাকরীদের গোত্রের জনৈক পুরুষ আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আপনি একশ উটের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনের হলফ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি হলফকারীর উপর দু'টি উট পড়ে। আমার দু'টি উট গ্রহন করুন এবং আমাকে যেখানে হলফ করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাঁড় করানো থেকে আমাকে অব্যাহত দেন। অপর আট চল্লিশজন এসে যথাস্থানে হলফ করল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হলফ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঐ আটচল্লিশ জনের একজনও বেঁচে ছিল না। [১৭]

সবশেষে বলা যায় সন্ত্রাসের মত অপরাধের শাস্তি ইসলামে কঠোর রাখা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এক অনাবিল সোনালী যুগের সূচনা করেছে। কাজেই দেশ তথা পৃথিবী হতে সন্ত্রাস ও অপরাধের মূল উৎপাটিত করতে হলে কুরআনের নির্দেশ মেনে আইন প্রণয়ন করতে হবে। এর বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা হলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা যাবে না। জনগণের জন্য নিরাপদ জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা যাবে না। ইদানিং সংঘটিত অপরাধ প্রবণতা তারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন ৫: ৩২
২. আল কুরআন ৫: ৩৩
৩. আল কুরআন ৫: ৩৪
৪. আল কুরআন ৫: ৩৫
৫. আল কুরআন ৫: ৩৬
৬. আহকামুল কুরআন ২:৪০৮
৭. আহকামুল কুরআন ২: ৪০৯
৮. হিদায়া ৩: ৫৫৬
৯. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৮৭৮, পৃষ্ঠা নং- ৬১৭
সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ২৫৬৭, পৃষ্ঠা নং- ৫৩১
১০. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪৩৯২, পৃষ্ঠা নং- ৭২২
১১. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪১৯৫, পৃষ্ঠা নং- ৬৮২
১২. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬৭০৫, পৃষ্ঠা নং- ১০৬২
১৩. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪২৫৬, পৃষ্ঠা নং- ৬৯৩
১৪. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ২২৮৭, পৃষ্ঠা নং- ৩৪৪
১৫. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ২২৮০, পৃষ্ঠা নং- ৩৪৩
১৬. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ২২৯১, পৃষ্ঠা নং- ৩৪৪
১৭. সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৫৬৭, পৃষ্ঠা নং- ৫৪৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ডালিতে সাজানো এ পৃথীবি। আমরা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পৃথিবীকে বাস যোগ্য করে গড়ে তোলা। সে উদ্দেশ্য ফলপ্রসু করার জন্য যেসব জীবন দর্শন অনুসরন করা হয় তার মধ্যে কেবলমাত্র ইসলামই নিশ্চয়তা দিতে পারে একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

মুলতঃ কুরআনের নির্দেশনা ও বিশ্বনবীর আদর্শ হচ্ছে সমাজের মধ্যে বিরাজমান যে কোন বিবাদ, মতবিরোধ, সহিংসতা পরিহার করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলাম কোন অবস্থায়ই সন্ত্রাসের অনুমোদন করেনি। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা লোকমানের ১৭ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন-

"হে আমার ছেলে, নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ নিষেধ কর এবং তুমি যেসব বিপদে আক্রান্ত হও তার ওপর ধৈর্য্য ধারণ কর। এ হলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"

ইসলাম সর্বত্রই শান্তির ধর্ম। আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী রাসুলগণ কাফেরদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেও ইসলাম প্রচার করতে পিছপা হননি। বরং শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহ কুরআনের সূরা আনফালের ৬১ নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন-

"তারা (প্রতিপক্ষ) যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড় ও আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।"

সময় অনূকুলে নয় এখন, সন্ত্রাসের জয় জয়কার পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই। এ সন্ত্রাসের রকমফের ভিন্ন জনপদে ভিন্ন ধরণের। দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য এমনকি পাশ্চাত্যও সন্ত্রাসের কবলে জিম্মি। ইরাকে চলছে মানুষ হত্যার নামে সন্ত্রাস দমন। মুলতঃ তেল লুটের উদ্দেশ্যে এ গণহত্যার আয়োজন। মার্কিনী আগ্রাসনের এ নমুনা আফগানিস্তানেও পড়েছে।

রাষ্ট্রের ভেতরকার আভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসও এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ইসলামকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে। আবার ভূঁইফোর কিছু সংগঠন প্রগতি কিংবা তথাকথিত শ্রেণীহীন সমাজ বাস্তবায়নের জন্য হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।

অথচ হযরত আবু বকর (রাঃ) মহানবী (সঃ) অনুসরণে তার সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিল- "হে যায়িদ! নিশ্চিত হয়ো যেন তোমার নিজের লোকদের উপর উৎপীড়ন না কর, তাদের প্রতি অস্বস্তিও ঘটাবে না, বরং তোমরা সকল ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে, আর যা ন্যায় সঙ্গত ও বিচারসম্মত তা করতে যত্নবান হবে, কারণ যারা অন্যথা করে তাদের উন্নতি হবেনা। যখন শত্রুর সম্মুখীন হবে; তখন তোমরা মানুষের মত নিজেদের পরিচয় দেবে, আর তোমরা বিজয়ী হও, তাহলে ছোট শিশুদেরকে হত্যা করবে না, বৃদ্ধদের কেও না, নারীদেরও না। খেজুর গাছ নষ্ট করবে না, শস্যের ক্ষেত পোড়াবে না, ফলের গাছ কাটবে না, শুধু খাদ্যের প্রয়োজন যা তোমরা হত্যা করবে তার বাইরে গবাদি পশুর কোন অনিষ্ট করবে না। যখন তোমরা কোন সন্ধি বা চুক্তি কর তা পালন করবে এবং তোমাদের কথা রক্ষা করে চলবে। তোমার চলার পথে দেখবে কিছু ধর্মপরায়ণ লোক মঠের মধ্যে সংসারত্যাগী অবস্থায় বাস করছে, যারা এ প্রকারে আল্লাহর সেবায় নিযুক্ত, তাদেরকে বিরক্ত করবে না, তাদেরকে হত্যা করবেন না কিংবা তাদের মঠ ধ্বংস করবে না।"

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস নয় মানব প্রেমই হচ্ছে ইসলামের প্রতিপাদ্য বিষয়। যুগে যুগে ইসলাম মানুষকে ভেদাভেদ, সংকীর্ণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্তি করে শান্তির শিক্ষা দিয়ে আসছে। এর একটি বিরল উদাহরণ হচ্ছে- ইসলামী আইনে কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে হত্যা করলে তাকে সেই শাস্তি দেয়া হতো।

আজ বিশ্ব পরিস্থিতি ইসলামী আদর্শের পরিপন্থি। সন্ত্রাস ও সহিংসতা বিশ্বমানবতার শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামের কাছে রয়েছে তাওহীদি চিন্তা চেতনা। রয়েছে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের জ্ঞান এবং মানব সমাজের সুস্থতা ও বিশুদ্ধতার রীতিনীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্য। আর এ দুটো উপাদানের স্থূল শেকড় মানবাত্মার ভেতরে রয়েছে।

সময় এসেছে আবারও ভাববার। কোন পথে যাবে মানবজাতি। অনবরত ধ্বংসের দিকে নাকি শান্তির ধর্ম ইসলামের সাথে। কারণ ইসলাম যে মহান আদর্শের কথা বলছে তা আল্লাহর একত্ববাদের অধীনে একই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে দন্ডায়মান ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের একটি অনুপম প্রতিষ্ঠান।

ইসলামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সৌদি আরব ও ইরান দেশ, যেখানে ইসলামী আইনের দন্ডবিধি বাস্তবায়িত আছে, সেখানে যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করছে, যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মানুষ পাচ্ছে, তার তুলনা আজ সারা বিশ্বের কোথাও নেই। অন্য কোন আইন করে এ রকমের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি; পারবেও না।

মুলতঃ 'সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদান' ইসলামী আইন ও সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মূর্ত প্রতীক।

সমাপ্ত